চাঁদমামা
গল্প সমগ্র ২

চাঁদমামা
গল্প সমগ্র ২

গল্প সমগ্র

২

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ই-বুক প্রস্তুত ও পরিবেশনায়

বইরাগ পাবলিকেশন

www.boiraag.in

contact@boiraag.in

সূচিপত্র

কার জয়

মগধ রাজার দুই পত্নী ছিলেন। দু-জনেরই একই দিনে একই সময়ে একটি করে পুত্র জন্মলাভ করে। এক পুত্রের নাম অমরসিংহ ও অপর পুত্রের নাম বিজয়সিংহ রাখা হল।

রূপে আর শক্তিতে দু-জনের কেউ কারোর চেয়ে কম ছিল না। সমস্ত বিদ্যায় দু-জনেই সমান। যুদ্ধবিদ্যায়ও কেউ কারোর চেয়ে কম ছিল না।

আবার দু-জনের মধ্যে দু-একটি ব্যাপারে পার্থক্যও ছিল। অমরসিংহ ঘোড়ায় চড়া ও খড়্গ যুদ্ধে নিপুণ ছিল। আর বিজয়সিংহ হাতিতে চড়া ও মল্লযুদ্ধে ছিল দক্ষ। দুই রাজকুমারের মধ্যে ভালোবাসাও ছিল।

রাজা বৃদ্ধ হলেন। তিনি সবসময় ভাবতেন দু-জনের মধ্যে কাকে রাজসিংহাসনে বসানো যায়। দু-জনের একই দিনে জন্ম। অতএব ছোটো-বড়োর প্রশ্ন ওঠে না। রাজ্যও দু-ভাগ করা যায় না। তাই রাজা ঠিক করলেন দু-জনের যোগ্যতার বিচার করবেন। যে যোগ্য প্রমাণিত হবে তাকেই সিংহাসনে বসাবেন। রাজা এবং মন্ত্রী কয়েক দিন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা ঠিক করতে পারলেন না কে অধিকতর যোগ্য।

রাজকুমার দু-জন জানত না যে রাজা ও মন্ত্রী তাদের যোগ্যতার বিচার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ওই সময় কৌশিক দেশের রাজকুমারীর স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করা হয়। স্বয়ংবর সভায় বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিযোগিতা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যে রাজকুমার
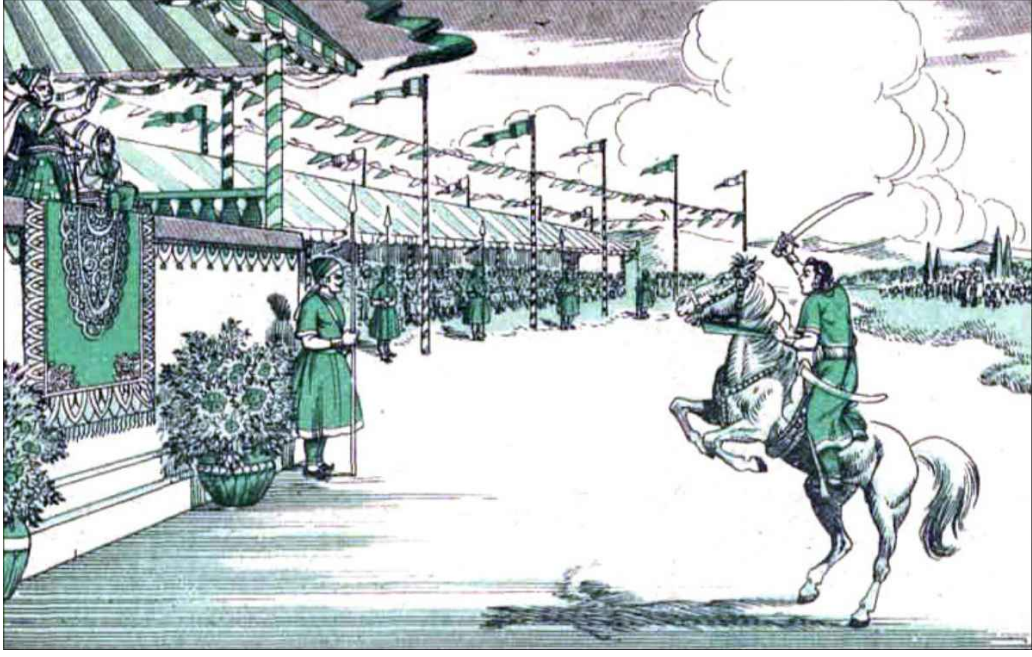
ওই সমস্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবে তার সাথেই রাজকুমারীর বিয়ের ব্যবস্থা হবে।

এই খবর পেয়ে রাজা এবং মন্ত্রী ঠিক করলেন দুই রাজপুত্রকেই স্বয়ংবর সভায় পাঠাবেন। তাঁদের বিশ্বাস ওই স্বয়ংবর সভাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে যোগ্যতর কুমার। পিতার আদেশে দুই রাজকুমার কৌশিক দেশের রাজকুমারীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে চলে গেল।

স্বয়ংবর সভায় বহু দেশের রাজকুমার হাজির হয়েছিল। অমরসিংহ ও বিজয়সিংহ বিভিন্ন বিদ্যায় সমস্ত রাজকুমারকে পরাজিত করে। অবশেষে অমর আর বিজয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হল তখন ঘোড়ায় চড়ায় ও খড়্গ যুদ্ধে বিজয়ী হল অমরসিংহ। আবার মল্লযুদ্ধ ও হাতিতে চড়ার বিষয়ে জয় হল বিজয়সিংহের। দু-জনে সমান দক্ষ প্রমাণিত হল।

কৌশিক রাজা বিপদে পড়লেন। কিছুতেই তিনি ঠিক করতে পারলেন না কে সমধিক দক্ষ। কার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজের সিদ্ধান্ত তিন দিন পরে ঘোষণা করবেন বলে তিনি রাজকুমারদের যে-যার দেশে ফিরে যেতে বললেন। তারপর কৌশিক রাজা মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলেন : অমরসিংহ ও বিজয়সিংহের মধ্যে কে যোগ্যতর তা যে যুবক প্রমাণ করে দিতে পারবে তার সাথে নিজের দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে দিয়ে অর্ধেক রাজ্যও দেবেন।

এই ঘোষণার পরের দিন এক মুনি এক শিষ্যকে নিয়ে দরবারে এসে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আপনার মেয়ের স্বয়ংবর নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান আমার শিষ্য করে দেবে।'
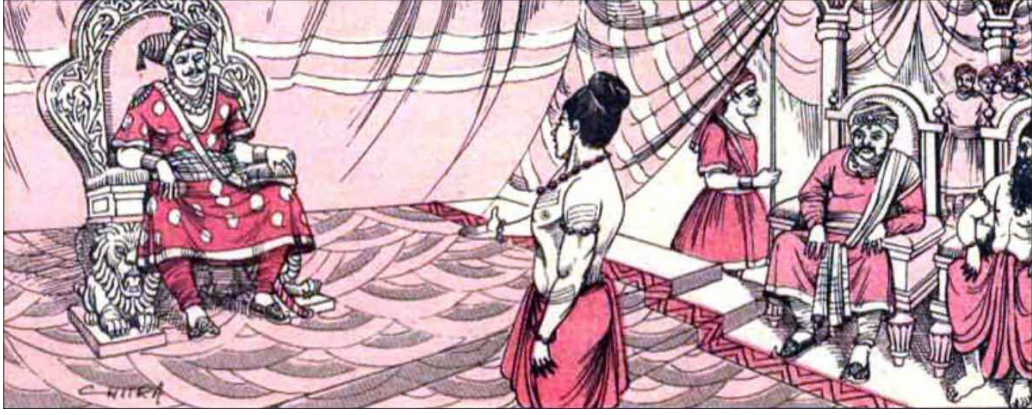
রাজা বললেন, 'কীভাবে করবে?'

এ প্রশ্নের জবাবে মুনির শিষ্য বলল, 'মহারাজ, অমরসিংহ খড়্গ যুদ্ধ ও ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে বিজয়সিংহের চেয়ে অধিক যোগ্যতর পরিচয় দিয়েছেন, আবার হাতিতে চড়ার ক্ষেত্রে ও মল্লযুদ্ধে কম যোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু হাতিতে বসা খড়্গাবিহীন বীরের চেয়ে ঘোড়ায় চড়া খড়্গাধারী বীর কি বেশি যোগ্য নন? এ ছাড়া ঘোড়া লাফিয়ে হাতির উপর দিয়ে যেতে পারে কিন্তু হাতি ঘোড়ার উপর চড়াও হয়ে খড়্গাধারী বীরকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না। অপর পক্ষে হাতিতে বসা মল্লকে খড়্গাধারী অশ্বারোহী সহজেই মারতে পারে। এইজন্য বিজয়সিংহের চেয়ে অমরসিংহ অধিক যোগ্য।'

এই যুক্তি প্রত্যেকে গ্রহণ করলেন। কৌশিক রাজাও সমাধান পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তৎক্ষণাৎ মুনি ও তার শিষ্য নিজেদের পোশাক খুলে ফেলল। মুনির পোশাকে ছিল অমরসিংহ আর শিষ্যের পোশাক পরে ছিল বিজয়সিংহ।

কৌশিক রাজা নিজের দুই কন্যার সাথে দুই রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। আর বিজয়সিংহকে দিলেন নিজের রাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব।

এই ঘটনার ফলে মগধ দেশের রাজার সমস্যাও মিটে গেল। মগধ রাজা অমরসিংহকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

পুনর্জন্ম

মহারাজা উগ্রগুপ্তের দুই ছেলে ছিল।

দু-জনের প্রকৃতি দু-রকমের। বড়ো পুত্র, যুবরাজের নাম ছিল শঙ্করগুপ্ত। সে ছিল ধূর্ত, ক্রুর এবং কঠোর স্বভাবের। সারাদিন মদের নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকত। ছোটো ছেলে শেখরগুপ্ত সরল প্রকৃতির ও দয়ালু ছিল। সে সবসময় ধর্ম চিন্তায় মগ্ন থাকত।

শঙ্করগুপ্তকে কেউ পছন্দ করত না। কিন্তু রাজার বড়ো ছেলে হিসেবে সেই ছিল রাজসিংহাসনের অধিকারী। দরবারে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকে ছোটো রাজকুমার শেখরগুপ্তকেই ভালোবাসত। পছন্দ করত।

এই কারণে শেখরগুপ্তের উপর শঙ্করগুপ্ত ঈর্ষা ও দ্বেষ পোষণ করত। মনে মনে সে ঠিক করল শেখরকে একেবারে মেরে ফেলবে।

মহারাজ উগ্রগুপ্ত শঙ্করগুপ্তকেই বেশি ভালোবাসতেন। তার কঠোর মনোভাব ও ক্রূরভাবকে তার পরাক্রমেরই প্রকাশ মনে করতেন।

ঈর্ষা পোষণকারী শঙ্করগুপ্ত একদিন ছোটো ভাইকে বধ করার পরিকল্পনা করল। সে শেখরগুপ্তকে শিকার করতে বেরুতে বলল। দু-জনে ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে গেল। ঘন বনে গিয়ে শেখরগুপ্তের উপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করল।

প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত শেখরগুপ্ত অগত্যা নিরুপায় হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে একটি গাছে উঠে পড়ল। ঠিক সেইসময় শেখরগুপ্তের খাপ থেকে তরবারি কাদা

মাটিতে পড়ে যায়। তরবারির হাতলের দিক মাটির গভীরে গেঁথে যায়। তরবারির তীক্ষ্ণ মুখ আকাশের দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। শঙ্করগুপ্তের ঘোড়া একবার পিছনের দুটো পায়ে দাঁড়িয়ে পরক্ষণে ওই তরবারির উপর গিয়ে পড়ল। তরবারি শঙ্করগুপ্তের বগলে ঢুকে গেল। সেই মুহূর্তে শঙ্করগুপ্ত মারা গেল।

ইতিমধ্যে শঙ্করগুপ্তের লোক সেখানে পৌঁছে গেল। তারা দেখল শেখরগুপ্তের তরবারি শঙ্করগুপ্তের বগল দিয়ে ঢুকে গেছে। শঙ্করগুপ্ত মরে পড়ে আছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে শেখরগুপ্ত।
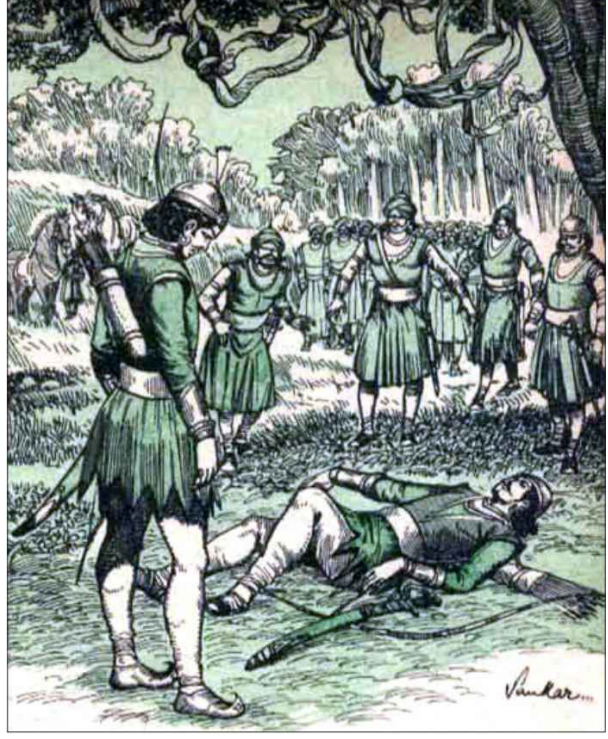
শেখরগুপ্তের উপর শঙ্করগুপ্তকে হত্যা করার অপরাধ চাপানো হল। নির্দোষ বলে শেখরগুপ্তের কোনো প্রমাণ ছিল না। যা ঘটেছিল তা শেখরগুপ্ত বিচারককে জানাল। কিন্তু তার বক্তব্য বিচারকের কাছে গল্প মনে হল। তাই বিচারক শেখরগুপ্তের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন।

সামনের শুক্রবারে শেখরগুপ্তের উপর দশ জন তির ছুড়ে তাকে হত্যা করবে ঠিক হল।

ওই দেশের নিয়মকানুন বিচিত্র ধরনের। সেই নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট সময়ে সেনাপতি এক লাল রুমাল নীচে ফেলে দেবে। সেই রুমাল নীচে পড়ে গেলেই তির ছোড়া হবে। কোনো কারণে সেই মুহূর্তে শাস্তি কার্যকরী না হলে সেই দণ্ড রদ হয়ে যাবে।

নিজের হাতে শেখরগুপ্তের মতো ভালো রাজপুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হচ্ছিল বলে সেনাপতি খুব দুঃখিত ছিলেন। তিনি শেখরগুপ্তকে খুব স্নেহ করতেন। সামনের শুক্রবার দুপুরে নিজের লাল রুমাল বাঁ-হাতে নীচে ফেলে শেখরগুপ্তকে মেরে ফেলার সংকেত দিতে হবে। কিছুতেই তাঁর ইচ্ছে করছিল না। স্নান খাওয়া ঘুম ছেড়ে দিয়ে সেনাপতি এ ব্যাপারে কী করা যায় ভাবছিলেন।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় ওই দেশের এক পদ্ধতির কথা সেনাপতির মনে পড়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী না হলে শাস্তি মকুব হয়ে যাবে।
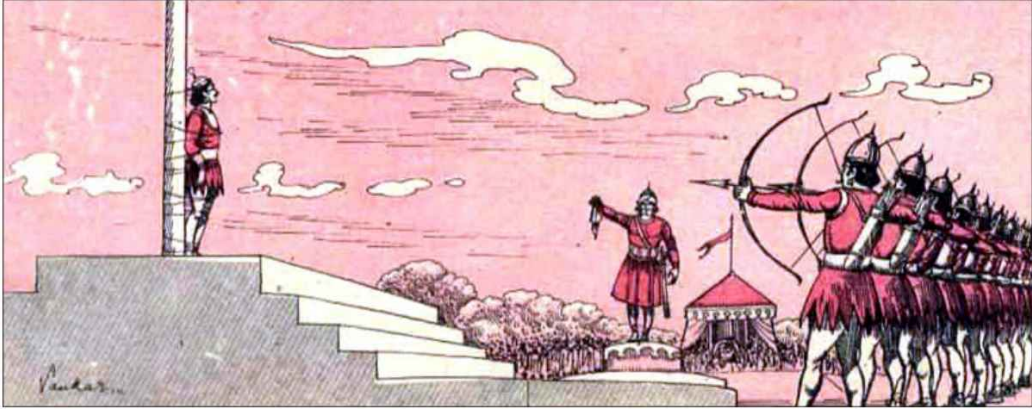
কিন্তু সেই সময়টাকে এড়িয়ে যাবেন কী করে! সেনাপতি ভাবলেন রাজদরবারের জাদুকর ইন্দ্রনাথ এই সংকট থেকে উদ্ধার করলেও করতে পারে। সেনাপতি ইন্দ্রনাথের সাথে দেখা করে তাকে গোপনে নিজের মনের কথা বললেন।

ইন্দ্রনাথ একটা লাল রুমাল হতে নিলেন। রুমালের এক প্রান্তে রবারের সুতো ছুঁচ দিয়ে সেলাই করে অন্য প্রান্তকে সেনাপতির বাঁ-দিকের বগলের সাথে সেলাই করে দিলেন। সাধারণত সেই রুমাল সেনাপতির জামার বাঁ-হাতের ভিতরে থাকবে। বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে না। রুমালটাকে টেনে হাতে নেবার সময় সুতোতে টান পড়বে আবার হাত থেকে নীচে ফেলতে গেলেই সেটা মুহূর্তে জামার ভিতরে ঢুকে যাবে।

সেই শুক্রবার এল। সেনাপতি দুপুরে লাল রুমাল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। শেখরগুপ্তকে এক থামে বাঁধা হল। তার সামনে দশ জন তির-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। প্রত্যেকে বড়ো বড়ো চোখে রুমালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেনাপতি হাত থেকে নীচের দিকে রুমাল ফেললেন। মুহূর্তে রুমালটা কোথায় যে গেল কেউ টের পেল না। ধনুকধারীরা অবাক হয়ে হাঁ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

দণ্ড মুহূর্ত চলে গেল। শেখরগুপ্তের মৃত্যুদণ্ড রদ হল। সমস্বরে সমবেতরা উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'যুবরাজ শেখরগুপ্তের জয়!'

রাজা ভাবলেন কোন ঠাকুরের কৃপায় তাঁর পুত্র মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেল। তিনি শেখরগুপ্তকে আলিঙ্গন করলেন। সেনাপতি ও জাদুকর ইন্দ্রনাথের চোখে-মুখে চাপা হাসির ছাপ।
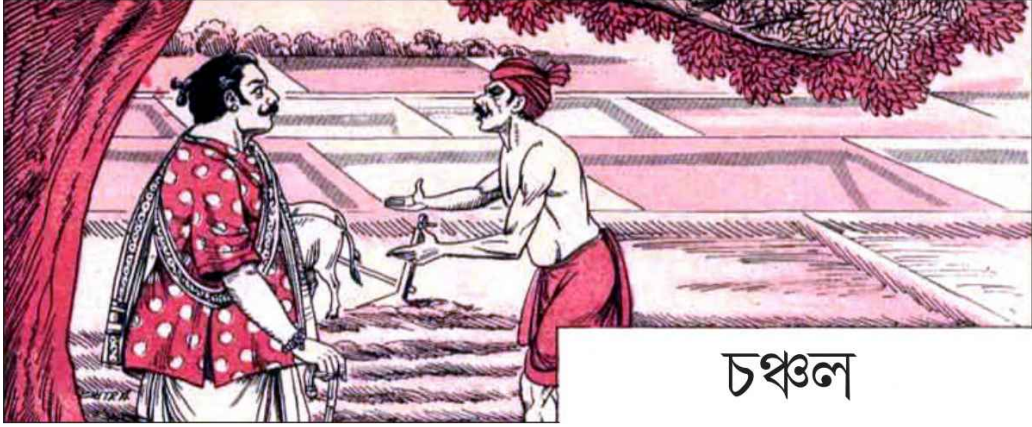
চঞ্চল

এক কিষান নিজের খেতে লাঙল চালাচ্ছিল। লাঙলের ফলা কোনো এক জিনিসে যেন বাধা পেল। কিষান সেই জায়গায় খুঁড়ে পেল এক কাঁসার পাত্র। আর সে পাত্র ভরতি ছিল সোনা।

পাত্রে ভরতি সোনা দেখে কিষানের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সোনা দিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কাজ করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করতে লাগল। ভাবল সে অনেক বড়োলোক হবে। ওই সোনা নিয়ে চোর ডাকাতদের পাল্লায় পড়ে গেলে সব খোয়া যাবে।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কিষান ঠিক করতে পারছিল না কী করবে। কিষানের নজরে পড়ল দূরে এক বিচারক যাচ্ছেন। কিষান ভাবল এই সমস্ত সোনা বিচারকের হাতে দিয়ে দিলে তার কোনো বিপদ হবে না। এ-কথা ভেবে সে ছুটে গেল বিচারকের কাছে। গিয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে আমার খেতে একবার কষ্ট করে আসুন না।'

দু-জনে খেতে পৌঁছাল। মাটির গভীরে ছিল সেই সোনা ভরা কাঁসার পাত্র। ইতিমধ্যে কিষানের মনে পরিবর্তন দেখা দিল। কিষান তাড়াতাড়ি ওই পাত্রের উপর মাটি ঢেলে দিয়ে বিচারককে বলল, 'মশাই, আপনি সঠিক বিচার করতে পারেন। আপনি বলুন তো এই দুটোর মধ্যে কোন বলদটা ভালো?'

এই কথা শুনে বিচারক বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

আমি এই সোনা কেন দিলাম না বিচারকের হাতে। সবার চোখ এড়িয়ে এত

সোনা আমি রাখব কোথায়? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কিষান আরও ভয় পেতে লাগল।

সারাদিন সে এই কথাগুলোই ভাবতে লাগল। কাজ আর কিছু হল না সেদিন।

সূর্য ডুবু ডুবু। কিষান দেখতে পেল বিচারক গাঁয়ের দিকে ফিরছেন। কিষানের ধড়ে প্রাণ এল। সে আবার বিচারকের কাছে ছুটে গেল। আর একবার খেতের কাছে যেতে তাঁকে অনুরোধ করল। বিচারক ভাবলেন কিষানের কোনো গোলমাল হয়েছে। তাই তিনি খেতে গেলেন। ততক্ষণে কিষানের মত আবার বদলে গেল। সে বিচারককে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আপনি বলুন তো দেখি, কালকে আমি যে খেতে লাঙল চালিয়েছিলাম সেটা ভালো না আজকে যেটাকে চাষ করছি সেটা ভালো?'

এ-কথা শুনে বিচারক ভাবলেন কিষানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তিনি কোনো কথা না বলে ফিরে গেলেন। বিচারকের চলে যাওয়ার পর কিষান আবার ভাবল, আমি কেন এই সোনা বিচারকের হাতে দিলাম না। এত সোনা আমি কোথায় লুকাব। কীভাবে গোপনে রাখব। কিষান ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল।

অবশেষে সেই কিষান একটি থলেতে ওই সোনা ভরা কাঁসার পাত্র পুরে থলেটি পিঠে চাপিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি পৌঁছে কিষান বউকে বলল, 'ওগো, শুনছ, বলদগুলো বেঁধে ওদের খেতে দাও। আমাকে এক্ষুনি বিচারকের কাছে যেতে হবে।'

পিঠে জিনিস ভরতি থলেটা নিয়ে কিষানটি তার বউয়ের সাথে কথা বলছিল। ফলে ওই থলেতে কী আছে তা জানার কৌতূহল জাগল কিষান-বউয়ের মনে।
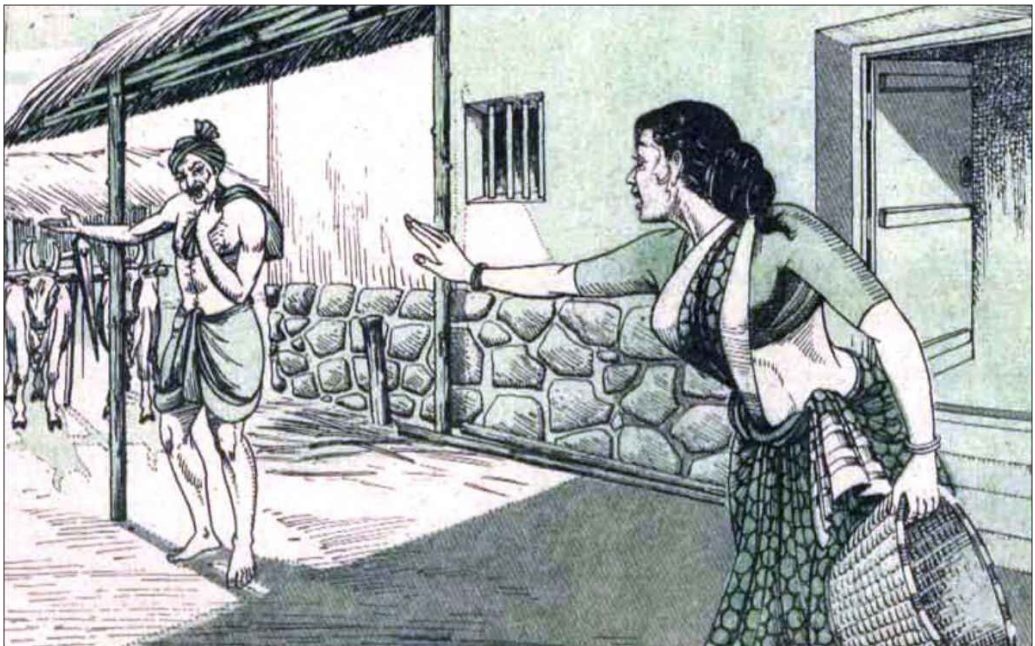
সে বলল, ‘ওসব কাজ আমার নয়। গোরু বলদ বাঁধা, খেতে দেওয়া তুমি করে থাক, তুমি করবে। এসব কাজ করে যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। যখন ইচ্ছে ফিরতে পার।’

কিষান নিরুপায় হয়ে থলে নীচে রেখে বলদ বাঁধতে, তাদের খেতে দিতে চলে গেল। এই ফাঁকে কিষান-বউ থলে থেকে কাঁসার পাত্র বের করে দেখল। তাতে ভরতি সোনা দেখে কিষান-বউয়ের চোখ তো ছানাবড়া। কিষান বলদগুলোকে বেঁধে খেতে দিয়ে ফিরল। ইতিমধ্যে কিষান-বউ ওই কাঁসার পাত্র লুকিয়ে রেখে থলেতে ওই আকারের একটি পাথর ঢুকিয়ে দিল।

কিষান কাজ করে ফিরল। থলেটাকে পিঠে ফেলে সোজা বিচারকের বাড়ি গেল।

‘হুজুর, আমি আপনার জন্য একটা উপহার এনেছি।’ কিষান বলল।

বিচারক ভাবলেন উপহার নিশ্চয় কোনো দামি জিনিস হবে। থলে খুলে দেখেন একটা পাথর। বিচারকের সাথে কিষানও অবাক হয়ে গেল। বিচারক ভাবলেন কিষানের এই কাজের পেছনে কোনো বিশেষ কারণ আছে। কিষানকে একটা ঘরে বন্ধ করালেন বিচারক। কিষান আপন মনে কী বলে দুটো চাকরকে তা আড়ি পেতে শোনার হুকুম দিলেন।

কিষান ঘরে একা বসে বসে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ‘উফ্, কত বড়ো উঁচু কাঁসার পাত্র। কত সোনা।’

চাকর দু-জন বিচারককে জানাল কিষান যা করছিল যা বলছিল। কিষানকে ডেকে বিচারক বললেন, ‘ভাই, তুমি রাত্রে কী যেন বিড়বিড় করে বলছিলে, কী যেন মাপছিলে। কী ব্যাপার বলত ভাই?’
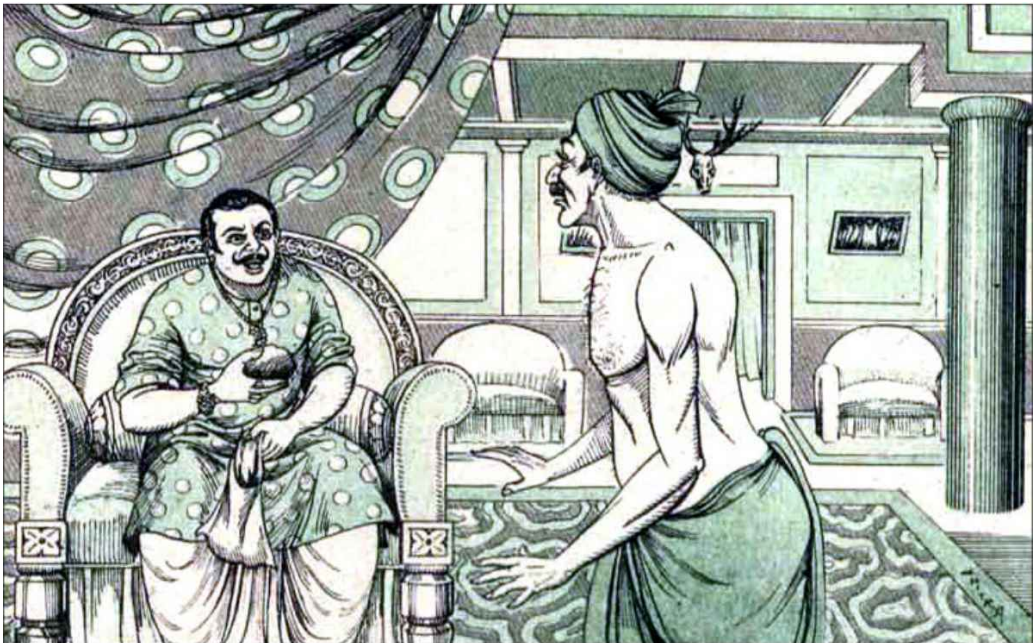
বিচারকের কথা শুনে কিষানের মনে যেন সাহস এল। সে বলল, 'আমি আপনাকেই মেপে দেখছিলাম। আর মাপতে মাপতে বলছিলাম, আপনার মাথা এত মোটা, আপনার ঘাড় এত মোটা, আপনার পেট এত উঁচু।'

কিষানের কথা শুনে বিচারকের খুব রাগ হল। বিচারক চাকরদের বললেন, 'এই অসভ্যটাকে এক্ষুনি ফাঁসি দিয়ে দাও।'

চাকরগুলো কিষানকে নিয়ে গেল ফাঁসিতে লটকাতে। গলায় দড়ি পরানোর পর কিষান বলল, 'থাম! বিচারকের কাছে আমার শেষ ইচ্ছা জানাতে হবে।'

চাকরগুলো কিষানকে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। জানাল কিষানের বক্তব্য।

'তুমি আমার কাছে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাও?' বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন, আপনার চাকরগুলো এমন কষে গলায় দড়ি বাঁধল যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।' কিষান বলল।

এ-কথা শুনে বিচারক হেসে খুন হলেন। বললেন, 'এই উজবুকটাকে ছেড়ে দাও।'

আর কী! কিষান মহানন্দে বাড়ি ফিরল। বউয়ের কাছ থেকে সোনা নিয়ে সারাজীবন সুখে কাটাল কিষান আর তার বউ।
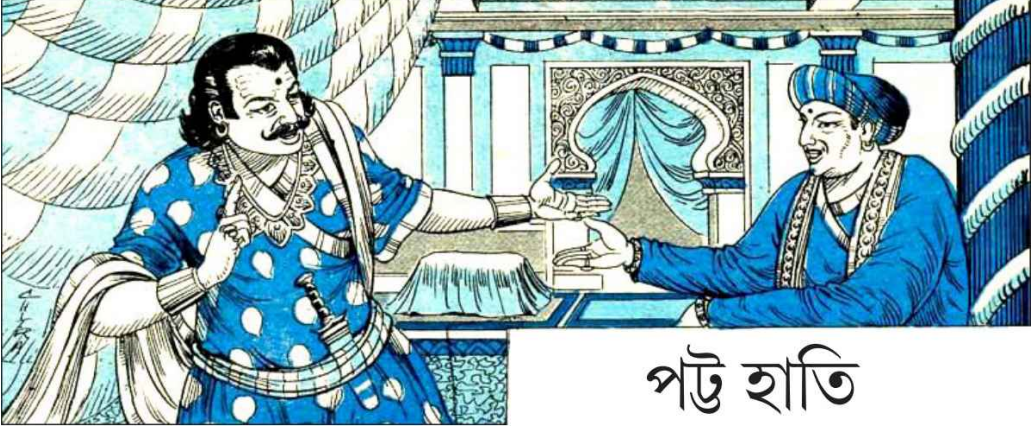
পট্ট হাতি

হাজার বছর আগেকার কথা। শরণ দেশে অশোকবর্মা নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। প্রত্যেক বছর তিনি যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। এই প্রদর্শনী থেকেই নিপুণ যোদ্ধাদের বাছাই করা হত। তাদের চাকরি দেওয়া হত রাজদরবারে। এইভাবে যাদের নিয়োগ করা হত তাদের মধ্যে একজন ছিল রবিবর্মা।

রাজা অশোকবর্মার কোনো সন্তান ছিল না। হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। তিনি বলে যেতে পারেননি তাঁর পরে রাজা কাকে করা উচিত। তাঁর দরবারে রাজা হওয়ার যোগ্য অনেকে ছিল। কিন্তু মন্ত্রী সুমন্ত ওদের মধ্যে কাউকে সিংহাসনে বসাতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ ওদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা করা হলে অন্যেরা তাঁর শত্রু হয়ে যাবে।

অগত্যা মন্ত্রী এ ব্যাপারে রাজগুরুর পরামর্শ চাইলেন। রাজগুরু বললেন, 'মন্ত্রীবর, এই সমস্যা সমাধান করার বিষয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এ দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজা নির্বাচন করবে পট্ট হাতি। এই রীতি প্রাচীন কালে ছিল এই দেশে। সেই রীতি অনুসরণ করাই হবে আমাদের কর্তব্য।'

মন্ত্রী ভাবলেন, সেই ভালো। পট্ট হাতি রাজা নির্বাচন করলে কারও কিছু বলার থাকবে না। তিনি নির্বাচনের দিন ঠিক করার ভার রাজগুরুকে দিলেন। রাজগুরু পনেরো দিন পরের একটি দিন ঠিক করলেন। মন্ত্রী ঢাক পিটিয়ে নির্বাচনের দিনক্ষণ দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন। ওই দিন পট্ট হাতি যার গলায় ফুলের মালা পরাবে সেই হবে শরণ দেশের রাজা।

মন্ত্রীর ঘোষণা শুনে কেউ খুশি হল আবার কেউ নিরাশ হল। বাকিদের মনে আশার আলো জ্বলতে লাগল।

নিরাশ হয়েছিলেন রবিবর্মা। রাজা অশোকবর্মার তিনি ছিলেন বিশ্বাসী পাত্র। দরবারের কেউ সে-কথা জানত না। রাজা সমস্ত গোপন বিষয় রবিবর্মাকে বলতেন। সমস্ত গোপন ব্যাপার জেনেও এমন সাধারণ ভাবে থাকতেন যেন কেউ তাঁর প্রতি ঈর্যান্বিত না হন। রাজা অশোকবর্মাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন তাঁর পর রবিবর্মাকেই রাজা করতে বলে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটায় কোনো কথাই বলে যেতে পারেননি। তাই ঘোষণার পর রবিবর্মার মনে হল পট্ট হাতি জানবে কী করে কে রাজা হওয়ার উপযুক্ত। যার-তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে। আর তাকেই রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে হবে।

পট্ট হাতিকে যে দেখাশোনা করে সেই মাহুতেরই ইচ্ছে জাগল রাজা হওয়ার। মনে মনে ঠিক করল হাতিকে ভালো করে শেখাতে হবে যাতে ওইদিন ঠিক তার গলাতেই মালা পরায়। এখনও পনেরো দিন বাকি আছে। এই পনেরো দিন ধরে শেখালে হাতি ঠিক তার গলাতেই মালা পরাবে ওইদিন। পট্ট হাতিশালার পাশেই একটি মহল ছিল। ওই মহলের চারপাশে ছিল এক উদ্যান। মাহুত দেয়াল টপকে উদ্যানে ঢুকে ফুল তুলে এনে মালা গাঁথল। হাতির শুঁড়ে ধরিয়ে সেই মালা তার গলায় পরানো অভ্যাস করাল।

হাতিশালার পাশের মহলটি ছিল রবিবর্মার। তিনি ওই ফুল সাজানোর কাজে ব্যবহার করতেন। রবিবর্মা লক্ষ করলেন যে উদ্যানের ফুল কেউ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন রাত্রে তিনি নিজেই উদ্যান পাহারা দেন।
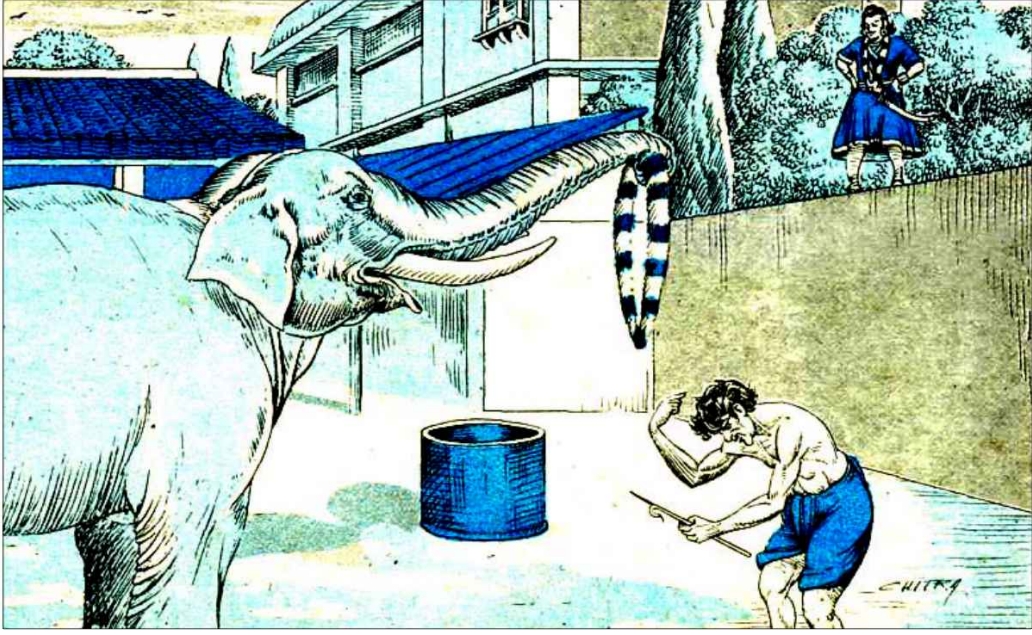
মধ্যরাত্রে মাহুত যথারীতি দেয়াল টপকে উদ্যানে ঢুকে ফুল তুলে নিয়ে যায়। রবিবর্মা তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলেন মাহুত ওই ফুল দিয়ে মালা গেঁথে সেই মালা হাতির শুঁড়ে দিয়ে তাকে দিয়ে নিজের গলায় পরাতে যাচ্ছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে মাহুত মালা পরতে যাচ্ছিল। তাই দরজায় যে রবিবর্মা ছিলেন মাহুত তা বুঝতে পারেনি। হাতি মালা নিয়ে আওয়াজ করে দরজার কাছে দাঁড়ানো রবিবর্মার দিকে শুঁড় বাড়াল। মুহূর্তে রবিবর্মা সেখান থেকে সরে গেলেন। মাহুতের মনে হল কেউ তার এই কাণ্ড দেখে ফেলেছে। তারপর থেকে মাহুত মালা পরানোর অভ্যাসও আর ওই পট্ট হাতিকে করায়নি।

রাজা নির্বাচনের দিনে পট্ট হাতির শুঁড়ে ফুলের মালা পরিয়ে মাহুত রাজপ্রাসাদে এল। কোনো এক অছিলায় মাহুত হাতির সামনে একবার দাঁড়াল। কিন্তু পট্ট হাতি তার গলায় মালা পরাল না। হাতিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে কারো অপেক্ষায় আছে। কত লোক যায়-আসে কিন্তু হাতি এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন তার কিছু করার ছিল না। অনেকক্ষণ পরে রবিবর্মাকে দেখে হাতি আওয়াজ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। তারপর নিয়ম অনুসারে রবিবর্মার রাজ্যাভিষেক হল।

কিছুদিন পরে ওই মাহুত রবিবর্মাকে একান্তে বলল, 'মহারাজ, অভয় দিলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি।'

'কী প্রশ্ন করতে চাও, কর।' রবিবর্মা বললেন।

'মহারাজ, আমি পট্ট হাতিকে আমার গলায় মালা পরানো অনেক দিন শিখিয়ে ছিলাম কিন্তু রাজা বাছাইয়ের দিনে হাতি আমার গলায় মালা না দিয়ে আপনার গলায় মালা পরাল কেন।' মাহুত বলল।

এ-কথায় রবিবর্মা হেসে জবাব দিলেন, 'তুমি পট্ট হাতিকে অনেক বিদ্যাই তো শিখিয়েছ। কিন্তু তার একটিও তোমার নিজের ক্ষেত্রে খাটাবার জন্য নয়। হাতিকে তুমি যখন মালা পরানো শেখালে তখন তার মাথায় এ-কথা ঢোকেনি যে ওকে তোমার গলাতেই মালা পরাতে হবে। এক দিন রাত্রে হাতি তোমার গলায় মালা পরাতে গিয়ে আমাকে দেখেছিল। আমার গলায় সবসময় মালা থাকে। আমার গলায় মালা দেখে হাতির মাথায় ঢুকেছে আমার গলায় মালা পরানোই তার উচিত। আর তাই সে শুঁড় দিয়ে মালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। আমি ঝট করে সরে গেলাম। আর সেই রাত্রেই আমি তোমার খারাপ মতলব টের পেলাম। আমার ধারণা সেই রাত থেকেই হাতির মগজে ঢুকে ছিল আমার গলায় মালা পরানোর চিন্তা।'

অন্ধকারে অতিথি

ইরাকের এক শহরে মহম্মদ ও জরীনা নামে এক গরিব দম্পতি ছিল। জরীনা গর্ভবতী ছিল। তার হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছা জাগল।

মহম্মদের ভাগ্যে শুকনো ভাত রুটিই জোটে না। তার উপর সুজি পাবে কোথা থেকে। জরীনার ইচ্ছা পূরণ করবে কী করে! একে বউটার বয়স কম, তায় গর্ভবতী। এই সময় মুখে রুচি থাকে না। সামান্য একটু হালুয়া খেতে চেয়েছে। কোনোদিন কিছু মুখ ফুটে বলে না। তাই মহম্মদ ঠিক করল যেকোনোভাবে বউকে সে হালুয়া খাওয়াবে।

আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। তাই, ব্যাবসাদাররা ভেজা জিনিস রোদে দিয়েছিল। এক জায়গায় সুজি রোদে দেওয়া ছিল। তা দেখেই মহম্মদ তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে গায়ে তেল মেখে ওই জায়গায় চলে এল। হাঁটতে হাঁটতে সে ওই সুজির উপর পড়ে গড়াতে গড়াতে সারা গায়ে সুজি মেখে হাবাগোবার মতো উঠে বাড়ি ফিরল। সুজিটা চেঁচে একটা কুলোতে রেখে স্নান করে নিল।

এবার সে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তেলের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে দাদা, তেল কত করে?' কথা বলতে বলতে তেল দেখার নাম করে তেলের টিনে ঝুঁকে তেল দেখার অভিনয় করল। পাগড়ি তেলের টিনে পড়ে গেল। পাগড়িটা তুলে নিয়ে দোকানদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাড়ি ফিরল। পাগড়ি নিঙড়ে যে তেল বেরুলো সেই তেল একটা পাত্রে রাখল। তেল আর সুজি তো জুটলো আর চাই কাঠ ও গুড়।

মহম্মদ আবার বেরুল। গুড়ের দোকানে গিয়ে বলল, ‘হুজুর আমার এক গাড়ি গুড় কিনবেন। আপনার কাছে সব চেয়ে ভালো যে গুড় আছে তার একটু নমুনা আমাকে দিন তো। নমুনা হিসেবে অতটা গুড় যে পাবে তা ভাবতে পারেনি সে। তার থেকে কিছুটা বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে কাঠ কিনল।

হালুয়া তৈরি হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। ওরা আলো ধরানোর চেষ্টা করল না। কোনোদিন যাদের ঘরে আলো ধরে না তার ঘরে হঠাৎ আলো দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। তাই তারা সেই অন্ধকারেই হালুয়া খেতে বসল। এক পাত্রেই হালুয়া রেখে দু-জনে দু-দিকে বসল। হালুয়া মুখে তুলতে যাবে এমন সময় আবুল নামে এক আত্মীয় দূর থেকে এল।

আবুল দেখল অন্ধকার হলেও লোক আছে বাড়িতে। সে পা টিপে টিপে ওদের পিছনে বসে হাত বাড়িয়ে হালুয়া তুলে খেতে লাগল। সে খাচ্ছে আর বেশ মজা পাচ্ছে। ওর হাতের সঙ্গে মহম্মদ ও জরীনার হাত লাগছিল। কিন্তু দু-জনের কেউই ভাবতে পারেনি যে ওটা তৃতীয় কোনো লোকের হাত। হালুয়া তাড়াতাড়ি সাবাড় হয়ে গেল।

‘এত তাড়াতাড়ি হালুয়া ফুরিয়ে গেল কী করে? আমি তো সামান্য একটু খেয়েছি।’ জরীনা বলল।

‘আমিও তো খুব কম খেয়েছি। তোমার জন্যই সব রেখে দিয়েছি।’ মহম্মদ বলল।

‘তোমাদের সঙ্গে আমিও তো খেয়েছি।’ আবুল বলে উঠল। তারপর বাতি জ্বালিয়ে আবুলকে ওরা দেখতে পেল।

বউকে যে কত কাণ্ড করে হালুয়া খাওয়াতে পেরেছে তা শুনে আবুলের মনে ওদের প্রতি কেমন যেন মায়া হল। সে মহম্মদের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে সুজি, গুড়, তেল, কাঠ কিনে আনতে অনুরোধ করল।

কিপটে ব্যাবসাদার

কুন্তীপুরগ্রামে ছিল এক ধনী ব্যাবসাদার। নাম তার উপল। তার ছেলের নাম বিষ্ণু। ভালো ছেলে। লেখাপড়া করত। বাপের কারবার তার পছন্দ হত না। বড়ো হয়ে সে ন্যায্য দামে তরিতরকারির ব্যাবসা আরম্ভ করল।

ওই গ্রামেই একটি চৌধুরী পরিবার ছিল। ওই পরিবারের কর্তা দীনু চৌধুরীর একসময় খুব নামডাক ছিল। টাকাও ছিল খ্যাতিও ছিল। বেচারা অংশীদারের কাছে ধোকা খেয়ে একেবারে বসে গেল।

দীনুর মেয়ে লতা খুব শান্ত মেয়ে। তার রুচি ছিল উচ্চ মানের। বিয়ের বয়স হয়ে ছিল লতার। কিন্তু গরিব বাবা মেয়ের জন্য কোনো যোগ্য পাত্র জোগাড় করতে পারল না।

কিপটে উপলের বড়ো আশা ছিল তার ছেলের সাথে এক রাজকুমারীর বিয়ে দেবে। সে আনবে অর্দ্ধেক রাজত্ব। আসলে লতা সব দিক থেকে বিষ্ণুর যোগ্য পাত্রী ছিল। বিষ্ণুকে দেখে লতার মা মনে মনে ভাবে, এ-রকম একটা লোককে জামাই করতে পারলে কত ভালো হত।

বিষ্ণু লতাকে দেখে বউ করে নেবার কথা ভাবত। একদিন দীনুর বউ স্বামীকে বলল, 'একবার উপলের সাথে দেখা করে, লতাকে তার বউমা করে নিতে বল না? বিষ্ণু ছেলেটা তো ভালো। এত ভালো সম্বন্ধ আমরা আর কোথায় পাব।'

'ওসব কথা ভুলে যাও। উপল নিজের ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা এমন ঘরে করাতে চায় যাতে তার বেশ কিছু সম্পত্তি বাড়ে।'
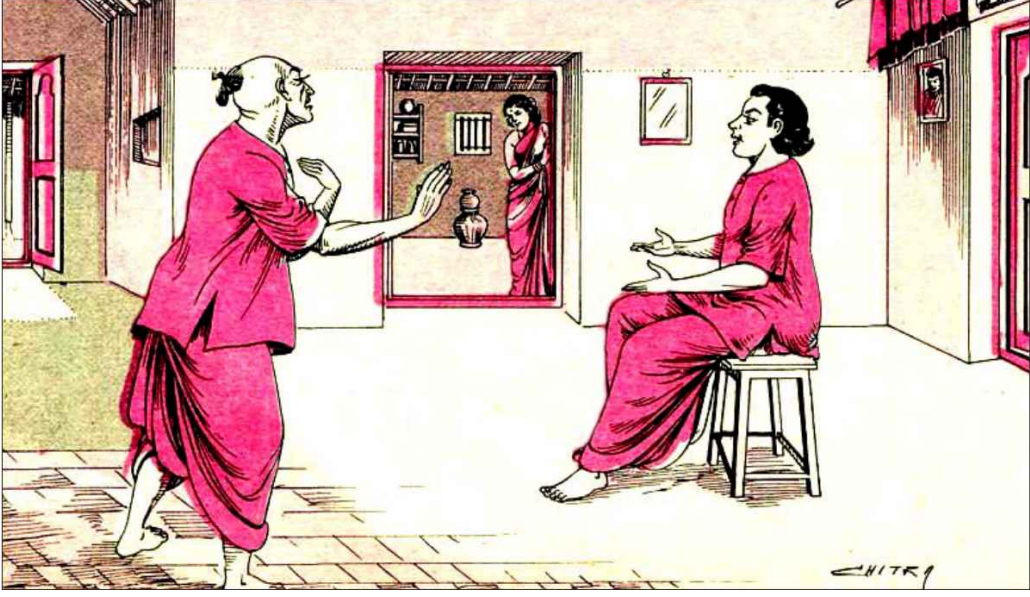
দীনুর বউ বিষ্ণুকে একদিন বাড়িতে খেতে ডাকল। খাবার সময় কথায় কথায় মনের কথা প্রকাশ করল।

'আমার তো কোনো আপত্তি নেই। আপনার মেয়ে সুন্দরী, বেশ শান্ত। একসময় আপনার পরিবার গ্রামের নামকরা পরিবার ছিল। এখন হয়তো আপনারা গরিব হয়ে গেছেন। শুধু আপনার মেয়ে পেলেই ধন্য হতাম। আর কিছু নিতাম না। কিন্তু আমার বাবার যা খাঁই সেই খাঁই পূরণ করার ক্ষমতা কার আছে। আপনার পক্ষে তাঁর খাঁই মেটানো সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকলেও আমার উপায় নেই। আপনারা বরং অন্য পাত্রের সন্ধান করুন।' বিষ্ণু বলল।

বিষ্ণু ও লতার মার মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সেখানে লতার মামা শ্যামগুপ্ত ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল খুব। সমস্ত কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক আছে। ছেলের যখন আমাদের লতাকে পছন্দ তখন বাকি কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি দেখছি।'

পরের দিন সকালে শ্যামগুপ্ত উপলের বাড়িতে গেল। একথা-সেকথার পর সে বলল, 'ভালোকথা আপনি লতাকে আপনার বউমা করে আনলেই তো পারেন। বিষ্ণু তো বড়ো হয়েছে। জ্ঞান বুদ্ধিও তার আছে।'

'বেশ বলেছেন। আরে যাদের এবেলা চলে তো ওবেলা চলে না তাদের ঘরের মেয়েকে ছেলের বউ করে আনলে কী পাব? এ কখনোই হতে পারে না।' উপল জবাবে বলল।

এ-কথায় কোনোরকম বিচলিত না হয়ে শ্যামগুপ্ত বলল, 'তাহলে আপনি হয়তো আমার ভাগনির অদ্ভুত শক্তির কথা জানেন না। সে তো জলে একবার ফু দিয়ে অসাধারণ মিষ্টি জল করে ফেলতে পারে।'
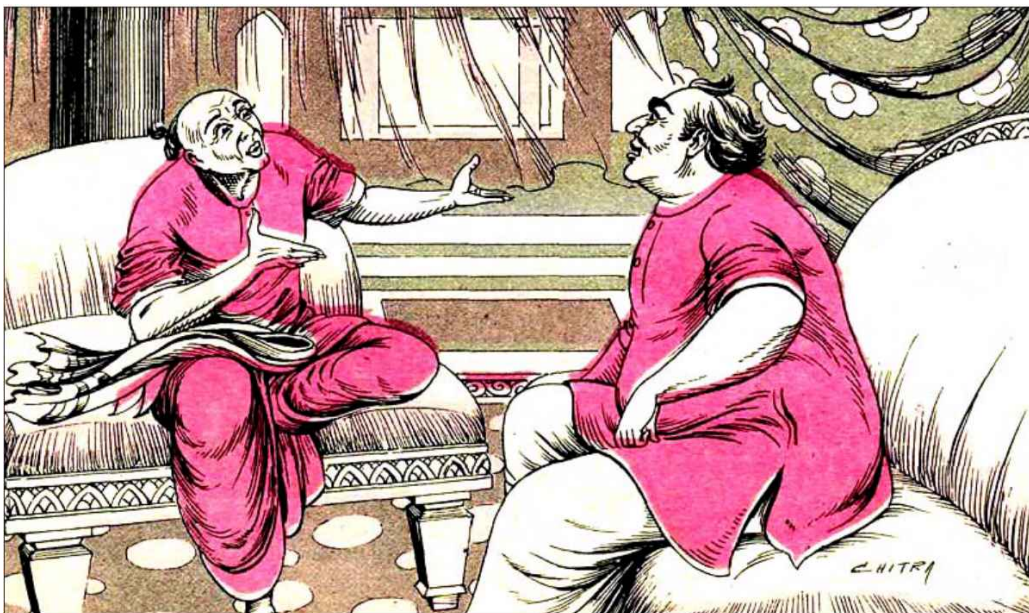
উপল বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী বললেন, মিষ্টি জল? কী করে সম্ভব?'

'আজ্ঞে আপনি তো ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কত পাবেন তারই হিসেব করেন। পণের টাকার কী দাম আছে! আজ আসে কাল চলে যায়। লতার মতো মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে আনলে মিষ্টি জল বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পারবেন।' শ্যামগুপ্ত বলল।

লাখ লাখ টাকার কথা কানে যেতেই উপল চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, 'এ কি সত্য? এ কি সম্ভব?'

'আজ সন্ধেয় বোনের বাড়িতে আসুন না একবার। আপনি নিজে যাচাই করে দেখুন না আমি যা বলছি তা সত্য না মিথ্যা। ভালো কথা, আপনি যাওয়ার সময় এক গ্লাস জল নিয়ে যাবেন।' শ্যামগুপ্ত বলল।

সেদিন সন্ধ্যায় ছেলে আর বউকে সঙ্গে নিয়ে উপল দীনু চৌধুরীর বাড়ি গেল। উপলের বউ লতাকে দেখে আর গুণের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে মনে মনে লতাকে ছেলের বউ করে নেয়।

উপল ওই গ্লাসের জল লতার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি জল এনেছি। তোমার মামার কাছে শুনেছি তুমি নাকি সাধারণ জলে ফুঁ দিয়ে মিষ্টি জল করে ফেলতে পার।'

লতা উপলকে বলল, 'আপনি একটু জল খেয়ে যাচাই করে দেখে নিন।'

উপল একটু জল খেয়ে নিয়ে বলল, 'এই জলের স্বাদ সাধারণ জলের মতোই লাগছে।'

লতা উপলের হাত থেকে জল নিয়ে একবার ফুঁ দিয়ে তার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'এবার এই জলের স্বাদ কেমন লাগে খেয়ে দেখুন।'
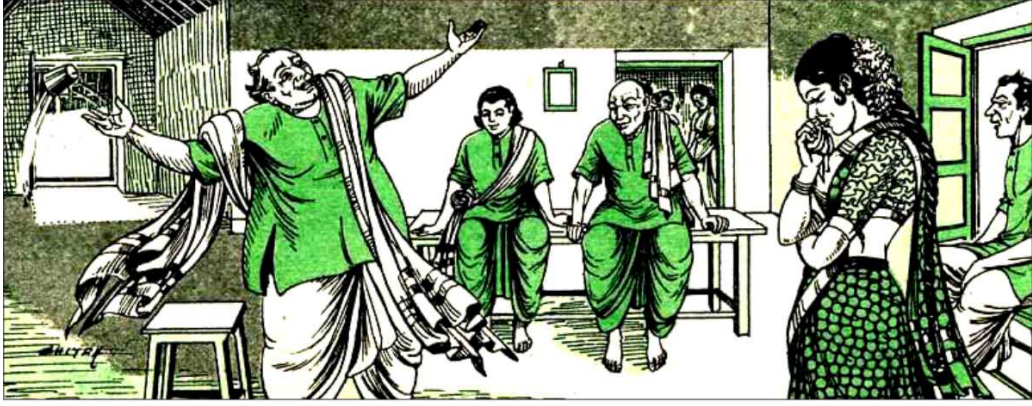
উপল ওই জল খেয়ে আনন্দে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, ‘এ তো অদ্ভুত ব্যাপার! মা, আমি তোমাকে আমার পুত্রবধূ করে নিতে চাই। আমি এক্ষুনি এই সোনার হার দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করতে চাই।’

লতা ও বিষ্ণুর বিয়ে ঘটা করে হল। দীনু চৌধুরীর এক পয়সাও খরচ হল না সেই বিয়েতে। সমস্ত খরচের ভার উপল নিজেই ঘাড়ে নিল।

বিয়ের পর বিষ্ণু লতাকে বলল, ‘হ্যাঁগো, তুমি কী করে পারলে বলত, সাধারণ জল মিষ্টি করতে?’

‘ওহে বীর পুরুষ ধরতে পারনি? জলে স্যাকারিন মিশিয়ে ছিলাম। তোমার বাবার কাছ থেকে গেলাসটা নেবার সময় স্যাকারিন লাগানো আঙুল ডুবিয়ে ছিলাম ওই জলে। ফলে জল মিষ্টি হয়ে গেল।’ লতা বলল।

‘তাহলে এখন কী করবে?’ বিষ্ণুর প্রশ্ন।

‘কী আর করব। বলব, বিয়ের পর আমার পদবি বদলের সাথে সাথে আমার ওই বিচিত্র ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। আর যা বলার তা তুমি আর তোমার মা গুছিয়ে বলবে।’ লতা হাসতে হাসতে চটপট বলে ফেলল।
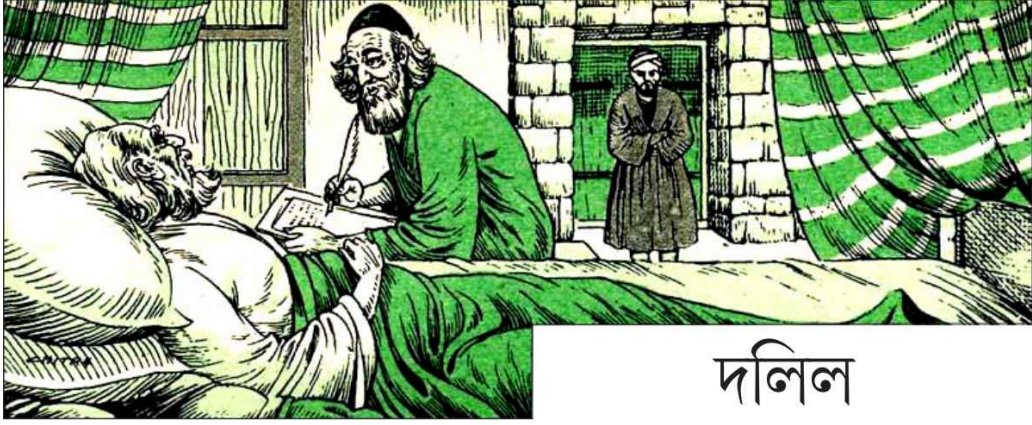
দলিল

জেরুজালেম শহরে এক নাম করা ব্যাবসাদার ছিল। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ব্যাবসাদার দূর দূর দেশে গিয়ে ব্যাবসা করত। তার ছেলে বাড়িতে পড়াশোনা করত। যাবার সময় ব্যাবসাদার একজন গোলামকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

একবার ব্যাবসাদার দূর দেশে গিয়ে অসুখে পড়ে গেল। অনেক দিন কেটে গেল কিন্তু অসুখ আর সারে না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ব্যাবসাদার নিজের একমাত্র ছেলে সম্পর্কে ভাবতে লাগল। কত কথা তার মনে জাগল। ছেলে এখনও ছোটো। এখনই ছেলের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলে গোলাম সব কিছু হাতড়ে নিয়ে তাকে পথে বসাবে। অনাথ করে দেবে। কী করলে যে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যাবসাদার মনে মনে কী যেন ঠিক করে নিল।

ব্যাবসাদার গোলামকে পাঠাল শহর থেকে এক দলিল লেখককে ডেকে আনতে। দলিল লেখক এল। লোকটা অভিজ্ঞ এবং সৎ। ব্যাবসাদারের বক্তব্য অনুসারে দলিল লেখক লিখে গেল। সেই দলিল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল গোলাম। দলিলের শেষে লেখা ছিল অন্য কথা। ব্যাবসাদারের ছেলে ইচ্ছে করলে যেকোনো একটা জিনিস ওই সম্পত্তি থেকে নিতে পারে। এই ছিল ওই দলিলের বয়ান।

ব্যাবসাদার দলিল লেখানোর কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। তার গোলাম দলিল নিয়ে তাড়াতাড়ি জেরুজালেম ফিরে এল। দলিলের বয়ান অনুসারে ব্যাবসাদারের সমস্ত সম্পত্তি গোলাম দখল করে নিল।

বাবার মৃত্যুর পর ব্যাবসাদারের ছেলে গোলামের কাছে সমস্ত সম্পত্তি চাইল।

গোলাম সম্পত্তি দিতে রাজি না হয়ে ওই দলিল দেখিয়ে বলল, ‘এই দলিল অনুসারে তুমি কোনো একটা জিনিস চেয়ে নিতে পার।’

ব্যাবসাদারের ছেলে দলিলের বয়ান পড়ে আশ্চর্য হল। সে ভাবতেই পারল না কী করবে। শেষে সে বাপের এক বন্ধুর কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল।

ব্যাবসাদারের বন্ধু ছিল বৃদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বন্ধুর ছেলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলল, ‘তুমি বাছা অত ভেব না। অত চিন্তার কোনো কারণ নেই। এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তোমার বাবা এভাবে দলিল লিখিয়ে তোমার মস্তবড়ো উপকার করেছেন। এক কাজ কর, কাল তুমি বিচারালয়ে এসো। গোলামকেও বল বিচারালয়ে যেতে। সেখানে আমি যা বলব তাই করবে। তাতে তোমার উপকার হবে।’

পরের দিন ব্যাবসাদারের ছেলে ও গোলাম বিচারালয়ে গেল। বিচারক দলিলের বয়ান পড়ল। বিচারক দলিল পড়ে ব্যাবসাদারের ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, ‘দলিলের বয়ান শুনলে তো? তোমার বাবার সম্পত্তির কোনটা তুমি চাও বল, তুমি পাবে।’

এই প্রশ্নের জবাব আগে থেকেই বাবার বন্ধুর কাছ থেকে শিখে রেখেছিল ব্যাবসাদারের ছেলে। সে তার বাপের গোলামের দিকে তর্জনি দেখিয়ে বলল, ‘আমি এই গোলামকে চাই।’

বিচারক গোলামকে ব্যাবসাদারের ছেলের অধীন করে দিল। এই ভাবে গোলামের নামে লিখে দেওয়া সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল ব্যাবসাদারের ছেলে।
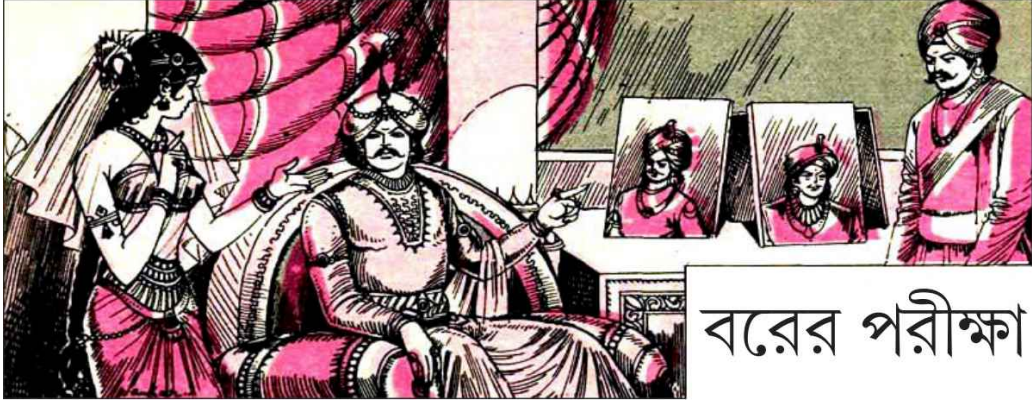
বরের পরীক্ষা

মালব দেশের রাজা মতিমন্তের এক সুন্দর কন্যা ছিল। নাম তার চন্দ্রিকা। রাজা খুব আদরযত্নে তাকে গড়ে তুললেন। মতিমন্ত পণ্ডিতদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি নামকরা পণ্ডিতদের দিয়ে মেয়ের লেখাপড়া করাতেন।

চন্দ্রিকার বিয়ের বয়স হল। তার বিয়ের ব্যাপারে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজকুমারদের ছবি আনানো হল।

ওই ছবিগুলো দেখে চন্দ্রিকা বলল, ‘বাবা, এ ছবি দেখে আমি এদের জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় কী করে পাব? আমার চেয়ে বুদ্ধিতে যে খাটো তাকে আমি বিয়ে করব না। আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে আমি রাজকুমারদের বুদ্ধির পরীক্ষা করে দেখতে চাই। সেই পরীক্ষায় যে সফল হবে তাকে আমি বিয়ে করব।’

রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়ের কথায় রাজি হলেন।

চন্দ্রিকা এই শ্লোকটি লিখে রাজার হাতে দিল।

প্রাত র্দ্যূত প্রসঙ্গেন,
মধ্যাহ্নে স্ত্রী প্রসঙ্গতঃ
রাত্রৌ চোর প্রসঙ্গেন
কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।

রাজা এই শ্লোকটিকে সভাভবনের এক শিলার উপর সোনার অক্ষরে লেখালেন। ব্যবস্থা করলেন স্বয়ংবর সভার। বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের কাছে খবর পাঠালেন।

এই খবর পেয়েই এক এক করে বহু দেশের রাজকুমার আসতে লাগল। সবাই ওই শ্লোক পড়ে অর্থ করল এইভাবে 'সকালে জুয়া খেলার বিষয়ে আলোচনা করে, দুপুরে স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলে, রাত্রে চোরদের সম্পর্কে আলোচনা করে বুদ্ধিমানরা নিজেদের সময় অতিবাহিত করেন।'

কিন্তু চন্দ্রিকার কাছে তার শ্লোকের এই অর্থ ভালো লাগল না। কিন্তু এ ছাড়া ওই শ্লোকের আর যে কী অর্থ হতে পারে তা কেউ বুঝতে পারল না। রাজা ও রানির কাছে মেয়ের এসব ব্যাপার একটু বাড়াবাড়ি মনে হল।

জয়সিংহ নামে এক যুবক এই খবর পেয়ে খুব উৎসাহিত হল। সে ছিল খুব বুদ্ধিমান। মনে মনে তার দারুণ ইচ্ছা ছিল রাজকুমারীকে বিয়ে করার। কিন্তু সে ছিল মালব দেশের সেনাপতির ছেলে। সে রাজার অনুমতি নিয়ে ওই শ্লোকের সবিস্তার ব্যাখ্যা ও অর্থ দরবারে এইভাবে পেশ করল:

'এই শ্লোকে বুদ্ধিমানরা যে কীভাবে সময় কাটায় তাই জানানো হয়েছে। অতএব বুদ্ধিমানদের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তিতেই শ্লোকটি রচিত। এই কথা মনে রাখলে এখানে জুয়ার অর্থ মহাভারতের দ্যূত বা জুয়া। একই ভাবে বিচার করলে স্ত্রীর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে রামায়ণ। কৈকেয়ির বর আর সীতার অপহরণ ছাড়া রামায়ণের কথা ভাবতেই পারি না। তাই স্ত্রীর প্রসঙ্গ বলতে এখানে রামায়ণের আলোচনার কথাই বলা হচ্ছে। আর চোর প্রসঙ্গের অর্থ কৃষ্ণ প্রসঙ্গ। অত বড়ো নাম করা চোর কৃষ্ণ ছাড়া আর কে হতে পারে। এইভাবে অর্থ করলে সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ আশাকরি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জয়সিংহের অর্থ চন্দ্রিকার ভালো লাগে। চন্দ্রিকা বরমাল্য দিয়ে জয়সিংহকে বরণ করে নিল। সাড়ম্বরে উভয়ের বিয়ে হল।

ফাটল

সোনার প্রতিমা গ্রামে বীরবাহু নামে এক কিষান ছিল। তার ছিল চার একর জমি। সে দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। তাতেই নিজের সংসার চালাত।

সে-বছর বৃষ্টি হয়নি। আকালের বছরে চোরের উপদ্রব বাড়ল। পরের বছর বৃষ্টি হল। খেতে খেতে ফসলের বাহার।

বীরবাহুর খেতেও ফসলের বাহার। আগের বছর যারা চুরি করেছিল তারা অত সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারল না। তাই বীরবাহু রাত্রে নিজের খেত পাহারা দিত। সে রাত্রে খুব ঠান্ডা পড়েছিল। বীরবাহু আর জাগতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ছুটে গেল। কানে গেল খস খস আওয়াজ। বুঝল খেতে চোর ঢুকেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খেতে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ করল কয়েক জন তার খেতের ফসল কাটছে। জ্যোৎস্না রাত। বীরবাহু ওদের চিনতে পারল। ওরা তার গ্রামেরই চোর। একা চার জন চোরকে ধরতে গেলে মারা পড়তে হবে ভেবে সে একটা উপায় ঠিক করল।

যারা ফসল কাটছে তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন বেনে, একজন ক্ষত্রিয় আর একজন চাষি।

বীরবাহু প্রথমে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বলল, ‘হে ব্রাহ্মণ, আপনি দেবতার সমান। আপনার কোনো দরকার ছিল না এত রাত্রে এভাবে ফসল কেটে নিয়ে যাবার। আমাকে হুকুম করলেই পারতেন। সোজা আপনার বাড়িতে

ফসল কেটে পৌঁছে দিতাম। এখন আপনি এসেছেন যখন, যত ইচ্ছা ফসল কেটে নিয়ে যান। এই যত ফসল দেখছেন সবই আপনার আশীর্বাদের ফলে হয়েছে।'

কিষানের কথা শুনে ব্রাহ্মণ আনন্দে আরও বেশি করে ফসল কাটতে লাগল।

তারপর বীরবাহু ক্ষত্রিয় চোরের কাছে গিয়ে বলল, 'হে ক্ষত্রিয়, আপনি রাজা লোক, এই সমস্ত খেত তো আপনারই। আমি আপনার প্রজা মাত্র। আপনার যত ইচ্ছা ফসল কেটে নিয়ে যান।'

ক্ষত্রিয় বেশি করে ফসল কাটতে লাগল। বীরবাহু বেনের কাছে গিয়ে বলল, 'আজ্ঞে বিপদে পড়লেই আপনার কাছে ছুটে গিয়ে ধার করে আনি। আপনি যত চান ফসল কেটে নিয়ে যান। কেউ বাধা দেবে না।'

বীরবাহু তারপর কিষানের কাছে গিয়ে বলল, 'আরে ভাই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বেনেকে তো দান দিতে হয়, কর দিতে হয়, ধার করতে হয়, সুদ দিতে হয় কিন্তু তুমি কিনা আমারই মতো এক কিষান হয়ে এক কিষানের খেতের ধান চুরি করতে এসেছ? চল আমার মা ডাকছে। বিচার হবে।' এ-কথা বলে ওই কিষানকে বীরবাহু টানতে টানতে নিয়ে গেল কুটিরে। বাকি যারা খেতে ছিল তারা ভাবল কিষানের কোনো অধিকার ছিল না তাই তাকে ধরে নিয়ে গেল। ওরা কিষানকে সাহায্য করল না।

বীরবাহু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল, 'মশাই আমার মা বলেছে, ব্রাহ্মণের উচিত কেউ দান করলে নেওয়া। চুরি করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। চলুন আমার মায়ের কাছে। তিনি বিচার করবেন।' বীরবাহু তার হাত ধরে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার বীরবাহু ফিরে এল। তখনও বাকি দু-জন ফসল কাটছে আপন মনে। এবার সে বেনের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'ওহে মহাজন, আমার মার কাছে জানলাম তুমি নাকি আমাদের কোনোদিন ধার দাওনি। চল আমার মার কাছে। তিনি তোমার বিচার করবেন।' বীরবাহু তাকে নিয়ে গেল।

বেনে ক্ষত্রিয়ের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তার কাছে সে সাহায্য চায়। সে যেন তাকে ছড়িয়ে নেয়।

বেনেকে রেখেই কিষান আবার লাঠি হাতে খেতে গেল। তাকে দেখেই ক্ষত্রিয় যত ফসল নিতে পারল তুলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

বীরবাহুও ছাড়ার পাত্র নয়। সেও ধাওয়া করল তাকে। দূর থেকে তাক করে লাঠি ছুড়ে মারল। ক্ষত্রিয় পায়ে চোট পেয়ে পড়ে গেল। তারপর তার কাছে গিয়ে বীরবাহু বলল, 'এবার যাবে কোথায়? উঁ? তোমার কাজ লোকের জিনিস যাতে চুরি না যায় তা লক্ষ রাখা আর তুমি কিনা নিজেই চুরি করছ। হারামি। চালাকি পেয়েছ!' বলে তাকে মারতে লাগল।

ক্ষত্রিয় মার খেতে খেতে বলল, 'আমাকেও তোমার মার কাছে নিয়ে যাও না ভাই। তোমার মা নিশ্চয়ই ওই কিষান, ওই ব্রাহ্মণ আর ওই বেনেকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাকেও নিয়ে যাও না ভাই। কেন মারছ।'

'আগে তোমাকে ভালো করে বাঁধি। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওদের যেখানে রেখেছি সেখানে ফেলে রাখব। পরের কথা পরে।' বীরবাহু বলল।

'তোমার মার কাছে নিয়ে চল না ভাই। বিচার হবে।' ক্ষত্রিয় বলল।

'আমার মা হচ্ছে আমার এই জমি। এই মাটি। এই মাটিই আমার মা।' বীরবাহু বলল।

তারপর ওদের সবাইকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলে রেখে বীরবাহু ডাকাডাকি করে গ্রামের লোককে জড়ো করল। ওরা সবাই মিলে উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে চোরদের পুলিশের হাতে দিল।

বাজে খরচ

বেশ কিছুদিন আগের কথা। সুন্দর নগর নামক এক ছোট্ট শহরে রাম সাহা নামে এক ধনী লোক ছিল। বাড়ির কোনো কাজেও টাকা খরচ করতে তার মন চাইত না। খরচের নামে তার জ্বর আসত।

একদিন রাম সাহা কোনো-একটা কাজে পাশের গ্রামে যাচ্ছিল। পথে তার নজরে পড়ল একটা খেজুর গাছ। গাছে খেজুর ভরে ছিল। রাম সাহা বাচ্চা বয়স থেকেই খেজুর খেতে ভালোবাসত। অত খেজুর একটি গাছে দেখে রাম সাহার জিভে জল এল। কিন্তু সে গাছে উঠতে পারত না। আবার খেজুর গাছ থেকে তার পা সরছিল না। শেষে এক-পা এক-পা করে কোনোরকমে ধরে ধরে গাছে উঠতে লাগল। খেজুরের দিকে রয়েছে চোখ আর মন। তাই কোনোরকমে উঠে গেল খেজুর গাছের মাথায়।

রাম সাহা যত পারল পেট পুরে খেজুর খেল। তাতেও অত খেজুর গাছে রেখে তার নাবতে ইচ্ছে করছিল না। আরও কিছু খেজুর পেড়ে পকেটে ভরতি করে পুরে নিল। তারপর নাবতে গিয়ে একবার নীচের দিকে তাকাতেই তার মাথা ঘুরে গেল। মাথা ঘুরতেই ভীষণ ভয় করল তার। প্রতি মুহূর্ত মনে হল এই বুঝি পড়ে যাবে। বলল, 'হে ভগবান, আমি মঙ্গল মতো নাবতে পারলে তোমার নাম করে এক হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব।'

মানত করার পর তার সাহস যেন বেড়ে গেল। সে নাবতে লাগল। মাথা ঘোরা কমে গেল। অর্দ্ধেক নাবার পর সে নীচের দিকে তাকাল। তার মনে হল বিপদ

অনেকখানি কেটে গেছে। সে মনে মনে ভাবল, পাঁচ-শো খাওয়ালেই যথেষ্ট। যত মানত হবে ঠিক তত জনকেই যে খাওয়াতে হবে এমন কোনো বিধান নেই।

আরও কিছুটা নাবার পর রাম সাহার মনে হল পাঁচ-শো লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর কোনো মানে হয় না। এক-শো জনই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত সে নীচে নেবে গেল। নেবেই বলল, এক-শো আজেবাজে লোককে নিমন্ত্রণ করা, এক সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করার সমান।

বাড়িতে ফিরে রাম সাহা ভাবতে লাগল কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যায়। কোনো মোটা ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত হবে না। তার বাড়ির পূজারি শিবশাস্ত্রী খুব রোগা লোক। নিশ্চয় কম খাবে। সাত-পাঁচ ভেবে রাম সাহা ঠিক করল শিবশাস্ত্রীকেই নিমন্ত্রণ করা হবে। সোজা সে শিবশাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাকে পরের দিন তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এল।

হাড়কেপ্পন লোক হিসেবে কুখ্যাত রাম সাহার নিমন্ত্রণ পেয়ে শিবশাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেই মূল্যবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

রাম সাহা বাড়ি ফিরে বউকে পথের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল, 'আজ আমি যে কাজে গিয়েছিলাম সে কাজ পুরোপুরি হয়নি। কাল আবার যেতে হবে। শিবশাস্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। সমস্ত ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। খরচ যাতে বেশি না হয় সেদিকে ভালোভাবে নজর রেখো।'

পরের দিন সকালে রাম সাহা নিজের কাজে পাশের গাঁয়ে চলে গেল।

দুপুরে শিবশাস্ত্রী ঠিক খাওয়ার সময় হাজির হল। রাম সাহার বউ তাকে খেতে বসাল। শিবশাস্ত্রী রোগা হলেও খেতে পারে খুব। সে একাই তিন জনের খাবার দিব্যি খেয়ে উঠল। মিষ্টি যত পারল খেল বাকিগুলো বেঁধে নিল। বাকি রইল দক্ষিণা।

'নিমন্ত্রণ করলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাও দিতে হয়। অন্তত দুটো সোনার মুদ্রা দেওয়া উচিত।' শিবশাস্ত্রী বলল।

বাধ্য হয়ে দুটো সোনার মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে রাম সাহার বউ ব্রাহ্মণ বিদায় করল।

তার পরের দিন রাম সাহা বাড়ি ফিরল। তার বউ ব্রাহ্মণ কত খেল, কত দক্ষিণা নিল সব জানাল। সমস্ত ব্যাপার শুনে রাম সাহার তো চক্ষুস্থির। বুক ধক ধক করতে লাগল। সে বউকে গালাগাল দিয়ে বলল, 'তুমি একটা ইয়ে। মাথায় তোমার কিচ্ছু নেই। তোমাকে বোকা বানিয়ে লোকটা আমাকে ফতুর করে গেছে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, ব্যাটার মজা দেখাচ্ছি।' বলতে বলতে লাঠি হাতে সে ছুটে গেল শিবশাস্ত্রীর বাড়ি।

শিবশাস্ত্রী আগেভাগেই অনুমান করেছিল রাম সাহা এত খরচের ব্যাপার কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তেড়ে আসতে পারে তার বাড়ি। তাই সে রাম সাহার আসার খবর পেয়েই সটান শুয়ে পড়ল। তার ছেলে আর বউ তার কাছে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল।

রাম সাহাকে দেখতে পেয়েই শিবশাস্ত্রীর ছেলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনি আমাদের একি সর্বনাশ করলেন? নিমন্ত্রণ করে বাবাকে শেষে কিনা বিষ খাওয়ালেন! বৈদ্য বলেছে খাবারে বিষ মেশানো ছিল। বিষ বমি করাতে চারটি স্বর্ণমুদ্রা নেবে। আপনি এখনই বিচারকের কাছে চলুন।'

রাম সাহা ভাবল বিচারক বদ্যির খরচ তো চাইবেই উপরন্তু জরিমানাও করবে। রাম সাহা ক্ষমা চেয়ে বলল, 'বাবা, ওষুধের খরচপত্তর আমিই দেব। আর বিচারকের কাছে গিয়ে কাজ নেই।'

শিবশাস্ত্রীর ছেলে রাম সাহার প্রতি বিরক্তির ভাব দেখিয়ে চারটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদায় করল। তারপর থেকে খেজুরের কথা মনে পড়লেই রাম সাহার বুক ধক করে ওঠে।
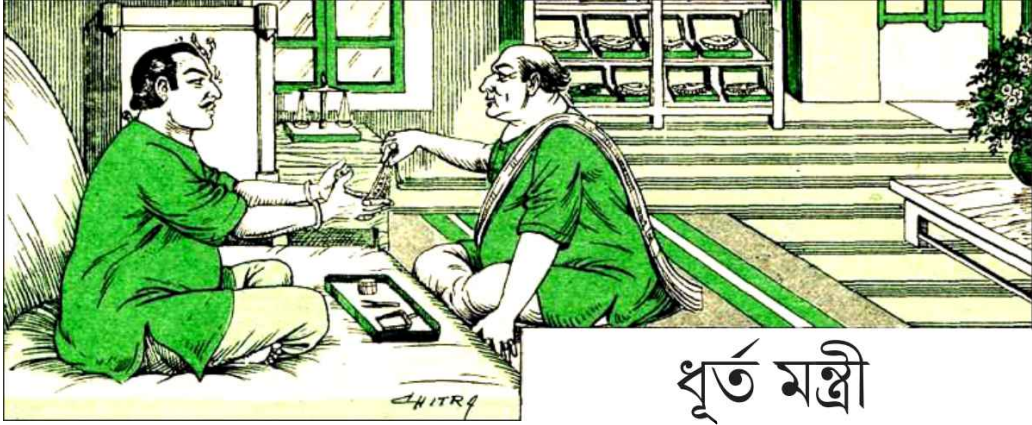
ধূর্ত মন্ত্রী

ধর্মপুর গ্রামে এক জহুরি ছিল। লোকটা ছিল সুবিবেচক ও সত্যবাদী। তাই তার সাথে ব্যাবসা করে কেউ কোনোদিন ঠকেনি। তার বিরুদ্ধে কারও কোনো নালিশ ছিল না। তার প্রতি সকলের বিশ্বাস ছিল।

একদিন এক ভদ্রলোক জহুরির হাতে একটা হিরার মালা দিয়ে সেটাকে পাঁচ-শো স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে অনুরোধ করল। জহুরি তার কথায় রাজি হল।

জহুরির দোকানে যত খদ্দের যেত প্রত্যেককে সে ওই হিরের মালা দেখাত। জহুরি এইভাবে মালাটি বিক্রি করার অনেক চেষ্টা করল।

একদিন শেখর নামে এক মন্ত্রী জহুরির কাছে কোনো এক কাজে এসেছিল। মন্ত্রী হিরার মালা দেখে মনে মনে কী এক মতলব এঁটে খুব খুশি হয়ে বলল, 'এই হার আপনার কাছে এল কী করে?'

জহুরি জানত যে মন্ত্রীমশাই অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির লোক। যেমন নীচ তেমনি ধূর্ত, তবু কথার জবাবে কথা বলতেই হয়। তাই সে বলল, 'এক ভদ্রলোক এটাকে পাঁচ-শো স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে আমার কাছে রেখে গেছেন।'

'পাঁচ-শো সোনার মুদ্রা! অনেক দাম বলছেন তো! চার-শো মুদ্রায় হলে আমি এক্ষুনি কিনতাম। পারবেন চার-শো-তে দিতে?' শেখর বলল।

'তা হতে পারে না। ভদ্রলোক যে পাঁচ-শো মুদ্রায় বিক্রি করতে বলেছেন!' জহুরি মাথা নেড়ে বলল।

'তাহলে আপনাকে একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে। স্ত্রীকে মালাটা দেখাতে চাই! স্ত্রীর যদি পছন্দ হয় তবে পাঁচ-শো মুদ্রাতেই কিনব।' শেখর বলল।

মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে জহুরি ওই হার নিয়ে তার সঙ্গে গেল।

'আপনি হারটা আমার হাতে দিন। এখানে বসুন। আমি ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে আসছি।' এ-কথা বলে শেখর জহুরিকে বাইরে বসিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে জহুরির নাকের ডগায় হঠাৎ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

'জহুরি ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। কিন্তু মন্ত্রী আর বেরুনোর নাম করল না। জহুরি দু-তিন বার দরজায় টোকা মারল, কড়া নাড়ল কিন্তু দরজা খুলল না। জহুরি বুঝল মন্ত্রী তাকে ধোকা দিয়েছে। জহুরির মন ভার হয়ে গেল। সে রাত্রে তার ঘুম হল না। কিছুতেই সে ভেবে পাচ্ছিল না যার হার তাকে এ ব্যাপারে কী বলবে।

পরের দিন সকালে জহুরি মন্ত্রীর বাড়ি গেল। মন্ত্রী দরবারে যাওয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছিল এমন সময় জহুরি পৌঁছে তাকে বলল, 'হুজুর, আপনি হারের ব্যাপারে কী ঠিক করলেন? আপনি না কিনলে দয়া করে তা ফেরত দিন, আমি অন্য কাউকে বিক্রি করে যাঁর হার তাঁকে মুদ্রা দিয়ে দেব।' জহুরি বলল।

'কী বলছেন আপনি? পাগল হয়ে যাননি তো! যাক, আর একটি কথা বলেছেন কী একেবারে মজা টের পাইয়ে দেব।' মন্ত্রী ধমক দিয়ে বলল।

জহুরি বুঝল আর ওখানে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। ভালো ভাবেই বুঝতে পারল যে মন্ত্রীর কাছ থেকে সে ওই হার সহজে আদায় করতে পারবে না। অগত্যা সোজা বিচারকের কাছে গেল। সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিত জানাল।

বিচারক ওই মন্ত্রীকে ভালো ভাবেই চিনত। মন্ত্রী যে ধূর্ত প্রকৃতির তা বিচারকের অজানা ছিল না। বিচারক জহুরিকে বলল, 'ওই হার আপনার হাতে যাতে দিতে পারি তারজন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

পরের দিন বিচারক নিজের বাড়িতে রাজদরবারের অনেককে খাবার নিমন্ত্রণ করল। ওই মন্ত্রীকেও ডাকতে ভুলল না। বিচার করতে অসুবিধা হলেই এই ধরনের কোনো-না-কোনো বুদ্ধি খাটাত। চার জন এলে চার রকম কথার আদান-প্রদান হয়।

আমন্ত্রিত লোকজন আসার আগে বিচারক চাকরকে বলল, 'শোনো, একটা কথা। মন্ত্রী যখন বাড়িতে ঢুকবে তুমি তৎক্ষণাৎ তার একপাটি জুতো নিয়ে সোজা মন্ত্রীর বাড়ি চলে যাবে। তার স্ত্রীকে বলবে, মন্ত্রীমশাই সবাইকে হিরের হার দেখাতে চাইছেন। আপনি ওই হার আমার হাতে দিন। তোমাকে অবিশ্বাস করলে ওই এক পাটি জুতো দেখাবে। তুমি যে আমার বাড়ির চাকর তা ভালো ভাবে বুঝিয়ে বলবে। আমি নিশ্চিত যে তুমি হার পাবে। তারপর তুমি ওই হার হাতে করে এখানে অপেক্ষা করবে। তারপর আমি যখন যা বলব তাই করবে।'
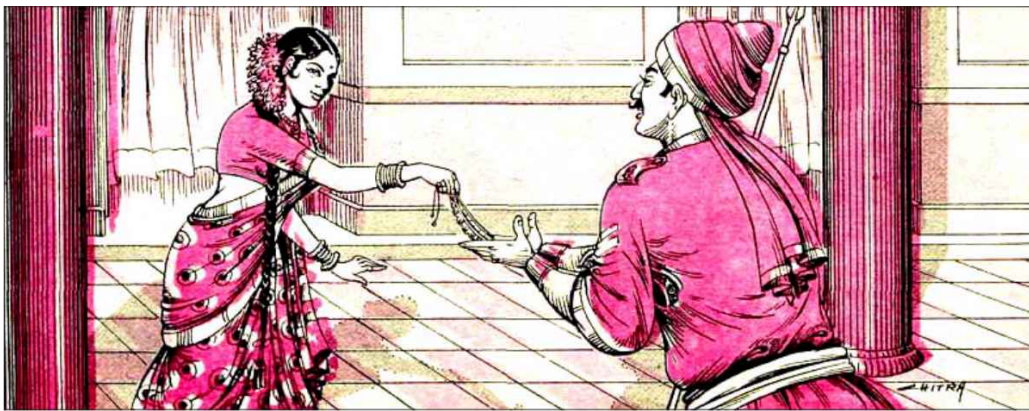
অন্যান্যদের সঙ্গে মন্ত্রীও সময় মতো হাজির হল। পরক্ষণেই চাকর এক পাটি জুতো নিয়ে বিচারকের কথামতো সব কাজ ঠিকমতো করল।

ওই মন্ত্রীসহ সমস্ত অতিথিদের উপস্থিত থাকার সময় বিচারক চাকরের কাছ থেকে ওই হার নিয়ে জহুরিকে কাছে ডেকে তার হাত হার দিতে দিতে বললেন, 'ধোকা দিয়ে যেভাবে আপনার হাত থেকে হার নিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই ধোকা দিয়ে হারটাকে আবার আনা হয়েছে। নিন।'

হিরার হার হাতে পড়তেই জহুরির ধড়ে প্রাণ এল। বিচারকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুশি মনে সে বাড়ি ফিরে গেল।

পদের লোভ

আজ থেকে এগারো-শো বছর আগেকার কথা। মধ্য চীনে চিয়াংলিং নামক নগরে কুও নামে এক ধনী লোক ছিল। কুওর বাবা ব্যাবসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিল। কুও সুদে টাকা খাটানোর ব্যাবসা করে খুব ধনী হল।

চাং নামে এক ব্যাবসাদার কুওর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করে দূরে রাজধানীতে গিয়ে থাকতে লাগল। সে এই ধার শোধ করল না। কুও ঠিক করল চাং এর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে যাবে। শহরটাও ভালো করে দেখবে। কলা বেচা মেলা দেখা দুটোই হবে। তাই সে মা, বোন আর ভাইদের দেখাশোনার ভার চাকর-বাকরদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের একটা জলযানে করে বেরিয়ে পড়ল। কুও খুব সহজেই চাং এর ঠিকানা পেয়ে গেল। কারণ রাজধানীতে এসে চাং অর্থের জন্য সবার কাছে পরিচিত ছিল। কুওর আসার খবর পেয়ে চাং খুব ঘটা করে কুওকে স্বাগত জানাল। সে বলল, ‘ধার শোধ করতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। এত দেরি হওয়ার অবশ্য অনেক কারণ আছে। একটা কারণ হল এখানকার ব্যাবসায় আমি ভীষণ ভাবে জড়িয়ে গেছি। সময় পাচ্ছি না তোমার কাছে যাওয়ার। আর দ্বিতীয়, এত টাকা নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। অন্য কারো হাত দিয়ে পাঠানো অনুচিত হবে মনে হচ্ছিল। এসে ভালোই করেছ। তোমার সুদ আর আসল শোধ করে দেব।’

কুও নিজের পাওনাগণ্ডা হিসেব করে নিয়ে সে ওই বিরাট নগরে টানা তিন বছর আনন্দ উপভোগ করে রয়ে গেল। টাকাপয়সা যখন কেউ জলের মতো

খরচ করে তখন তাকে ঘিরে কিছু লোভী মানুষের ভিড় জমে। গায়ক বাদক আর স্তাবকের দল অর্দ্ধেক টাকা শেষ করে ফেলল। পরে কুও ঠিক করল বাড়ি ফিরে যাবে।

কিন্তু বাধা পড়ল। মধ্য চীনের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। সবাই পরামর্শ দিল যে এইরকম অবস্থায় অত টাকাপয়সা নিয়ে যাতাযাত করা নিরাপদ নয়।

ঠিক তখন কুও একটা খবর পেল। সরকার নাকি টাকা নিয়ে পদ বিক্রি করছে। বড়ো বড়ো মর্যাদার পদের কেনা-বেচা চলছে দেশে! বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারের অনেক টাকার দরকার। সরকার তাই কোনো পদ খালি হলেই বিক্রি করছিল।

কুও কোনো উঁচু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। তাই তখনকার রীতি অনুযায়ী সে সরকারের কোনো ছোটো পদেরও উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু পদ যখন টাকা দিয়ে কেনা যায় তখন অভাব কীসের।

'আমার কাছে পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকা তো আছে, আমি কী ধরনের পদ কিনব?' কুও বন্ধুকে প্রশ্ন করল।

'তুমি সোজা সরকারকে এত টাকা দিয়ে দিলে বড়ো কোনো পদ পেতে পার। কোনো গ্রামের বিচারপতির পদ দিয়ে দেবে। নিজে গিয়ে দরবারের লোকের হাতে দিলে বড়ো শহরের শাসনকর্তার পদ পাবে।' বন্ধু পরামর্শ দিল।

কুও ভাবল একবার যদি সে শহরের শাসকের পদ পায় তবে তার জীবন ধন্য হবে। এসব করার আগে কুও একবার চাং এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইল।

'বন্ধু, তোমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে তুমি নিশ্চয় শহরের শাসকের পদ পেতে পার। কিন্তু সেই পদ তোমার পক্ষে লাভজনক হবে না। তুমি যখন ওই পদে বসে কিছু রোজগারের ধান্দা করবে তখন কোনো-না-কোনো অজুহাত দেখিয়ে তোমাকে সরিয়ে অন্যকে বিক্রি করে দেবে।' চাং বুঝিয়ে বলল।

কুও এ-কথার জবাবে বলল, 'আরে ভাই আমি পদ নিয়ে টাকা রোজগার করতে চাই না। আমার কি টাকার অভাব? আমি যশ চাই। খ্যাতি চাই। সেইজন্যই পদ কিনতে চাই। দু-মাসের জন্যও ওই পদে থাকতে পারলে আমার পরিবার অনেক পুরুষ ধরে সেই যশ পাবে!'

'যা প্রাণ চায় কর।' চাং বলল।

চাং এর চেষ্টায় কুও একটা শহরের শাসক হল। কুওর ভীষণ আনন্দ হল।

কিছুকাল পরে কুও বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির। সেখানকার নদী আগের মতোই বইছিল কিন্তু সেই নদীর আশপাশের গ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না। পাথর জমে রয়েছে নদীর দুই
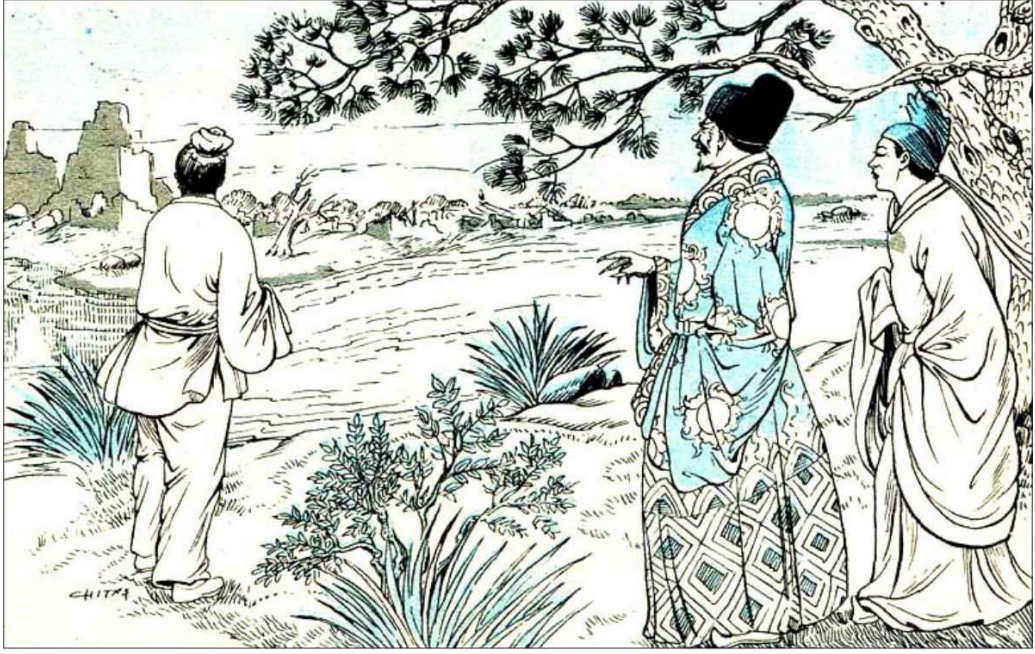
কিনারে। বিদ্রোহীরা ওই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি ভেঙে ফেলেছে। গ্রামের লোককে মেরেছে ও বেঁধে নিয়ে গেছে।

কুও নিজের বাড়ি যে ঠিক কোন অঞ্চলে ছিল তা খুঁজে পেল না। জানতে পারল যে বিদ্রোহীরা তার ভাইকে মেরে তার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে। বোনকে কোথায় নিয়ে গেছে, বোনের অবস্থা যে কী হল তা সে জানতে পারল না। মার খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে দূরের কোনো এক কুঁড়ে ঘরে থাকে। কুও তার মায়ের কাছে গেল।

ছেলেকে দেখেই বুড়ি মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা, তোমার ফিরতে দেরি হলে আমাকে আর জ্যান্ত দেখতে পেতে না। আমি আর বাঁচতে পারতাম না।'

'মা যা হওয়ার হয়ে গেছে। ও সব কথা ভেবে আর কেঁদো না। আমি শহরে শাসকের পদ পেয়েছি। আমরা দু-জনে ওই শহরে গিয়ে দিন কাটাতে পারব। কোনো অসুবিধা হবে না।' কুও বলল।

ছেলের কথা শুনে মার মনে কিছুটা শান্তি হল। কুও ভেবেছিল নতুন পদে বসে বিয়ে করে ফেলবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে ঘরবাড়ির যে ছন্নছাড়া অবস্থা দেখল তাতে তার বিয়ে করার ইচ্ছে হারিয়ে গেল।

তারপর মা আর ছেলেতে মিলে একটা জলযানে চড়ে যুঁগ চৌ নগরে পৌঁছাল। সেখানে নদীর উত্তর তীরে বৌদ্ধদের তুষিত নামে এক মঠ ছিল। সেই মঠের সন্ন্যাসীরা এক উচ্চপদের অধিকারীর আগমনের খবর পেয়ে তাকে স্বাগত জানাল। মা ও ছেলেকে ঘুরে ঘুরে মঠ দেখিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল।
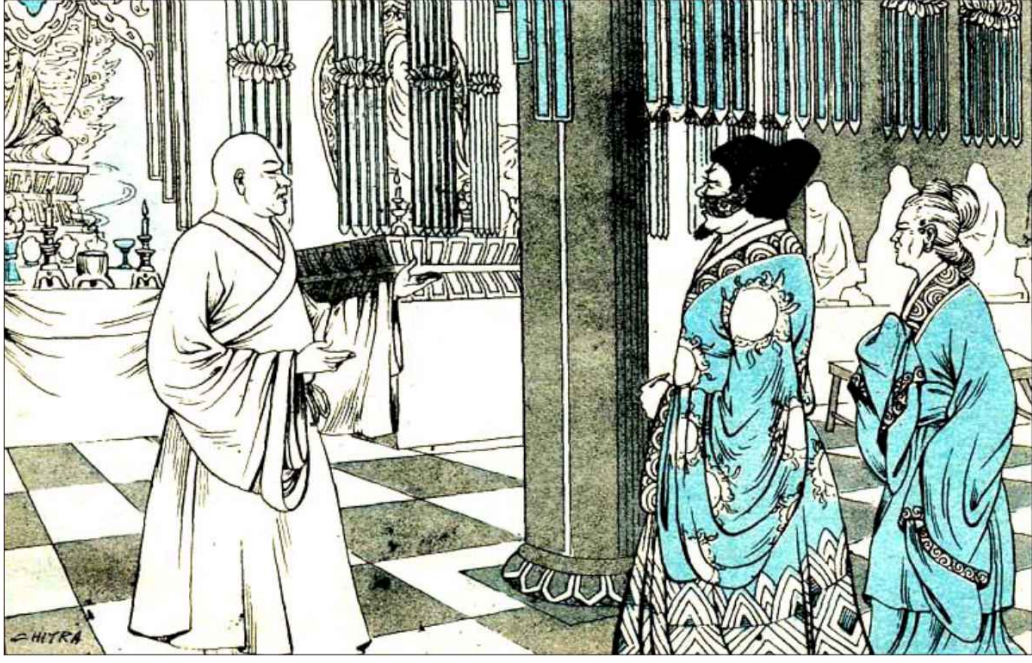
কুও তারপর নিজের জলযানটাকে একটা বট গাছে বেঁধে রাত্রে ওই জলযানেই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। ওই ঝড়ে বটগাছ পড়ে গেল জলযানের উপর। জলযানের ভিতর থেকে কোনোরকমে নিজের মাকে বের করে বাঁচাল। রাত্রে মঠের দরজা বন্ধ ছিল। দরজার কড়া নেড়ে বা ধাক্কা দিয়ে কোনো লাভ হল না। মা আর ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

সকালে মঠের দরজা খুলল। কুও মাকে নিয়ে মঠের ভিতরে ঢুকল। মঠের অধিপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন? এই অবস্থা কেন?' কুও জানাল যে তার জলযান বট গাছের নীচে পড়ে ভেঙে গেছে।

মঠের অধিপতি ওদের একটা ঘরে আশ্রয় দিলেন। কুও সেখানকার নগর শাসকের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। কিন্তু ইতিমধ্যে কুওর মা কঠিন অসুখে পড়ে মারা গেল। নগর শাসকের সাহায্যে কুও মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারল।

তারপর আর এক বিপদ দেখা দিল। চীনের রীতি অনুসারে মার মৃত্যুর পর ছেলে তিন বছরের মধ্যে নতুন কোনো পদ গ্রহণ করতে পারবে না। মঠের লোক যখন জানতে পারল যে কুও কোনো সরকারি পদে নেই, তার বিষয়সম্পত্তি বলতে আর কিছুই নেই, ঘরবাড়ির কোনো অস্তিত্ব নেই তখন তারাও মঠে তাকে রাখল না।

ফলে কুওকে আশ্রয় নিতে হয়েছে যুঁগ চৌ বন্দরের অধিকারীর বাড়িতে। অধিকারীও কুওকে অনন্তকাল খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে রাজি হল না।

'আমি আজ বাদে কাল নগরের শাসক হতে যাচ্ছি। আমাকে এভাবে অপমান করা উচিত হচ্ছে না।' কুও বলল।
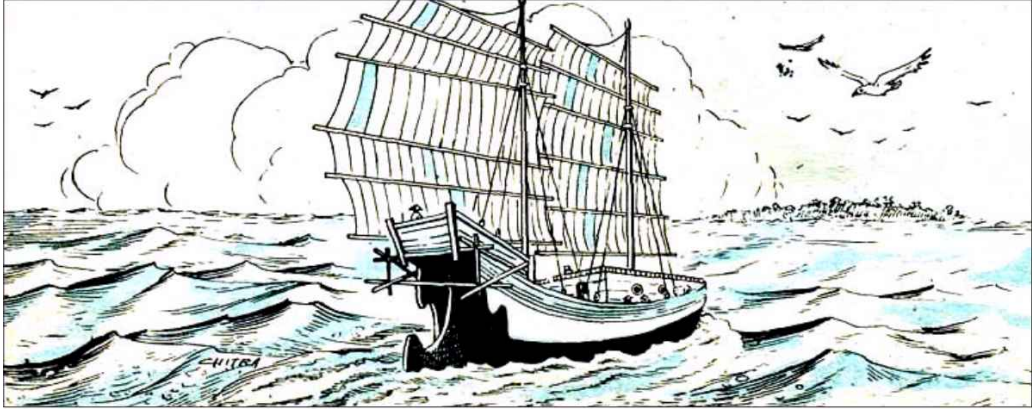
'ভবিষ্যতে তুমি রাজা হলেই বা কী, যার কোনো পদ নেই তাকে বসিয়ে বসিয়ে কে খাওয়াবে।'

কুওর আর দিন কাটে না। পয়সা নেই, কড়ি নেই। খাবে কী, পরবে কী। সে তখন নগর শাসকের সাহায্য প্রার্থনা করল।

নগর শাসক বলল, 'তোমার দুরবস্থা দেখে একবার আমি সাহায্য করেছিলাম। তুমি যে ভবিষ্যতে নগর শাসক হবে তার কোনো প্রমাণ দিতে পার? তোমাকে যে ওই পদ দেওয়া হয়েছে তার কাগজপত্র কোথায়? বার বার বিরক্ত করতে আসো কেন? যাও আর আমার কাছে এসো না।'

কুও বন্দরের অধিকারীর কাছে সোজা ফিরে এসে বলল, 'আমি বাঁচব কী করে? আমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিন।'

'তুমি কি কাজ করতে পার? যেকোনো একটা কাজ করলেই রোজগার হবে।' বন্দরের অধিকারী বলল।

'জলযান চালাতে পারি। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজ তো পারি না।' কুও বলল।

বন্দরের অধিকারী তাকে নাবিকের কাজ দিল। তিন বছর কেটে গেল। কুও নাবিক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিল। নগর শাসকের পদ নেবার কোনো চেষ্টাই সে আর করল না। তার মন থেকে পদের মোহ মুছে যেতে লাগল। নাবিকের কাজই তার কাছে বেশি ভালো লাগল। বাকি জীবনটা সে নাবিকের কাজ করেই কাটাল।

পুণ্যকাজ
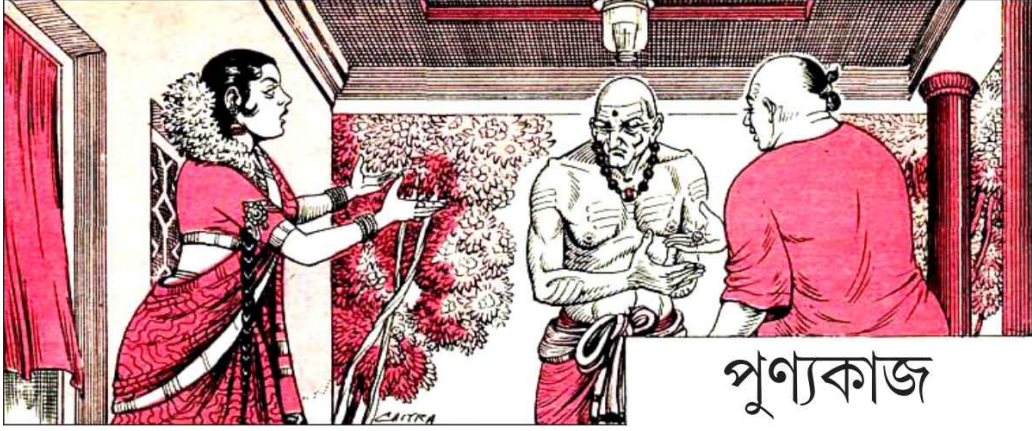
প্রাচীন কালে অক্ষরপুরে এক বড়ো ব্যাবসাদারের নাম ছিল ধর্মপাল। তার স্ত্রীর নাম সুলক্ষণা। তাদের ছিল পাঁচটি পুত্র। ব্যাবসায় অনেক অর্থ উপার্জন করায় তারা তুলসী, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষে পূজা দিত। ধর্মপাল ও তার স্ত্রী প্রত্যেক দিন কোনো-না-কোনো গরিবকে সোনার আমলকী দান করে অন্নজল গ্রহণ করত। বড়ো ছেলের বিয়ের পর বড়ো বউ শাশুড়িকে সোনার আমলকী দান করতে বারণ করে বলল, 'মা, আপনি প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার আমলকী দান করলে তো আর কিছুই থাকবে না। আপনি বরং রুপোর আমলকী দান করলেই পারেন।'

ওই বৃদ্ধ দম্পতি বউমার কথামতো রুপোর আমলকী দান করতে লাগল।

তারপর মেজো ছেলের বিয়ে হল। মেজো বউ শাশুড়িকে বুঝিয়ে বলল, 'মা, প্রত্যেক দিন এভাবে রুপো দান করলে ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছুই থাকবে না। তামার আমলকী দান করলেই পারেন।'

বুড়ো-বুড়ি, এই বয়সে ছেলে আর বউমাদের সাথে তর্কবিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন ভেবে ঠিক করল তামার আমলকী দান করবে।

সেজো ছেলের বউ এল। সেজো বউ অনুরোধ করল, 'মা, বাড়ির যা অবস্থা দেখছি তাতে আমি ভয় পাচ্ছি। রোজ একটা করে তামার আমলকী খরচ করলে ছেলে বউদের জন্যে রেখে যাবেন কি! লোহার আমলকী দান করতে পারেন!'

ব্যাবসাদার ও তার স্ত্রী এ-কথার পিঠে আর কোনো কথা বলল না। চুপ করে গেল। প্রত্যেক দিন একটা করে লোহার আমলকী দান করে যেতে লাগলেন।

তারপর চতুর্থ বউ এল। সেই বউ প্রত্যেক দিন শাশুড়িকে দান করতে দেখে তো অবাক! সে বলল, 'মা, যত লোহা দান করছেন তত লোহা বিক্রি করলে ব্যাবসার অনেক উন্নতি হত। ছেলে বউদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারতেন। অতই যদি দান করার ইচ্ছে থাকে তো আটার আমলকী দান করলেই পারেন।'

তাই মেনে নিল বুড়ো-বুড়ি। আটার আমলকী দান করে যেতে লাগল।

অবশেষে ছোটো বউ এসে তাও দান করতে বারণ করে দিল। তারপর আর বুড়ো-বুড়ি পারল না ওই বাড়িতে থাকতে। রওনা দিল তীর্থ করার অজুহাতে।

আসল ব্যাপার ছেলেরা কুঁড়ে হয়ে গিয়েছিল। নিজস্ব উদ্যোগে রোজগার করার কোনো চেষ্টা তাদের ছিল না। বাপের রোজগারে বসে খাওয়ার ইচ্ছাই প্রবল ছিল। বিনা পরিশ্রমে যে খায় তার হজম হয় না। মনে কুচিন্তা ঢোকে। ফলে একদিন সমস্ত সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়।

ওদিকে বুড়ো-বুড়ি সরযু নদীর তীরে এক জায়গায় বাস করতে লাগল। ধর্মপাল ওই আমলকী দিয়ে নানা ধরনের ওষুধ বানিয়ে বিক্রি করে টাকা রোজগার করতে লাগল। ব্যাবসা বেশ জমে উঠল। আবার ওই বুড়ো-বুড়ি দানধর্ম করতে শুরু করে দিল। যত দান করে তত অবস্থা ভালোর দিকে ফেরে। ধর্মপাল নিজের থাকার জন্য একটি বাড়ি বানাল। মন্দির তৈরি করানোর ব্যবস্থা করল সরযু নদীর তীরে। এদিকে ধর্মপালের ছেলেদের আর তাদের বউদের অবস্থা দিনকে দিন পড়ে যেতে লাগল। তাদের দু-বেলা খাবার জুটতো না। শেষে নিজেদের দিনমজুরির কাজ করতে হল। এখানে-ওখানে কাজ করতে করতে অবশেষে তারা সরযু নদীর তীরে পৌঁছাল। ওই মন্দির গড়ার কাজে ছেলেরা আর পাঁচ জনের পাঁচ বউ কাজ করতে লাগল ওই মন্দিরের জন্য।
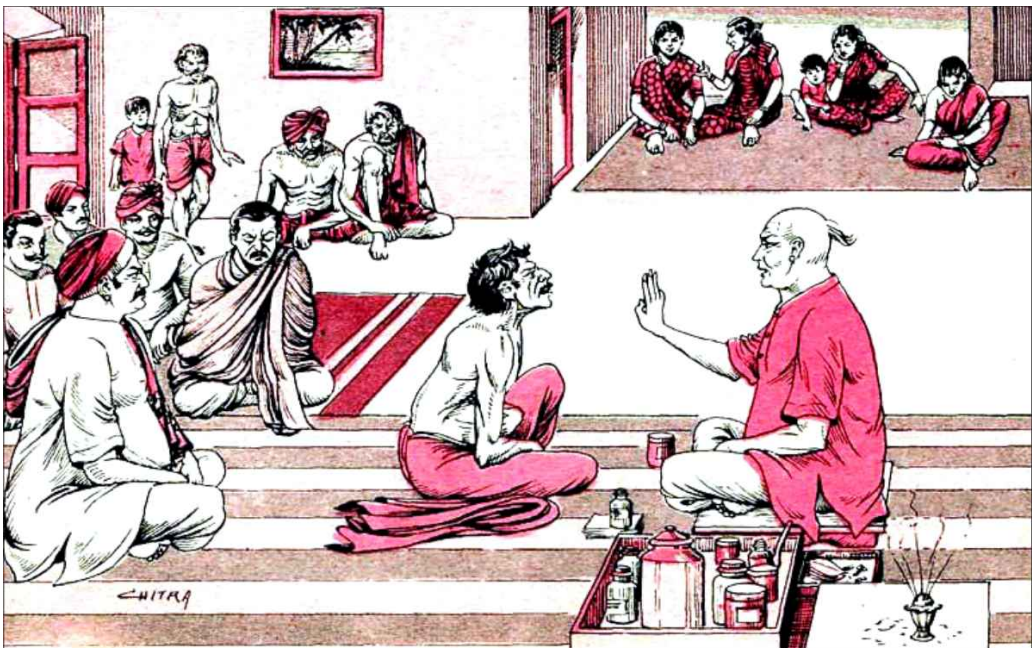
মন্দিরের মালিক দান করছে শুনে পাঁচ ছেলে আর বউরা গেল মালিকের বাড়ি। জানালা দিয়ে সুলক্ষণা ছেলে বউদের দেখে ডাকল। পাঁচ ছেলে বউদের অবস্থা দেখে সুলক্ষণার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সুলক্ষণা ভাবল বউমাদের উচিত শিক্ষা দেবার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। সে একটি রুপো, তামা, লোহা ও আটার আমলকী বানিয়ে বাইরে এল। ওদের না চেনার ভান করে বড়ো বউয়ের হাতে রুপোর আমলকী দিল। মেজোর হাতে তামার আমলকী এবং সেজোর হাতে লোহার আমলকী ও চতুর্থ বউয়ের হাতে আটার আমলকী দিল। তারপর ছোটো বউয়ের কাছে এসে বলল, 'তোমায় দেবার মতো কিচ্ছু নেই!'

ততক্ষণে বউরা বুঝতে পেরে শাশুড়ির পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। শাশুড়ি তাদের ক্ষমা করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। ধর্মপালও ছেলেদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে পোশাক পরিয়ে তাদের খেতে দিল।

তারপর থেকে ছেলে-বউ-শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই একত্রে থাকতে লাগল। প্রত্যেকে পরিশ্রম করে ব্যাবসা বাড়াতে লাগল। দানধর্মও করতে লাগল।

বীর বাম্বি

সিংগিবনের নেতাকে হত্যা করল ছোটো ভাই চেঙ্গি। সেই নেতার ছেলে বাম্বি ছিল খুব ছোটো! বাম্বির মা সেই রাত্রে চেঙ্গি ও তার লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে বনের অন্য প্রান্ত থেকে পালাল এক শহরে। সেখানকার এক মিশনারির ফাদার বাম্বিকে আর তার মাকে আশ্রয় দিলেন। দেখাশোনার ভার নিলেন। দিনে দিনে বাড়ে বাম্বি। তার শরীরে অসীম শক্তি। তার বয়স যখন আঠারো বছর তখন তার মা সাপের ছোবল খেয়ে মারা গেল।

'বাবা, তুমি রাজার ছেলে। সিংগিবনের রাজা হওয়ার অধিকার তোমারই ছিল। তোমার কাকা চেঙ্গি তোমার বাবাকে হত্যা করে সিংগিবনের নেতা হয়ে আছে। তুমি যে রাজপুত্র তার প্রমাণ...' বলতে বলতে বাম্বির মা মারা গেল।

ছেলের বা নিজের পরিচয় মিশনারির ফাদারের কাছে মরার আগেও জানাতে সাহস করল না বাম্বির মা। কারণ চেঙ্গির লোকজন ওই শহরেও ঘুরে বেড়াত। জানাজানি হলে বাম্বির জীবন বিপন্ন হত।

এ-কথা শুনে মার মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করল এক পক্ষকালের মধ্যে সে বদলা নেবে।

বাম্বি পরের দিনই বেরিয়ে পড়ল। শিকারিদের পিছনে পিছনে গিয়ে সে সন্ধ্যা নাগাদ সিংগিবনে পৌঁছে গেল। সেরাত্রে সে এক গাছের উপর কাটাল। সকালে এক বিচিত্র ধরনের লোক জিরাফের মতো একটা জন্তুতে চড়ে সামনে এল। তার মাথায় ছিল দুটো সিং আর বাজ পাখির পালক লাগানো মুকুট। হাতে ছিল এক বল্লম। গায়ে ছিল সিংহের চামড়া।

লোকটা বাম্বির দিকে বল্লম ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমি গোরা সাহেবের শিকারিদলের একজন। পথ ভুলে এসে গেছি।' এ-কথা বলে বাম্বি পকেট থেকে সিগারেট ধরানোর লাইটার বের করে বলল, 'এটা আগুন ধরানোর যন্ত্র।' সে লাইটারের আগুন ধরিয়ে দেখাল। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
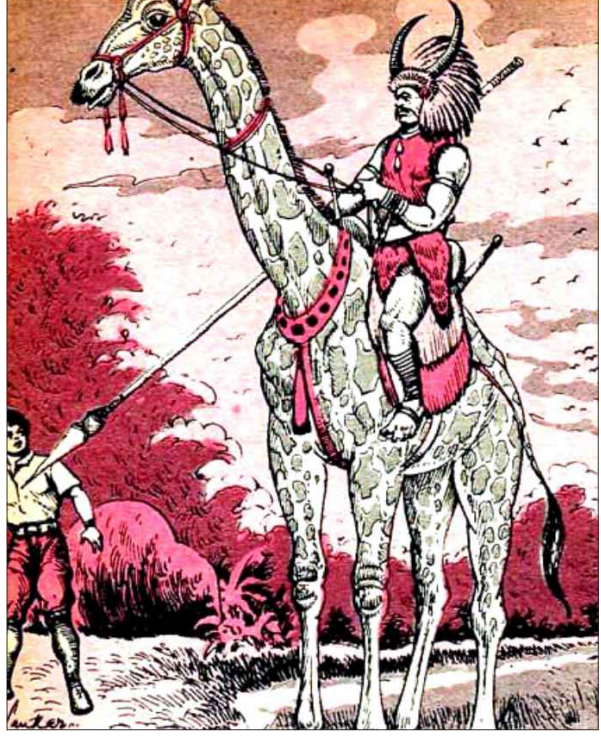
'এটা তোমার চাই?' বাম্বি জিজ্ঞেস করল। ওই বুনো লোকটা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'ঠিক আছে নাও। একটা কথা বলব?' বাম্বি বলল।

'কী?' বুনো লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে? বাম্বির প্রশ্ন।

'আমাদের চেঙ্গি বড়ো মারাত্মক লোক। আমাদের দেশে অন্য দেশের লোক থাকতে পারে না।' বুনো লোকটা বলল।

'আমাকে বন্ধু বানিয়ে তো রাখতে পার। নাকি সেটুকু উপকার করার মতো ক্ষমতাও তোমার নেই! ভালো কথা, অন্য দেশের লোককে তোমার নেতা থাকতে দেয় না কেন বলত?' বাম্বি প্রশ্ন করল।

'চেঙ্গি যে বাম্বিকে ভীষণ ভয় পায়। বাম্বিকে চেন না তো? বাম্বি হল আমাদের মৃত নেতার একমাত্র ছেলে। আমাদের সেই নেতা যে কী ভালো লোক ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। নিষ্ঠুর চেঙ্গি তাকে বধ করেছে। আমাকে খুব ভালোবাসত। আমি ওই নেতার নিজস্ব লোক। চেঙ্গি আমাকে ভীষণ সন্দেহ করে।' বুনো লোকটা বলল।

'তোমাদের চেঙ্গির ভয় কীসের? সে কি মনে করে যে বাম্বি বেঁচে আছে? বাম্বি যেকোনো দিন এসে তার পদ দাবি করবে?' বাম্বি জিজ্ঞেস করল।

'চেঙ্গির কয়েক জন অনুচরের ধারণা যে বাম্বি এখনও বেঁচে আছে। আমার বাবার উপর অপরাধ চাপানো হয়েছিল। বাবা নাকি বাম্বি আর তার মাকে বনের সীমানা গোপনে পার করে দিয়েছিল। এই অপরাধে বাবাকে চেঙ্গি জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।' বুনো লোকটা বলল।
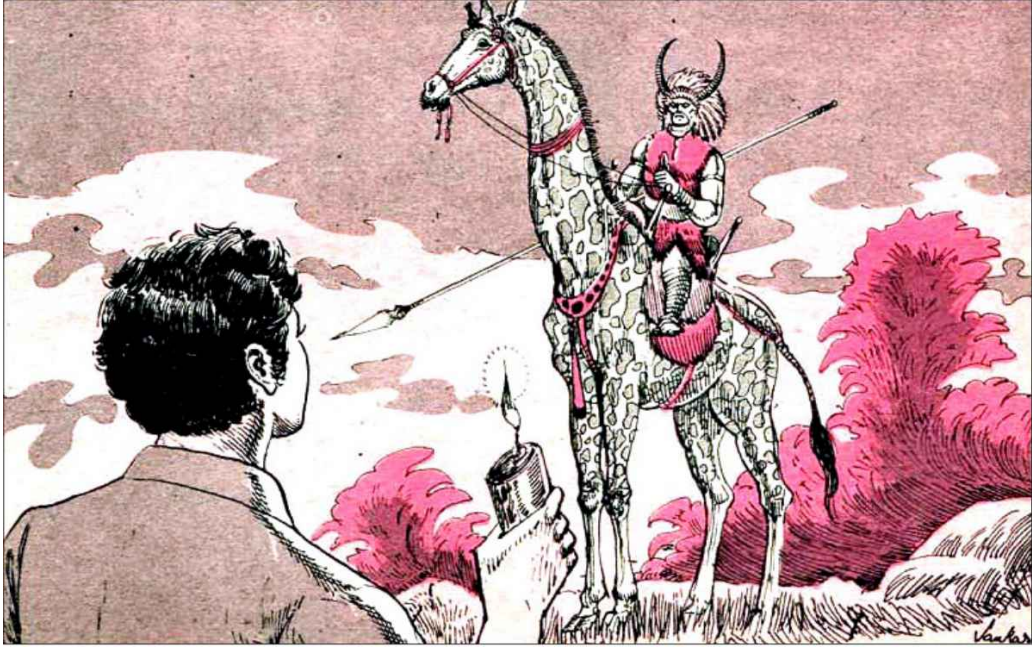
'আচ্ছা তোমার নাম কী বলত?' বাম্বির প্রশ্ন।

'নাম সিংহ দমন ডিঙ্গু।' লোকটা বলল।

'আচ্ছা ডিঙ্গু, বাম্বি ফিরে এলে কি তুমি খুব খুশি হবে?' বাম্বি জিজ্ঞেস করল।

'আমি খুশি হব না কেন? চেঙ্গি আমার বাবাকে পুড়িয়ে মেরেছে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি আমার বাবাকে মেরে ফেলার বদলা নেবোই। আমার দেশের লোকও খুব খুশি হবে। তবে আমার দেশের লোক সব তান্ত্রিকের কথা খুব বিশ্বাস করে। তান্ত্রিকটা আবার চেঙ্গির খয়ের খাঁ। তান্ত্রিক বলে বেড়াচ্ছে যে সে মন্ত্রতন্ত্রের বলে বাম্বিকে মেরে ফেলেছে। বাম্বির ফিরে আসার আর কোনো আশঙ্কা নাকি নেই। বাম্বি আসলে ভূত হয়েই আসতে পারে। ভূত হয়ে আসলে আমার দেশের ফসল নাকি নষ্ট হয়ে যাবে, সবাই মরে যাবে।' ডিঙ্গু বলল।

'ওই তান্ত্রিকের কথা তোমরা বিশ্বাস কর? পাজি চেঙ্গির হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করার যদি চেষ্টা করি তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?' বাম্বি জিজ্ঞেস করল।

'আমি দরকার হলে জান দেব।' ডিঙ্গু দৃঢ়তার সাথে বলল।

'বেশ, এখন থেকে আমি তৈরি হচ্ছি। আমি বাম্বির বন্ধু। বাম্বি বেঁচে আছে। সে ফিরতে চায়।' বাম্বি বলল।

ডিঙ্গু এক লাফে জিরাফের পিঠ থেকে নীচে নাবল। নিজের গায়ে যে ধরনের পোশাক ছিল সেই রকমের পোশাক বাম্বিকে পরিয়ে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

অন্ধকার হয়ে গেলে ডিঙ্গু বাম্বিকে নিজের কুটিরে নিয়ে গেল। বাম্বি ঠিক করে নিল কী করবে। ফাদারের কাছে বাম্বি মন্ত্রতন্ত্র শিখে নিয়েছিল। একটি মন্ত্র প্রয়োগ করলেই কাজ হয়ে যাবে।

‘আচ্ছা তান্ত্রিকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে বাম্বি এলে খুশি হবে?’

‘চেঙ্গির ডান হাত ওই বোঙ্গেচু বাদে সবাই বাম্বি আসছে শুনে খুশি হবে। আমাদের পুরোনো নেতার তান্ত্রিক সিঞ্চুর কথা লোকে খুব বিশ্বাস করে।’ ডিঙ্গু বলল।

‘তাহলে তুমি এক কাজ কর। পেঁয়াজ কেটে তার রস দিয়ে এই কাগজে লেখ: ‘বাম্বি বেঁচে আছে! তাকে নেতা কর! এটা গোড়ুডু দেবতার নির্দেশ!’ ঘাসের টুকরো দিয়ে লিখে তা শুকিয়ে নাও। আর সেই কাগজের টুকরোটা সিঞ্চুকে দিয়ে দাও। সিঞ্চুকে বল সে যেন লোককে বলে যে সে একটা স্বপ্ন দেখেছে। সে দেখেছে গোড়ুডু দেবতা তাকে বলেছে যে নীল পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের আধারে রাখা আছে একটা কাগজ। সেই কাগজ আগুনে গরম করে নিলে তাতে ফুটে উঠবে দেবতার বাণী। তবে এই কথা প্রচার করার আগে সিঞ্চু যেন ওই কাগজ নীল পাহাড়ের এক জায়গায় রেখে আসে। তারপর কী করতে হবে তা আমি সিঞ্চুকে সাক্ষাতে বলব। তুমি পরে সিঞ্চুর সাথে আমার দেখা করিয়ে দেবে।’ বাম্বি বলল।

বাম্বির পরিকল্পনা মতো কাজ হতে লাগল।

সিঞ্চু কয়েক জন তান্ত্রিককে সঙ্গে নিয়ে নীল পাহাড়ে গেল। ওরা সবাই সিঞ্চুর কথামতো নীল পাহাড়ে পেল একটি কাগজ। তারপর সবাই গোড়ুডু দেবতার মন্দিরের সামনে এল। নেতাও হাজির হল সেখানে। সবাই পরীক্ষা করতে লাগল কাগজটাকে। সাদা কাগজ। সিঞ্চু আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। তারপর সেই কাগজ আগুনে ধরা হল। আগুনের উত্তাপে কাগজের বুকে গমের রঙের লেখাগুলো ফুটে উঠল। ‘বাম্বি বেঁচে আছে! তাকে তোমাদের নেতা কর! এটা গোড়ুডু দেবতার নির্দেশ!’

এই সব কথাগুলো পড়ার পর চেঙ্গি অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করতে লাগল। তার অনুচররাই বল্লম নিয়ে তাকে এবং তার ডান হাত বোঙ্গেচু তান্ত্রিককে ঘিরে ফেলল।
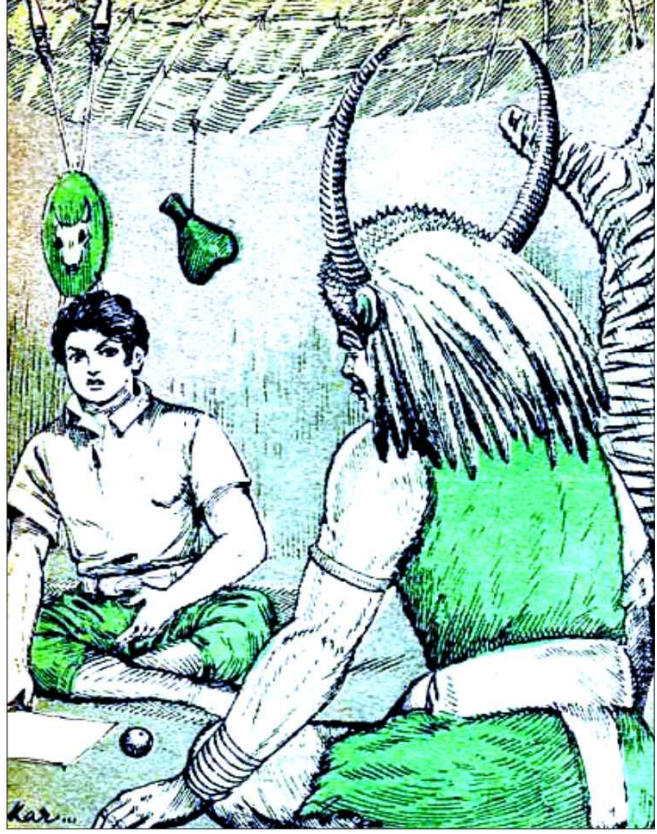
'কিন্তু বাম্বি কোথায়? আমি তাকে আমার মন্ত্র বলে অনেক আগেই মেরে ফেলেছি।' বোঙ্গেচু চিৎকার করে উঠল।

'আমি মরিনি! বেঁচে আছি। এখানেই আছি।' বলে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাম্বি এগিয়ে এল।

'একে বন্দি কর! এ বাম্বি নয়! এ ধোকা দিতে এসেছে!' চেঙ্গি গর্জে উঠল।

কিন্তু সিঞ্চু শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এ যদি সত্যি সত্যি বাম্বি হয় তাহলে এর পেটের বাঁ-দিকে একটি মোহরের ছাপ থাকবে। আমি এর জন্মাবার পর একটি মোহরের ছ্যাঁকা লাগিয়ে ছিলাম। বাঁ-হাত তুললেই ওই চিহ্ন নজরে পড়বে।'

বাম্বি বাঁ-হাত তুলতেই সবাই দেখতে পেল সেখানে ওই মোহরের ছাপ। তৎক্ষণাৎ সবাই আনন্দে হর্ষনাদ করে উঠল।

চেঙ্গি ও বোঙ্গেচু পালানোর তাল করতেই লোকে তাদের বেঁধে ফেলল।

'এই দু-জনকে আমাদের দেশের ত্রি-সীমানার বাইরে চিরকালের মতো রেখে এসো।' বাম্বি নির্দেশ দিল।

প্রত্যুপকার

শিবরামের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে কম করে এক হাজার টাকা চাই। শিবরামের কাছে অত টাকা ছিল না। তার চাকরি ছিল নন্দলালের কাছারিতে খাতা লেখা।

শিবরামের বাবা ধনী ছিল। ধনী হিসেবে তার খুব নামডাক ছিল। লোকটা দানধর্ম করতে খুব ভালোবাসত। সাহায্য চাইতে যে আসত তাকে খালি হাতে ফেরাত না। এই সাহায্য করতে গিয়েই নিজে ফতুর হয়ে গেল। এমনকী যে নন্দলালের কাছে শিবরাম চাকরি করত সেও একদিন শিবরামের বাবার টাকা দিয়েই ব্যাবসা শুরু করেছিল।

শিবরাম মেয়ের জন্য পাশের গ্রামের একটা পাত্র ঠিক করল। পাত্র ভালোই। তবে গুণে এক হাজার টাকা পণ দিতে হবে। শিবরাম ভাবল তার বাবা এত লোককে সাহায্য করেছে। সবার কাছে কিছু কিছু জোগাড় করলে ঠিক জুটে যাবে টাকা। এই আশায় সে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাকা ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু শিবরামের আশা পূরণ করতে, তাকে কিছু দান করা তো দূরের কথা ধার দিতেও কেউ এগিয়ে এল না। শেষে শিবরাম তার মালিকের কাছে টাকা ধার চাইল। কিন্তু নন্দলাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। অগত্যা শিবরাম ঠিক করল পাত্রপক্ষকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে আসবে।

শিবরাম মনে মনে যা ঠিক করল তা অন্য কাউকে জানাল না। একদিন ভোররাতে বেরিয়ে পড়ল। সেদিন ছিল অমাবশ্যার রাত্রি। ঘন অন্ধকার। পথে

পা দিয়েই শুনতে পেল শেয়ালের ডাক। পেঁচার ক্রমাগত আর্তনাদ যেন অন্ধকারকে আরও ভয়ংকর করে তুলল। শেয়াল পেঁচা আর ঝিঁঝির ডাকে রীতিমতো ভয় পেল শিবরাম। মাথার উপর দিয়ে চামচিকে আর পেঁচা ঘন ঘন উড়ে যাচ্ছিল। শেয়ালগুলো যেন তাকে ভয় পাচ্ছে না। কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল। অবস্থা দেখে-শুনে শিবরামের মনে হল সকাল হতে অনেক দেরি। শিবরাম ভয়ে ঘেমে উঠল। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল তার সামনে কে যেন হাঁটছে। লোকটার হাতে ছিল একটা থলি। লোকটাকে দেখেই শিবরামের ধড়ে যেন প্রাণ এল। শিবরাম হাততালি বাজিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'সামনে কে যায়?'

সামনে যে লোকটা হাঁটছিল সে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিবরাম কাছে গেলে সে বলল, 'আমাকে সবাই মাস্টারমশাই বলেই ডাকে। পাশের গ্রামে যাচ্ছি। আপনি কে? কী নাম আপনার?'

'আমার নাম শিবরাম। পাশের গ্রামে আমিও যাচ্ছি।' শিবরাম বলল।

'পাশের গ্রামে আপনি কী করেন? কোন বাড়িটা আপনার?' শিবরামের প্রশ্ন।

'আজকাল আমি আর কোনো কাজ করছি না। গ্রামের মাঝে অশ্বত্থ গাছের গায়ে আমার বাড়ি।' মাস্টারমশাই বলল।

শিবরাম নিজের সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে বলল, 'আমার বাবা বহু লোককে সাহায্য করে একেবারে পথে বসে গেছেন। যাঁদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের একজনও আমার বিপদে দাঁড়াল না।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষের মহৎ গুণ। আপনার গ্রামে শম্ভুবাবু নামে একজন ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি যে সাহায্য পেয়েছি তা কোনোদিন ভুলব না। তিনি মানুষ নন, দেবতা ছিলেন।' মাস্টারমশাই বলল।

শিবরাম বলতে যাচ্ছিল যে শম্ভুবাবু তারই বাপের নাম। কিন্তু তার আগেই

শিবরামের হাতে একটা থলে দিয়ে মাস্টারমশাই বলল, 'এটা একটু ধরুন তো। আমি একটু আসছি।' বলে মাস্টারমশাই বনের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও মাস্টারমশাই যখন ফিরল না তখন সে আস্তে আস্তে নিজের পথে এগোতে লাগল।

সকাল হয়ে এল। গ্রামে ঢুকে একটু খুঁজে পেল সেই অশ্বত্থ গাছের পাশের বাড়িটি। দাওয়ায় বসে ছিল এক বুড়ি।

'দিদিমা, এটাই তো মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি? উনি একটা কাজ সেরে আসছেন। আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেত হবে। এই থলিটা উনি আমাকে ধরতে দিয়েছেন। আমি অপেক্ষা করতে পারব না। থলিটা আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।' শিবরাম বলল।

'কোন মাস্টারমশাই? পঁচিশ বছর আগে যিনি মারা গেছেন? আমার শ্বশুরমশাইয়ের কথা বলছ?' বুড়ি বলল।

শিবরাম অবাক হয়ে গেল। তাহলে কি এতক্ষণ সে ভূতের সঙ্গে কথা বলল! তারপর সে মাস্টারমশাইয়ের দেয়া থলি খুলে দেখতে পেল তিন হাজার টাকা!

'দিদিমা, এই টাকা নিন।' শিবরাম বলল।

'না ভাই, উনি নিশ্চই কোনো কাজে ওই টাকা তোমাকে দিয়েছেন।' বুড়ি বলল।

শিবরামের মনে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের কথা। এক সময় বাবার কাছে সে উপকৃত হয়েছিল। ভাবল এ বুঝি তার প্রত্যুপকার। এই সব ভেবে শিবরাম বুড়িকে বলল, 'এত টাকা আমার দরকার নেই। এর অর্দ্ধেক আপনি নিন।' বলে বুড়ির হাতে অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে বাকি অর্দ্ধেক নিজে রাখল। তার মেয়ের বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

অবিশ্বাস

প্রাচীন কালের কথা। এক নগরে রামলাল নামে এক হিরার ব্যাবসাদার ছিল। সে গোবিন্দ নামে এক বলিষ্ঠ পালোয়ানকে চাকর রাখল। রামলাল বিশ্বাস করত না গোবিন্দকে। কেউ হিরা-পান্না অথবা চুনি কিনতে এলে রামলাল কোনো-না-কোনো অজুহাতে তাকে অন্য কোনো কাজে পাঠিয়ে দিত। তার ভয় গোবিন্দ যদি দেখে ফেলে হিরা রাখার জায়গা!

কিছুকাল পরে গোবিন্দ বুঝতে পারল যে তার কর্তা তাকে বিশ্বাস করছে না। গোবিন্দ ঠিক করল সুযোগ বুঝে রামলালের ভুল ধারণা ভেঙে দেবে।

একদিন রামলাল খেতে গেলে দোকানে দু-জন ঢুকে গোবিন্দকে দেখে থমকে গেল।

তখন গোবিন্দ তাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন, বসুন।’

ওদের দু-জনের একজন গোবিন্দর কাছে গিয়ে বলল, ‘মালিক কোথায়?’

‘ভিতরে আছেন। খেতে বসেছেন।’ গোবিন্দ জবাবে বলল।

সেই লোকটা গোবিন্দকে বলল, ‘মালিকের কাছে কত টাকার হিরা, মণি, মুক্তো আছে? ওসব কোথায় রাখা আছে? আমাদের সাহায্য করলে অর্দ্ধেক ভাগ তোমাকে দেব।’

গোবিন্দ ওদের দু-জনকে ভালো করে দেখে বলল, ‘একটু দাঁড়ান। আমি ভিতরে গিয়ে সব জেনে এসে বলছি।’ এ-কথা বলে গোবিন্দ ঘরের ভিতরে গিয়ে

বলল, ‘কর্তা, হিরে কিনতে অনেক দূর থেকে খুব ধনী লোক এসেছে। মনে হচ্ছে টাকাপয়সাওলা লোক।’

রামলাল এ-কথা শুনে তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে গুঁজে উঠে ওদের কাছে গিয়ে গোবিন্দকে বলল, ‘গোবিন্দ খদ্দেরদের ভালো ভাবে বসিয়ে তুমি পুকুরে কত গভীর জল আছে মেপে এসো তো। যাও।’

‘যাচ্ছি।’ বলে গোবিন্দ চলে গেল।

সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক-মুখোশধারী চোরগুলো সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল। রামলালের হাত-পা বেঁধে ফেলল। সিন্দুক খুলে হিরা, মণি, মুক্তো বের করে থলিতে ভরল। রামলাল ‘গোবিন্দ গোবিন্দ’ বলে চিৎকার করল। ওরা সঙ্গেসঙ্গে কাপড় পুরে দিল তার মুখে। ওদিকে গোবিন্দ বেশি দূর যায়নি। ও চোরদের বেরুনোর মুখে তক্কে তক্কে ছিল। ওদের বেরুনোর সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনাদের কাজ হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এই নাও তোমার ভাগ!’ চোরগুলো বলল।

‘তোমরা ভেবেছ আমি চুরির ভাগী হতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি!’ হঠাৎ গোবিন্দ হুংকার ছেড়ে চোরদের মারতে আরম্ভ করে দিল। ওদের হাত থেকে হিরা, মণি-মুক্তার থলি কেড়ে নিল। গোবিন্দকে দেখে রামলাল হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রামলাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘গোবিন্দ! আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গেছে! সর্বনাশ হয়ে গেছে গোবিন্দ!’

‘আমি চোরদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি। থলিগুলো ভালো ভাবে দেখে নিন সব জিনিস ঠিক আছে কি না।’ বলে গোবিন্দ তার সামনে থলিগুলো রেখে তার বাঁধন খুলল। রামলাল হাঁকপাঁক করে সব দেখে ভীষণ খুশি হয়ে বলল, ‘ওরে গোবিন্দ, আমি জানতাম না যে তুমি এত বিশ্বাসী। এতদিন তোমাকে ভুল বুঝেছি। সত্যি তুমি কত সৎ।’

চতুর চিত্রশিল্পী

অনেককাল পূর্বে ভারতের মধ্য অঞ্চল থেকে এক প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী যবন দেশে গিয়েছিল। সেখানে এক দক্ষ যন্ত্রাচার্য ছিল। সে চিত্রশিল্পীকে নিজের বাড়িতে থাকার ও খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। অতিথির দেখাশোনার কাজ সে এক যন্ত্রনারীকে দিয়ে করিয়ে নিল। সেই যন্ত্রনারী ওই যন্ত্রাচার্যের হাতে তৈরি।

সেই যন্ত্রনারী চিত্রশিল্পীর পা ধুয়ে যখন ফিরছিল তখন তার দিকে তাকিয়ে চিত্রশিল্পী তাকে জীবন্ত নারী ভাবল। সে ওই নারীকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। কিন্তু নারীর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুলো না।

তখন চিত্রশিল্পী হঠাৎ তার হাত ধরে টান দিল। সেই টানের চোটে যন্ত্রনারীর ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে গেল। মুহূর্তে চিত্রশিল্পী বুঝতে পারল যে ওই নারী যন্ত্র দিয়ে তৈরি। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাচার্যের দক্ষতায় মুগ্ধ হল। কিন্তু ওই যন্ত্রনারীর ব্যাপারে যন্ত্রাচার্য চিত্রশিল্পীকে কোনো কথাই বলল না। এই না বলাতেই চিত্রশিল্পী অপমান বোধ করল। চিত্রশিল্পী ঠিক করল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিভারও পরিচয় দেবে।

তার পরই চিত্রশিল্পী এমন একটি ছবি আঁকল সেই ছবিতে আছে ওই চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ছবিটি ঘরে ঝুলিয়ে রেখে চিত্রশিল্পী নিজে ঘরের এক কোণে কাঠের স্তূপের আড়ালে লুকাল।

তারপর এক সময় যন্ত্রাচার্য ঘরের কাছে এসে দেখল চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি
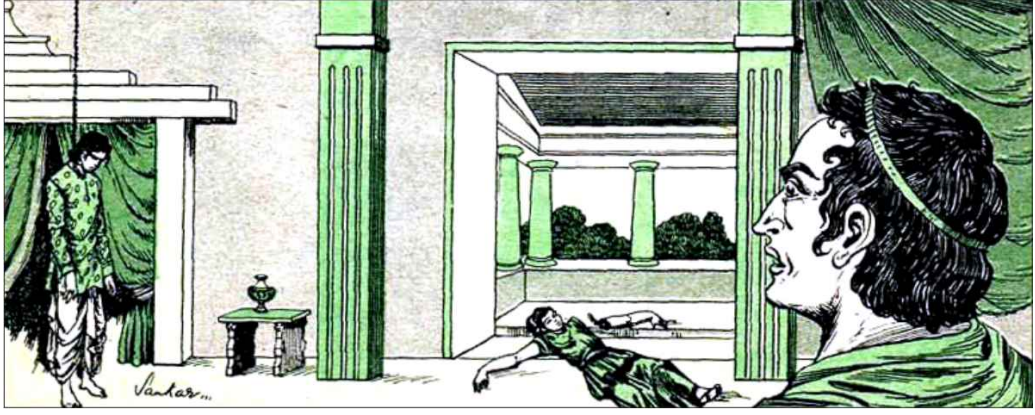
দিয়ে ঝুলছে! সর্বনাশ! দেখল দরজা খোলা! নীচে দেখতে পেল যন্ত্রনারী ভেঙে পড়ে রয়েছে। আর স্বয়ং চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে!

এই দৃশ্য দেখে যন্ত্রাচার্য ভীষণ ভয় পেল। যন্ত্রনারী আর একটা বানিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু এই চিত্রশিল্পীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা কী হবে! ভারতের একজন শিল্পীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু রটবে। দুর্নাম হবে তার। সে ঠিক করল সরকারি অধিকারীদের দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করাবে।

এ-কথা ভেবে যন্ত্রাচার্য নিজের দেশের রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল। রাজারও আসল ঘটনা জানার আগ্রহ জাগল। রাজা ওই ব্যাপারটার তদন্ত করার ভার দিয়ে দরবারের কয়েক জন পাহারাদারকে যন্ত্রাচার্যের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পাহারাদাররা চিত্রশিল্পীর ঘরে উঁকি মেরে দেখল। দেখতে পেল চিত্রশিল্পীর মৃতদেহ ঝুলছে। ওরা ভাবতে লাগল কীভাবে শব নাবানো যায়। কয়েক জন তরবারি, বল্লম ও ছুরি বের করল। চিত্রশিল্পীর গলার দড়ি কাটতে গেল।

ঠিক তখনই আড়াল থেকে চিত্রশিল্পী তাদের সামনে হাজির হল। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

চিত্রশিল্পী যন্ত্রাচার্যকে বলল, 'মশাই আপনি যন্ত্রনারী বানিয়ে আমার সেবার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। বেশ মজার কাণ্ড করে ছিলেন। তাতে আপনার দক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলাম। আমি একা বোকা বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি যা করেছি তাতে আপনি বোকা বনলেন, আপনার দেশের রাজার পাঠানো লোকগুলোও ধরতে পারল না।'

এ-কথা শুনে যন্ত্রাচার্য লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলল।

পরোপকার

অরুণপুরের বীরমল্ল নামে এক চোর ছিল। সে সিঁধ কেটে আর পথিকদের পয়সাকড়ি জিনিসপত্র লুঠ করে দিন কাটাত। কোনো পুণ্য কাজ জীবনে সে করেনি।

একদিন একজনের ঘরে সিঁধ কাটছিল। কাটার সময় তার মনে হল বাড়ির কর্তা জেগে আছে। দু-জনের কথা শুনতে পেল। বীরমল্ল কান খাড়া করে ওদের কথা শুনল। এক যুবক তার মাকে বলছে, 'মা কাল সকালে আমাকে পাশের গ্রামে যেতে হবে। আমাকে দুটো পোঁটলায় ভাত বেঁধে দেবে। একটা আমার জন্য আর একটা মাটির জন্য।'

মা বলল, 'তাই দেব বাবা!' তারপর মা ও ছেলে দু-জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

এই কথা শোনার পর বীরমল্ল সিঁধ কাটা যেন ভুলে গেল তখনকার মতো। বার বার ওই যুবকের কথা ভাবতে লাগল। সে সকাল পর্যন্ত ওইখানেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। যেকোনোভাবে ওই কথার অর্থ জানার প্রচণ্ড আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

সকালে ছেলে বেরুতে গেল। মা তার হাতে দুটো পোঁটলা বেঁধে দিল।

মার হাত থেকে দুটো পোঁটলা নিয়ে যুবক বেরিয়ে পড়ল। চোরও তাকে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল। চলতে চলতে দুপুর হয়ে গেল। যুবক এক গাছের নীচে খেতে বসল। বীরমল্লও ওই গাছের নীচে পৌঁছাল।

যুবক বীরমল্লকে দেখল। দুটো পোঁটলা খুলে একটা বীরমল্লের সামনে রাখল আর অন্যটা নিজের সামনে।

যুবকের এই ব্যবহার দেখে বীরমল্ল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা অচেনা লোককে যে কেউ খেতে দেয় তা বীরমল্লের কাছে রীতিমতো অবাক হওয়ার ঘটনা। সে তো সিঁধ কাটে আর লুঠ করে। এর বাইরে এ-রকম একটা জীবন যে আছে তা সে জানত না।

বীরমল্ল যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আপনি জবাব দেবেন? না দিলে কিন্তু আপনার এই খাবার খাব না।'

'কী প্রশ্ন করতে চান।' যুবক বলল।

'আমার পেশা চুরি করা। কাল রাত্রে আমি আপনার বাড়িতে সিঁধ কাটতে গিয়েছিলাম। সিঁধ কাটা বন্ধ রেখে আড়ি পেতে শুনলাম আপনার কথা। আপনি মাকে যা বললেন তা শুনে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এইজন্যই আমি আপনার পিছনে পিছনে এতদূর এসেছি। এখনও আমি বুঝতে পারিনি।' চোর বলল।

যুবক হেসে বলল, 'দেখ ভাই আমি তোমাকে যা খেতে দিলাম তা আমার ভাগের, নিজে নিয়েছি মাটির ভাগের।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যা খাচ্ছি তা যদি আপনার ভাগের হয় তো আপনি খাচ্ছেন কার ভাগের?' বীরমল্ল বলল।

'আমি যা খাই তা হজম হয়ে মাটিতে যায়। অন্যকে যা খেতে দিয়ে থাকি তা পুণ্য কাজ হিসেবে ধরা হয়। তুমি চুরি করে যা পাও তা খরচ হয়ে যায়। অন্যের উপকার কর না। পরোপকার ছাড়া পুণ্য হয় না।' যুবক বলল।

এই কথা শুনে চোরের যেন চোখ ফুটল। সেইদিন থেকেই সে চুরি ও লুঠ করা ছেড়ে দিয়ে পরিশ্রম করে রোজগার করত আর তার রোজগারের কিছুটা খরচ করত পরের জন্য। চোর তার বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটাল।

কুসুমকুমারের বিয়ে

চন্দনপুর গ্রামে দেব ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার ছিল কমললোচনা নামে এক কন্যা। মেয়েটি খুব সুন্দরী। দেব ভট্টাচার্যের কুসুমকুমার নামে এক শিষ্য ছিল। কুসুমকুমার ও কমললোচনা গোপনে পরস্পরকে ভালোবাসত।

ইতিমধ্যে দেব ভট্টাচার্য অন্য এক পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরেই কমললোচনা কুসুমকুমারের কাছে খবর পাঠাল— 'বাবা আমার বিয়ে দেবার তোড়জোড় করছেন। তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।'

এই খবর পেয়ে কুসুমকুমার একটা জায়গায় কমললোচনাকে যেতে খবর পাঠাল। সেখান থেকে তার চাকর ঘোড়ায় করে নিয়ে যাবে।

কমললোচনা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখে একটা লোক ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কুসুমকুমারের চাকর কমললোচনাকে মালিকের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে অন্য পথে নিয়ে গেল। সকালে কমললোচনা দেখল সে এক শহরে এসে গেছে। তার কেমন যেন লাগল। তাকে প্রশ্ন করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি? তোমার মালিক কোথায়?'

'আমার মালিক এখানে কোথায়? তার সাথে তোমার কী দরকার? আমি তোমাকে বিয়ে করব।' চাকর বলল।

কমললোচনা খুব বুদ্ধিমতী। সে চাকরকে বলল, 'এ-কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? অনেক দেরি করে ফেললে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। তুমি আর দেরি না করে বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

কমললোচনার কথায় বিশ্বাস করে চাকর সেখানেই ঘোড়া ছেড়ে বিয়ের জিনিসপত্র জোগাড় করতে চলে গেল।

চাকরের চলে যাওয়ার সাথে সাথে কমললোচনা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে থামল এক ফুলবাগানের বুড়ো মালীর কাছে। বৃদ্ধকে সে সব কথা বলল। বৃদ্ধ তার সমস্ত কাহিনি শুনে নিজের বাড়িতে থাকতে দিল।

ইতিমধ্যে বিয়েতে যা-কিছু লাগে সেসব জিনিস নিয়ে চাকর ফিরল। কিন্তু দেখতে পেল না কমললোচনাকে। সেখানে তাকে ও ঘোড়াকে দেখতে না পেয়ে চাকর বুঝল সে বোকা বনেছে। তারপর সে কুসুমকুমারের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হুজুর, মেয়েদের মন দেবতারাই বুঝতে পারে না আপনিতো কোন ছার। আমাকে কিছু লোক ধরে ফেলল। কিছু লোক ঘোড়া নিয়ে পালাল। আমি হুজুর অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পেরেছি।'

কুসুমকুমার চাকরের কথা বিশ্বাস করল। কিছুদিন পরে কুসুমকুমারের বাবা ছেলের বিয়ের জন্য এক মেয়ে দেখল। বর পক্ষের লোক বিয়ের কাজে যাওয়ার পথে কমললোচনা যে ফুল বাগানে ছিল সেখানে বিশ্রাম করছিল। কুসুমকুমার একা এদিক-ওদিক বেড়াতে লাগল। কমললোচনা আড়াল থেকে তাকে দেখতে পেল। সে আশ্রয়দাতা বৃদ্ধকে বলল। সেই বৃদ্ধ কুসুমকুমারকে ডেকে আনল নিজের বাড়িতে।

কুসুমকুমার বৃদ্ধের বাড়িতে কমললোচনাকে দেখে তো অবাক! সমস্ত কথা জেনে সেই মুহূর্তে সে কমললোচনাকে বিয়ে করে ফেলল। সে ওই চাকরকে তাড়িয়ে দিল। বাবা যে মেয়েকে বিয়ের জন্য ঠিক করেছিলেন তাকেও কুসুমকুমার বিয়ে করল। কারণ ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে না বেরুলে তার সঙ্গে কমললোচনার আর দেখাও হত না কোনোদিন।
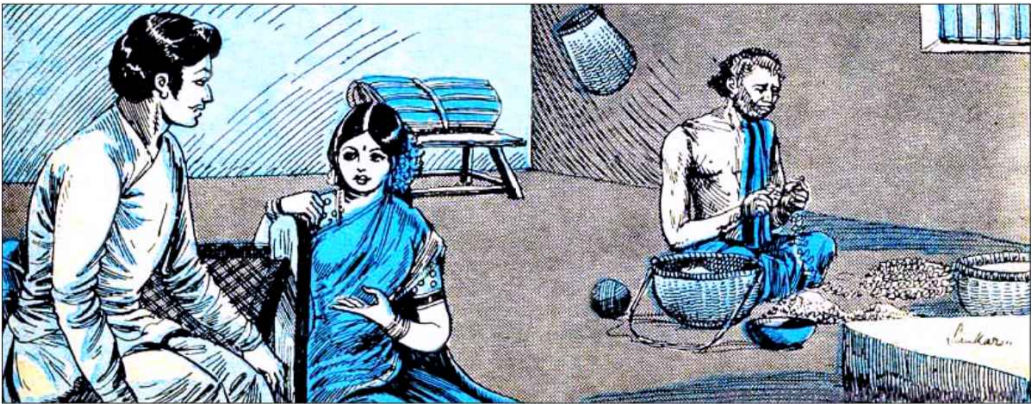
ভূত ছেড়ে গেছে

সেই গ্রামের প্রায় সবাই বোকা। এক দিন এক বেঁটে লোক এল ওই গ্রামে। দুপুর পর্যন্ত সারা গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক বাড়ির সামনে এসে বসল।

সেই বাড়ির সামনে এক ফকির এসে দাঁড়াল। এক বিচিত্র কালো পোশাকে তার সমস্ত শরীর যেন ঢেকে রেখেছে। তার হাতে এক ছড়ি ছিল। ছড়ির মাথায় ছিল এক সিংহের মাথা।

ফকির ছড়ি দিয়ে ওই বাড়ির চৌকাঠে ঠুকে হেঁকে বলল, 'আরে এই বোকারা ভিক্ষে দিয়ে যা।'

পরক্ষণেই ওই বাড়ির গিন্নি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে পোঁটলা বেঁধে ভিক্ষে এনে দিলেন ফকিরকে। ফকির সেই পোঁটলা নিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা দেখে বেঁটে লোকটা অবাক হল। সে বুঝতে পারল না ফকিরকে দেখে অত বড়ো বাড়ির গিন্নি ভয় পেলেন কেন?'

মহিলা বেঁটে লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি জানো না কেন দিলাম?'

'না, আমি আজ প্রথম এই গ্রামে এসেছি।' বেঁটে লোকটা বলল।

তারপর মহিলা ধীরে ধীরে বললেন, 'কী বলব বাবা, ফকিরটা আমাদের পেছনে ভূতের মতো লেগে আছে। এ যে কোত্থেকে এসেছে তা কেউ জানে না। ওর হাতের ছড়িটা দেখেছ তো? ওই ছড়ি দিয়ে সে যার বাড়ির চৌকাঠে মারবে তাকে তার ইচ্ছে মতো ভিক্ষে দিতে হবে। তাকে খুশি করতে হবে। ছড়ির ঘা চৌকাঠে

পড়তেই বাড়ির লোক সব কেমন হয়ে যায়। তাদের কোনো জ্ঞান থাকে না। ফকির চলে গেলে বাড়ির লোকের ঘোর কাটে। ওর চলে যাবার পর লোকে তাকে গালাগাল দেয়। ওর ব্যবহারে প্রত্যেকেই বিরক্ত। ফকিরটা ভিক্ষে নিয়ে গাঁয়ের বাইরের বাগানে চলে যায়।'

বেঁটে লোকটা এসব কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'লোকটা কি রোজ এইভাবে ধমকে ভিক্ষে নিয়ে আরামে থাকে?'

'বললাম না ওই ছড়িটি ভিক্ষে আদায়ের ছড়ি। ওই ছড়ির ক্ষমতা খাওয়ার জন্য যতটা ভিক্ষে দরকার ততটা পাওয়া পর্যন্ত থাকে তারপর আর সেদিনের মতো থাকে না। ওই ছড়ির বলে সে ধনসম্পত্তি চাইতে পারে না।' বয়স্কা মহিলা বললেন।

'গাঁয়ের কোনো লোক ওই ছড়ি কেড়ে নিতে পারেনি?' বেঁটে লোকটা বলল।

'কী বলছ বাবা! অত সাহস কার আছে!' বয়স্কা মহিলা বললেন।

'আমি ওই ছড়িটাকে নিতে পারি।' বেঁটে লোকটা বলল।

'বাবা, এই কথাটা আমাকে না বলে সন্ধের সময় ওই পঞ্চাননতলায় গাঁয়ের সবাই বসে পুরাণ শোনে তাদের বল।' এ-কথা বলে মহিলা দরজা বন্ধ করল।

সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চাননতলায় গিয়ে বেঁটে লোকটা হাজির হল। সবাইকে ফকিরের ব্যাপারে নিজে কী ভেবেছে জানাল। কিছুক্ষণ গাঁয়ের লোককে আলোচনা করতে দেখে সে বলল, 'তবে এ কাজে আপনাদের সাহায্য দরকার। আপনাদের সাহায্য ছাড়া এ কাজ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।'

বেঁটের কথা কেউ শুনল কেউ শুনল না। কয়েক জন আবার তার চেহারা দেখে হাসতে লাগল। আবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, 'কী সাহায্য চাও?'

বেঁটে লোকটা নিজের পরিকল্পনা ভালো ভাবে বুঝিয়ে বলে চলে গেল।

পরের দিন সকালে আম বাগানে ঘুম ভাঙতেই ফকির দেখতে পেল যে অদূরে একটা বেঁটে লোককে ঘুমোতে। ফকির প্রথমে তার দিকে তেমন গুরুত্ব দিল না। মাথার নীচে থেকে ছড়ি বের করে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল।

ফকিরের ভিক্ষে নিয়ে বাগানে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। সে বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে তো অবাক। তখনও সে ঝিমোচ্ছে সেখানে। তার সামনে একটা মাটির পাত্র। আর তার পাশে একটা লোহার পাতলা ছড়ি।

গাছের উপর থেকে কাক ডেকে উঠল। কাকের ডাক শুনে বেঁটে লোকটা চমকে উঠে ফকিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর লোহার ছড়ি দিয়ে ওই মাটির পাত্রে তিন বার ঠুকে দিল। পরক্ষণেই গাঁয়ের লোক তার কাছে আসতে লাগল। তারা নানা ধরনের খাবার এনে বেঁটে লোকটার পাত্রের কাছে রেখে দিল। তার থেকে নিজের পছন্দমতো খাবার নিয়ে বাকিগুলো ফেরত নিয়ে যেতে বলল বেঁটে লোকটা।

এই দৃশ্য দেখে ফকির অবাক হয়ে গেল। তার মনে হল তার ছড়ির চেয়ে ওই মাটির পাত্র ও ছড়ির ক্ষমতা অনেক বেশি। তাকে ওই ছড়ি নিয়ে দুপুর রোদে বেরিয়ে লোকের বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে আনতে হয় আর এই ছড়িওলা লোকটার কাছে গাঁয়ের লোক এসে রান্না করা খাবার দিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে আবার পছন্দ, মতো খাবার রেখে বেঁটে লোকটা খাবার ফেরত দিচ্ছে। একেবারে বসে বসে খাওয়া। আরামে শুয়ে-বসে জীবন কাটানো। কী আরামের জীবন বেঁটে লোকটার।

এসব ভেবে ফকির বেঁটে লোকটার কাছে গিয়ে বলল, ‘এই যে দাদা কেমন আছেন? কষ্ট হচ্ছে না তো? সব কুশল তো?’

‘আরে দাদা, আমি নিজের ভালো-মন্দের কথা আর কী বলব। আগে শুনি আপনি কেমন আছেন, কুশল তো?’ বেঁটে লোকটা ফকিরকে জিজ্ঞেস করল।

‘কী বলব ভায়া, বয়স তো হয়েছে আমার। এই বুড়ো বয়সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করে আনা যে কী কষ্ট তা কী করে বলব।’ বলতে বলতে ফকির বেঁটে লোকটার মাটির পাত্র ও ছড়ির দিকে লোভী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল।

বেঁটে লোকটা এ-কথার কোনো জবাব দিল না। সে মনে মনে ভাবল মাটির পাত্রের উপর ফকিরের বিশ্বাস তত গভীর হয়তো হয়নি। তাই সে ওই পাত্রের বিষয়ে কোনো কথা বলেনি।

সেদিন রাত্রেও বেঁটে লোকটা একই ভাবে মাটির পাত্রের গায়ে তিন বার ঠুকে খাবার আনিয়ে নিল। পছন্দমতো খাবার নিল বাকিটা ফেরত দিল। ফকির আরও অবাক হয়ে বেঁটে লোকটাকে বলল, 'ভায়া তুমি তো জোয়ান লোক। ইচ্ছে করলে চার বাড়ি সহজেই ঘুরে আসতে পার। আমার ছড়িটা নিয়ে তুমি তোমার এই পাত্র আর ছড়ি আমাকে দেবে ভাই? বুড়ো বয়সে আর ঘুরতে পারছি না।'

বেঁটে লোকটা কিছুক্ষণ সংকোচের ভাব দেখিয়ে বলল, 'অন্য কেউ চাইলে আমি দিতাম না। কিন্তু তুমি যেহেতু আমাকে ভাই ডেকেছ তাই আমি তোমাকে না দিয়ে পারব না।' বলে বেঁটে লোকটা ফকিরের কাছ থেকে ওই ছড়িটা নিয়ে নিজের মাটির পাত্র ও ছড়ি দিয়ে দিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ফকির বেঁটে লোকটাকে আর দেখতে পেল না। সে দুপুর পর্যন্ত আম বাগানে শুয়ে-বসে কাটিয়ে মাটির পাত্রে তিন বার ঠুকল। কিন্তু কেউ খাবার নিয়ে এল না। শেষে রেগে গিয়ে ফকির ওই পাত্র আছড়ে ভেঙে ফেলল। তার পর পেটের জ্বালায় গাঁয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল। গাঁয়ের লোক কুকুরকে যেমন খেদিয়ে দেয় তেমনি খেদিয়ে দিল।

অবশেষে ফকির ওই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক খুব খুশি হল।

নিবিড় বন্ধুত্ব

এক গ্রামে গোবিন্দ ও নারায়ণ নামে দুই বন্ধু ছিল। বন্ধুত্ব সবসময় গভীর থাকত না। কখনো তাদের মধ্যে টান বেশি থাকত আবার কখনো খুব কমে যেত। ওরা দু-জনেই মনে মনে চায় যে তাদের বন্ধুত্ব একরকম থাক। কিন্তু এই একরকম রাখার জন্য যে কী করা উচিত তা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেক দিন এই বিষয়ে ভেবে শেষে ঠিক করল তারা ভগবানের কাছে শপথ করবে একে অন্যের কাছে কিছু গোপন করবে না।

তারা কাশী যাবে ঠিক করল। পথে খাবার জন্য গোবিন্দর বউ বানাল লুচি সুজি আর মিষ্টি। নারায়ণের বউ বানিয়ে দিল আটার রুটি ও তরকারি। দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন তারা একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে লাগল। দু-জনেরই খিদের চোটে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছিল কিন্তু কেউ নিজের খাবারের পোঁটলা খোলেনি। গোবিন্দ ভাবল, নারায়ণ হয়তো শুকনো রুটি এনেছে এখন আমি ওর সামনে লুচি সুজি আর মিষ্টি বের করি কী করে। আর ওকে যদি ভাগ দেই ও হয়তো কিছু মনে করবে। আবার নারায়ণ ভাবল, গোবিন্দকে শুকনো রুটি আর তরকারির ভাগ দেব কী করে। ও নিশ্চয় ঘি মাখা ভাত এনেছে।

যতই খিদে পাক মুখে তারা কেউ তা প্রকাশ করল না। সন্ধে হয়ে এল। তখনও তারা খেল না। রাত্রে তারা পথের ধারের এক মন্দিরের চত্বরে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু খিদের জ্বালায় কারো চোখে ঘুম নেই। গোবিন্দ ভাবে, নারায়ণ ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপি চুপি পোঁটলা খুলে খেয়ে নেবে। নারায়ণও সেই চিন্তাতেই এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটাতে থাকে। সকালে উঠে দেখে তাদের শরীরে শক্তি নেই।

গোবিন্দ লোলুপ দৃষ্টিতে তার খাবারের পোঁটলার দিকে তাকাল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পিঁপড়ে সারি বেঁধে তার পোঁটলা থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। গোবিন্দের রাগ মুহূর্তে বেড়ে গেল। রাগে তার চোখ ঠিকরে আগুন বেরুচ্ছিল।

'কী হল গোবিন্দ মনে হচ্ছে ভীষণ চটে গেছ?' নারায়ণ জিজ্ঞেস করল।

'আমার বউটার কাণ্ড দেখ! লুচি সুজি আর মিষ্টির সঙ্গে এক কাঁড়ি পিঁপড়েও পোঁটলায় বেঁধে দিয়েছে!' বলতে বলতে গোবিন্দ পোঁটলা খুলে ফেলল। তাতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে।

গোবিন্দ খাবার ফেলে দিয়ে বলল, 'বউটা এত পাজি আর বদমাইশ হয়েছে যে বলার নয়! একবার বাড়ি ফিরি, মজা দেখাচ্ছি। পিঠের চামড়া তুলে দেব!'

গোবিন্দের এই অবস্থা দেখে নারায়ণও তাড়াতাড়ি নিজের পোঁটলা খুলল। হায়, সেই পোঁটলা দিয়েও হাজার হাজার পিঁপড়ে বেরুতে লাগল। তা দেখে নারায়ণ চোখ ছানাবড়া করে বলল, 'গোবিন্দ, দেখেছ আমার বউয়ের কাণ্ড! হারামজাদি আমার সঙ্গে এ-রকম করল। আর যাওয়া হবে না! বাড়ি ফিরে গিয়ে আচ্ছা করে বউকে না ঠ্যাঙালে শান্তি পাচ্ছি না।'

গোবিন্দও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে রাজি হল। যেই কথা সেই কাজ। তারা দু-জনে বাড়ি ফিরে যে-যার বউকে মারধোর করল। বউরা বুঝল আসল ঘটনা।

কিছুদিন পরে দু-জনে আবার কাশী যাবে ঠিক করল। এবার গোবিন্দ ও নারায়ণের বউ দু-জনে গোপনে বসে ঠিক করে নিল কী করবে। এবার ওরা যা করবে তাতে ওদের আর কাশী যাওয়া হবে না।
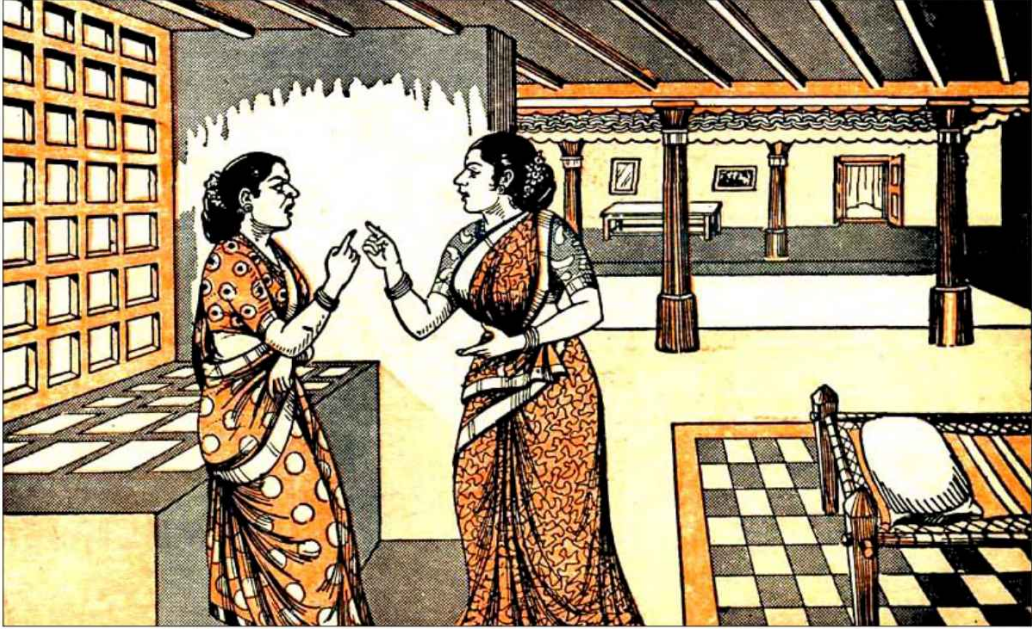
গোবিন্দ ও নারায়ণের বেরুনোর সময় দু-জনের বউরা তাদের হাতে খাবারের পোঁটলা দিতে দিতে বলল, 'কাশী যারা যায় তারা সারা পথে দানধর্ম করে। শুধু তীর্থ করলে কোনো ফল হয় না।'

ওরা বেরিয়ে পড়ল। পথে হাঁটতে হাঁটতে দুপুরে ওরা একটা গাছের নীচে বসে যে-যার পোঁটলা খুলল। দু-জনের পোঁটলাতেই ডালপুরি ছিল। তবু গোবিন্দ নারায়ণকে দুটো ডালপুরি দিল আর নারায়ণও গোবিন্দকে দুটো ডালপুরি দিল।

নারায়ণের দেওয়া ডালপুরি মুখে পুরতেই গোবিন্দের মুখ যেন জ্বলে গেল। ঠিক তখনই নারায়ণ গোবিন্দের দেওয়া ডালপুরি মুখে তুলে আবার বমি করে তার সামনে ফেলে দিল।

নারায়ণের লুচিতে ঝাল অনেক বেশি পুরে দেওয়া ছিল আর নুন একেবারেই ছিল না।

আবার গোবিন্দর পুরিতে নুন ঠেসে পুরে দেওয়া ছিল আর ঝাল মোটেই দেওয়া হয়নি।

গোবিন্দ 'ঝাল ঝাল' করে চিৎকার করতে করতে নারায়ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারায়ণও 'নুন নুন' বলতে বলতে গোবিন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-জনে যখন একে অন্যকে দমাদম মারছিল তখন রাস্তার লোক তাদের মারামারি থামিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, তোমরা এ-রকম মারামারি করছ কেন?'

'মশাই, আমরা দু-জন বন্ধু। আমরা ঠিক করেছিলাম কাশী যাব। কাশী বিশ্বনাথের কাছে শপথ করব যাতে আমাদের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। একরকম থাকে। দু-জনে যে-যার বাড়ি থেকে বউদের বানানো খাবার এনেছি।
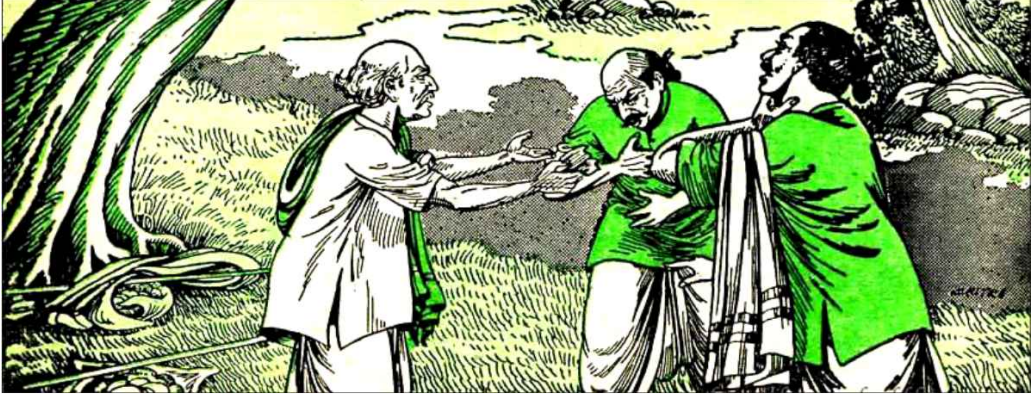
যে-যার খাবার বের করে দিয়ে খেতে গিয়েই এই কাণ্ড হয়েছে। মারামারি কী আর সাধে করছি মশাই। আপনারাই একটু চেখে দেখুন না! খাবারের কী অবস্থা। মুখে দেওয়া যায় না।' গোবিন্দ ও নারায়ণ রাস্তার লোককে বলতে লাগল।

'আচ্ছা, দেখি তোমরা যে-যার পোঁটলা থেকে ডালপুরি আমাদের দাও তো, আমরা খেয়ে দেখি।' ওরা এই কথা বলে ওদের দু-জনের কাছ থেকে পাওয়া ডালপুরি চেখে হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'ওহে, আমরা তো এতে খারাপ কিছু দেখছি না। এই ডালপুরি তো এমনভাবে তৈরি করা যাতে দু-জনে মিলে মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে পার। এইভাবেই তো বন্ধুত্ব জমে উঠে। মনের মিল হয়। আর মনের মিল না হলে শুধু শুধু ঠাকুরের কাছে শপথ করে কী হবে। মনে হচ্ছে, তোমাদের চেয়ে তোমাদের বউরা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। ওরা এই খাবার দেবার মাধ্যমে যা শিখিয়েছে তা তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের বন্ধুত্ব অনেক বেশি গভীর ও নিবিড় হত। এসব না বুঝে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তোমাদের কোনো লাভ হবে না।'

পথিকদের কথা কান খাড়া করে শুনে গোবিন্দ ও নারায়ণ মনে মনে খুব লজ্জা পেল। এই ঘটনার পর তারা বুঝল যে কাশী যাওয়ার কোনো সার্থকতা নেই। তারা বাড়ি ফিরে গেল। তারপর থেকে জীবনে কোনোদিন তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি।

চন্দ্রভানু

ক্ষত্রপুরে রাজা উদয়ভানু রাজত্ব করতেন।

তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রূপমতী। ওই দম্পতির অনেক কাল ধরে কোনো সন্তান ছিল না। সন্তান যাতে হয় তারজন্য নানান মন্দিরে পুজো দিলেন। সাধুসন্ন্যাসী খোঁজ করে তাঁদের সেবা দিলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না।

শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে এক পরমাসুন্দরীকে বিয়ে করলেন। তাঁর নাম লাবণ্য। বিয়ে যখন করেন তখন উদয়ভানুর বয়স চল্লিশ। রাজা সর্বক্ষণ লাবণ্যের কাছেই কাটাতেন। বড়ো বউয়ের কাছে মাসে খুব জোর দু-তিন দিন থাকতেন।

বিয়ের পর দু-বছর কেটে গেল। কিন্তু লাবণ্যের গর্ভে কোনো সন্তান হল না। এর মধ্যে বড়ো রানি কোন শেকড় বাকল খেয়ে জননী হওয়ার চেষ্টা করে সফল হল। তাঁর গর্ভে একটি সুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করল। শিশুর নাম রাখা হল চন্দ্রভানু। রূপমতী ভাবল এবার তার দিন ফিরেছে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কারণ ইতিমধ্যে লাবণ্য রাজাকে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল। লাবণ্য যা বলতেন রাজা মাথা নীচু করে তা পালন করে যেতেন। ছোটো রানির কোনো কথারই বিরুদ্ধতা তিনি করতে পারতেন না।

রূপমতীকে লাবণ্য মোটেই দেখতে পারত না। তাই সে রাজাকে বোঝাল, রূপমতী কোনো তুকতাকের সাহায্যে গর্ভবতী হয়েছে। এই ধরনের কাণ্ড করে যে ছেলের জন্ম হয় সে ছেলে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়। ফলে

যে রাজা রূপমতীর গর্ভে সন্তান যাতে আসে তারজন্য জপতপ করলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিলেন তিনিই আবার পরে চন্দ্রভানুকে গোপনে বনে রেখে আসতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আট মাসের শিশু চন্দ্রভানুকে বনে ফেলে আসার ভার রাজা সৎকাল নামক একজনকে দিলেন। সৎকাল চন্দ্রভানুকে নিয়ে গোপনে বনের দিকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু সে বনে না গিয়ে সে গেল পাশের রাজ্যে তার এক জাদুকর বন্ধুর কাছে। নাম তার জাদুপতি।

ওই রাজ্যের নাম সাতপুরি। সব কথা শুনে চন্দ্রভানুকে লালনপালন করার দায়িত্ব নিল।

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কেটে গেল। উদয়ভানুর কপালে আর কোনো সন্তানের আবির্ভাব ঘটল না। লাবণ্য মা হতে পারল না। পরে লাবণ্যের উপদেশ মতো রাজা লাবণ্যর ভাইপোকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন।

উদয়ভানুর বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু তাঁর টান লাবণ্যের প্রতি একটুও কমেনি। আস্তে আস্তে এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাবণ্য রাজার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি দেখতে লাগলেন। লাবণ্যর নির্দেশে বড়ো রানি রূপমতীকে এক সাধারণ মহিলার মতো জীবনযাপন করতে হত। তাঁকে থাকতে হত একটি অতি সাধারণ ঘরে। দাসীর জীবন কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে। ঘরে-বাইরে লাবণ্যর নিষ্ঠুর আচরণের ফল দেশবাসীর উপর গিয়ে পড়তে লাগল। প্রজাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠল।

হঠাৎ একদিন লাবণ্য রাজার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর নামে লিখে দিতে বললেন। রাজা বেঁচে থাকতেই এভাবে দাবি করাতে তাঁর চোখ ফুটল। তিনি বুঝতে পারলেন ছোটোরানি লাবণ্যর আসল মতলব। তিনি বুঝলেন যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। কিন্তু বুঝেও কিছু করার ছিল না তাঁর। যা করার অনেক আগেই করা উচিত ছিল। ফলে রাজাকে ছোটো রানির কথামতোই কাজ করতে হল। রাজ্যের সমস্ত ভার লাবণ্যকে দিতে হল।

এইভাবে কয়েক বছর কাটার পর রাজা উদয়ভানু ও বড়ো রানি রূপমতী এক

জায়গায় সাধারণ মানুষের মতো থাকতে লাগলেন। ওঁরা যেন আবার নিজেদের খুঁজে পেলেন। রাজা চন্দ্রভানুকে বনে পাঠিয়েছিলেন ভেবে অনুতপ্ত হতে লাগলেন। রূপমতী সেই দরিদ্র অবস্থায় থেকে রাজার সেবা করতে লাগলেন। চন্দ্রভানুর জন্মের ষোলো বছর পরে রূপমতী আবার এক কন্যার জননী হলেন। ওদিকে চন্দ্রভানু জাদুকরের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক জাদুবিদ্যা শিখে নিল। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সে বলবান।

একদিন এক শুভ মুহূর্তে চন্দ্রভানু জাদুপতিকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যের দরবারে হাজির হল। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'আমি চন্দ্রভানু, এই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

লাবণ্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বাজে কথা বলার জায়গা পাওনি? চন্দ্রভানু কোন কালে বনের জন্তুজানোয়ারদের পেটে গেছে। যাও ভাগ এখান থেকে, তা না হলে গর্দান যাবে।'

'আমি একবার রাজাকে দর্শন করতে চাই।' চন্দ্রভানু বলল।

'রাজা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি শয্যাশায়ী। উনি দরবারে আসতে পারেন না।' লাবণ্য জবাবে বলল।

'আমি আমার মাকে দেখতে চাই। তাঁর কাছে যেতে চাই।' চন্দ্রভানু বলল।

'তোমার মা এখানে ছিল? মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আসতে কে বলেছে? এক্ষুনি চলে যাও তা না হলে তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে।' রানি লাবণ্য ধমক দিয়ে সেপাইদের ইশারায় তাকে বন্দি করতে বলতেই সে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

সেই রাজ্যের মানুষ লাবণ্যের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠল। রাজা উদয়ভানু বা তাঁর পোষ্যপুত্রের প্রতিও দেশবাসীর কোনো আস্থা ছিল না। এই অবস্থায় দরবারে চন্দ্রভানুর বজ্র ঘোষণা, উদয়ভানুর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসন দাবি প্রভৃতি বিষয় দাবানলের মতো দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মনে কোনো এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশা দেখা দিল।

চন্দ্রভানুও ইতিমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে তাদের জানাল। ওরা চন্দ্রভানুকে বলল, 'যুবরাজ, তুমি আমাদের এই দুষ্ট রানির হাত থেকে বাঁচাও। আমরা তোমায় সাহায্য করব।'

দেশের মানুষকে জড় করে চন্দ্রভানু পরের দিন দরবারে পৌঁছাল। চন্দ্রভানুকে যে পোশাকে বনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পোশাকও সে সঙ্গে নিল। দেশবাসীর সামনে লাবণ্যকে ওই পোশাক দেখিয়ে বলল, 'এই পোশাক চিনতে পারেন? এই পোশাকেই তো আমাকে বনে পাঠানো হয়েছিল!'

'ওই শিশুকে হয়তো পশুর মুখে ঠেলে দিয়ে তোমরা চক্রান্ত করে এই পোশাক নিয়ে হাজির হয়েছ।' লাবণ্য বললেন।

বৃদ্ধেরা এ-কথা শুনে বললেন, 'নিজের মা-বাবা তো নিশ্চয় চন্দ্রভানুকে চিনতে পারবেন। তাঁদের কাছে পাঠান একে।'

রাজা উদয়ভানু ও রূপমতী অপলক চোখে তাকিয়েও চন্দ্রভানুকে চিনতে পারলেন না। তার পর সুযোগ বুঝে লাবণ্য চন্দ্রভানুকে বললেন, 'ওরে বিশ্বাসঘাতক তোর আসল রূপ ধরা পড়েছে। এবার তোকে মৃত্যুদণ্ড দেব।'

তখনই অদূর থেকে জাদুপতি বলে উঠলেন, 'সঠিক মা এবং সন্তানকে চেনার একটা উপায় আছে। অত তাড়াহুড়ো করে ফাঁসির হুকুম না দিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। মার বুকের দুধ পুকুরের এক প্রান্তে জলে ঢেলে অন্য প্রান্ত থেকে ছেলে এক ঘড়া জল তুলুক। ওরা যদি সত্যি সত্যি মা ও ছেলে হয় তাহলে ঘড়ার জল দুধ হয়ে যাবে। অতএব, আপনি রানি রূপমতী ও চন্দ্রভানুকে একটি পুকুরের দুই প্রান্তে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।'

লাবণ্য ভাবলেন, জাদুপতি যা বলছেন তা কোনোক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। তিনি বললেন, 'পরীক্ষা হোক। কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সঙ্গেসঙ্গে এই ছেলেটিকে ফাঁসি দেওয়া হবে।'

'তারজন্য আমি প্রস্তুত আছি।' চন্দ্রভানু যেন বুক ঠুকে জবাব দিল।

ঠিক হল দু-দিন পরে রাজপ্রাসাদের কাছে যে পুকুর আছে তাতেই পরীক্ষা করা হবে।

পরীক্ষার দিনে পুকুরের চারদিকে হাজার হাজার মানুষ জমা হয়ে গেল। সকলের মনে এক প্রশ্ন, কী হবে? তার পর জাদুপতির কথামতো সব হল। রূপমতী পুকুরের এক প্রান্তে দুধ ঢাললেন আর অন্য প্রান্তের জল ঘড়া করে চন্দ্রভানু তুললেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ঘড়ায় জল নেই। আছে শুধু দুধ! সমবেতদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এল যেন। বৃদ্ধরা এগিয়ে এসে বললেন লাবণ্য কে, 'পরীক্ষা তো হল। এখন তো আর কোনো সন্দেহ রইল না। অতএব,

আর কাল বিলম্ব না করে চন্দ্রভানুকে সিংহাসনে বসান। আপনি নামুন সিংহাসন থেকে।'

লাবণ্য মাথা নীচু করে সিংহাসন থেকে নাবল। চন্দ্রভানুর ঘড়ার জল কীভাবে সাদা হয়ে গেল বলব? একটি পরিষ্কার সাদা কাপড়ের টুকরোকে চন্দ্রভানু আগে বারো বার দুধে ডুবিয়ে বারো বার শুকোতে দিল। জলে নেমে ঘড়ায় করে জল তুলে তাতে ওই ন্যাকড়া ঢুকিয়ে ভালো ভাবে নাড়ল চন্দ্রভানু। পরে কায়দা করে ওই ন্যাকড়া বের করে পায়ের নীচের মাটিতে ঢুকিয়ে দিল। তার পর ওই ঘড়া ভরতি সাদা জল নিয়ে পুকুর থেকে উঠল।

পুকুরের চারদিকে যারা ছিল তারা ওই সাদা জলকেই দুধ ভেবে আনন্দ মুখর হয়ে উঠল।

কুকুরের ব্যাবসা

পাঁচ-শো বছর আগে হাঙ্গেরিতে মাত্যাস নামে এক ধর্মাত্মা রাজা শাসন করতেন। সেই সময়ে রাজধানীর অল্প দূরের এক গ্রামে এক ধনী বাস করত। অন্যদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানো তার প্রায় জন্মগত অধিকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকী আত্মীয়স্বজনদেরও সে ঠকাতে ছাড়ত না। ওরা সহজে তার কথায় চলতে গিয়ে ভীষণভাবে ঠকে যেত। কাউকে ঠিকমতো ঠকাতে পারলে তার দারুণ আনন্দ হত। এককথায় ঠকানোই ছিল তার পেশা এবং নেশা।

একবার সেই ধনী লোকটা রাজধানীতে গেল। কিছু কেনাকাটা করে থলে ভরতি সোনার মোহর নিয়ে গাঁয়ে ফিরল। গাঁয়ের প্রত্যেককে বলতে লাগল যে সে রাজধানীতে কুকুর বিক্রি করে এত সোনার মোহর লাভ করতে পেরেছে ও রাজধানীতে কুকুরের ভীষণ চাহিদা আছে।

সেই গাঁয়েরই একটা গরিব লোকের মনে আশা জাগল কিছু সোনার মোহর রোজগারের। সাত-পাঁচ ভেবে সে ওই ধনী লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, ‘বাবু, কুকুরের ব্যাপারে যা শুনেছি তা কি সত্য?’

‘হ্যাঁরে! বিশ্বাস হল না? রাজা মাত্যাস অন্ধ খোঁড়া কুকুর খুঁজছেন। কথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গে হাতে যা ছিল খরচ করে কুকুর জোগাড় করে সোজা রাজার কাছে বিক্রি করে এলাম। ভালো দাম পেয়েছি। তুমি গরিব, তোমার উপকার হবে।’ ধনী লোকটা বলল।

গরিব ধনীর কথায় বিশ্বাস করল। তার মনেও ধন রোজগারের প্রবল ইচ্ছা
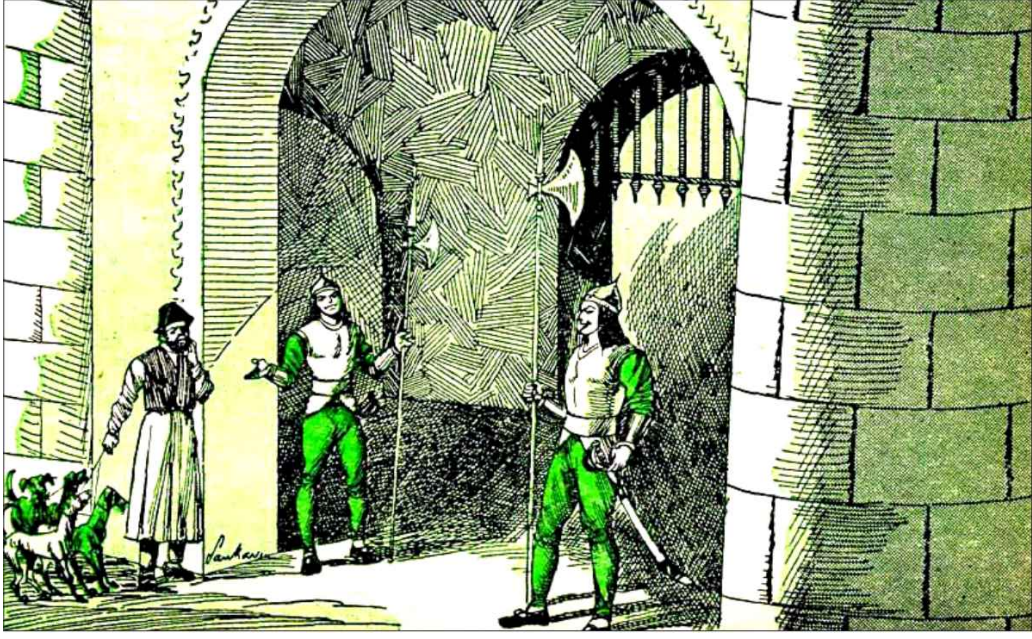
জাগল কিন্তু তার নিজের কানাকড়িরও মুরোদ ছিল না। এমন কোনো জিনিসও নেই যা বিক্রি করে কিছু টাকা পাবে। আছে এক হাড্ডিসার গোরু। শেষপর্যন্ত সে সেই রোগা গোরুটাকেই বিক্রি করে যা পেল তাই দিয়ে গোটা কয়েক কুকুর কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাজধানীর দিকে চলল।

গরিব লোকটা রাজপ্রাসাদে গেল বটে কিন্তু ভিতরে যেতে পারল না। পাহারাদারের কাছ থেকে বাধা পেল। তখন গরিব লোকটা বুঝতে পারল যে ধনী লোকটা তার সঙ্গে মারাত্মক রসিকতা করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। বেচারা নিরুপায় হয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

উপর থেকে রাজা এসব ব্যাপার লক্ষ করছিলেন। তিনি একটা লোককে কুকুর নিয়ে রাজদরবারে আসতে দেখে কৌতুক বোধ করলেন। রাজা ওই লোকটাকে ধরে আনতে লোক পাঠালেন। গরিব লোকটা রাজার কাছে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বলল।

গরিব লোকটার উপর রাজার একটু দয়া হল। রাজা জানালেন যে তিনি কুকুর কিনে থাকেন তা সত্য। রাজা গরিব লোকটার কাছ থেকে কুকুর নিয়ে এক-শো সোনার মোহর দিয়ে জেনে নিলেন ধনী লোকটার নাম-ঠিকানা। গরিব লোকটার তো আনন্দের সীমা নেই, সবাইকে জানাল এবং সোনার মোহরও দেখাল।

ধনী লোকটা ভাবল কোথায় ভেবে ছিলাম আমার কথায় বিশ্বাস করে যারা কুকুর নিয়ে যাবে তারা ঠকবে। আর একি হল! উলটে সত্যি সত্যি সোনার মুদ্রা নিয়ে এল! ঠাট্টা করে যা প্রচার করলাম তা সত্যি হল!

এবারে ধনীর মনেও কুকুর বিক্রি করে টাকাপয়সা রোজগারের ভীষণ ইচ্ছে

জাগল। সে নিজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিল। ওই অর্থ দিয়ে হাজার হাজার কুকুর কিনল। তারপর সমস্ত কুকুর নিয়ে একেবারে রাজধানীতে হাজির হল। পাহারাদার তাকে এবং তার কুকুরদের রাজপ্রাসাদের ভিতরে যেতে দিল না। ধনী লোকটা রেগে গিয়ে ধমক দিল। কিন্তু পাহারাদারও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সেও পালটা ধমক দিয়ে ধনী লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে লাগল। কুকুরগুলোও ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

রাজা এই হইচই উপর থেকে শুনে পাহারাদারকে আদেশ দিলেন ওই ধনী লোকটাকে কুকুর সহ ভিতরে আনতে।

ধনী লোকটা রাজাকে জানাল যে সে তাঁর কাছে কুকুর বিক্রি করতে এসেছে। ধনীর নাম শুনেই রাজা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। রাজা ভাবলেন যে এই লোকটাই তো গরিবের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। রাজা ধনীকে বলল, 'আমি একবারই কুকুর কিনে থাকি। এখন আর কুকুরের দরকার নেই। তুমি এত দেরি করে এলে! আগে এলে তোমার কাছ থেকেই কিনতাম।'

ধনী লোকটা যেভাবে কুকুরদের নিয়ে নিজের গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছিল ঠিক তেমনি তাদের নিয়ে গ্রামে ফিরল। ধনী লোকটার সম্পত্তির আর কিছুই রইল না। এই ঘটনার পর গ্রামের লোকগুলো ধনীর কুকুর বিক্রি করতে যাওয়ার ব্যাপারটাকে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করত।

কবির সম্মান

দেবগিরিতে বিখ্যাত এক কবি ছিলেন। প্রত্যেক বছর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। যেখানে যেতেন সেখানকার রাজার প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। রাজা তাঁকে সম্মানিত করতেন। কবি পেতেন বহু উপহার ও অর্থ। সেসব নিয়ে কবি ফিরে আসতেন দেবগিরিতে।

একবার ওই কবি অমরাবতীতে পৌঁছোলেন। স্বামী-স্ত্রী সেখানকার যা-কিছু ছিল সব দেখলেন। সেখানে লোকের মুখে কবি শুনলেন যে সেখানকার রাজা প্রজাদের সুখে রেখেছেন। ওই রাজা পণ্ডিত বা কবিদের খুব পছন্দ করতেন। স্ত্রীকে ধর্মশালায় রেখে কবি গেলেন রাজার কাছে। রাজদরবারে গিয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে রাজাকে শোনালেন।

কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমরাবতীতে থাকবেন?'

'আজ্ঞে না মহারাজ। আমি তীর্থ করার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরি। স্থায়ী বাসস্থান দেবগিরি। অন্য কোথায়ও আমি থাকব না।' কবি জবাব দিল।

কবির কথা শুনে রাজা কেমন যেন নিরাশ হলেন। রাজা চাইতেন না যে তার দেশের পয়সা অন্য কোনো দেশে যাক। তিনি চাইতেন তাঁর দেশের সমৃদ্ধি। রাজার ইচ্ছা করছিল না কবিকে কোনো পুরস্কার দিতে।

অমন সুন্দর কবিতা যখন তাকে নিয়ে লিখেছেন তখন কিছু না দিয়েই বা পারা যায় কী করে। আহারের পর রাজার কাছ থেকে সুন্দর বস্ত্র পেলেন কিন্তু তার মন উঠল না। তবু প্রসন্নতার অভিনয় করে গেলেন।

‘আপনি রাজার কাছে গিয়েছিলেন? রাজার নামে প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন? রাজা আপনাকে কোনো পুরস্কার দেননি?’ কবির স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

‘ও বেচারার কাছে কী বা আছে দেবার?’ কবি বললেন।

‘রাজার কাছে কি ধনসম্পত্তি নেই?’ স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমারই ভুল হয়েছে। যে বিদ্বান নয় তাঁকে আমি পণ্ডিত বলে কবিতা রচনা করেছি। তাঁকে আমি রসিক সম্রাট আখ্যা দিয়েছি আমার কবিতায়। যে বিড়াল দেখলে ভয় পায় তাঁকে আমি বীরপুরুষ হিসেবে চিত্রিত করেছি। এত ভালো কথা শুনেও রাজা কিছুই দেননি শুধু খাইয়ে একটা বস্ত্র দান করে বিদেয় দিলেন।’ কবি বললেন।

‘ওই খাবারটাও তো জনতার সম্পত্তি।’ স্ত্রী বললেন।

ওই ধর্মশালায় প্রায় প্রত্যেকে রাজার গুপ্তচর ছিল। তাই কবি ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে যে কথাগুলো হল তার প্রত্যেকটি রাজার কানে সেই রাতেই পৌঁছে গেল।

পরের দিন কবি স্ত্রীকে নিয়ে দেবগিরির দিকে রওনা দিলেন। কিছুক্ষণ পর ওঁরা একটা গোরুর গাড়ি পথে দেখতে পেলেন। গোরুর গাড়ির লোকটা দেবগিরি যাচ্ছে বলে কবি ও তার স্ত্রীকে গাড়িতে বসাল।

কবির বাড়ি পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে অমরাবতী থেকে দূত এল। কবির সামনে একটা পোঁটলা রেখে বলল, ‘মহারাজ আপনাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রার পুরস্কার পাঠিয়েছেন। সেখানে দিলে আপনি তুলতে পারবেন না বলে এখানে পাঠিয়েছেন।’ এ-কথা বলে পোঁটলা রেখে দূত চলে গেল।

সেই বছরই কবি দেবগিরি থেকে অমরাবতী চলে গেলেন। অমরাবতীতেই স্থায়ী বাসস্থান করে নিলেন।

টাকার গাছ

রামকানাইয়ের বয়স যখন দশ বছর তখন তার বাবা মারা গেল। পরিবারে নেমে এল বিষাদের ছায়া। রামকানাইয়ের মা রাতদিন কাজ করে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করল।

রামকানাই বড়ো হল। কিন্তু ছেলের মন কাজকর্মের দিকে বসছিল না। ছেলে কাজ করে না, সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয় বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে রামকানাইয়ের কিছু ছিল না। যখন-তখন মার কাছে পয়সা চাইত। মাকে জ্বালাত।

একদিন তার মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'বাবা, তুই যে সবসময় পয়সা চাস। তুই ভেবেছিসটা কী? অ্যাঁ? বলি আমাদের কি টাকার গাছ আছে যে নাড়া দিলেই পড়বে?'

'ঠিক আছে তোমাকে দিতে হবে না। এবার থেকে আমিই রোজগার করব। টাকা মাটিতে পুঁতে দেব। তারপর গাছ হবে। যত পয়সা চাই পাব।' রামকানাই বলল।

'ওরে পাগলা টাকা পুঁতলে গাছ হয় না! বিশ্বাস না হয় খুঁজে খুঁজে দেখ কোথাও টাকার বীজ পাস কি না।' রামকানাইয়ের মা বলল।

বোকা ছেলে মার কথামতো বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। খোঁজ করল টাকার বীজের। রামকানাই চেনাজানা ধনীদের জিজ্ঞেস করল টাকার বীজ কোথায় পাওয়া যায়। ধনীরা রামকানাইয়ের বোকামি দেখে বলল, 'টাকার বীজ তো পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় না, বনে যাও পাবে।'

রামকানাই তাদের কথা বিশ্বাস করে বনে গেল। বনে একটা বুড়িকে কাঠ কুড়োতে দেখল।

'দিদিমা, টাকার বীজ কোথায় পাওয়া যায় বলত?' রামকানাই জিজ্ঞেস করল। বুড়ি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদুভাই, সন্ধে হয়ে এল। এখন গোটা কয়েক কাঠ কুড়োও দিকি, তারপরে বলছি।'

রামকানাই মহাখুশি। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে অনেক কাঠ জমা করল। অন্ধকার হয়ে এল। বুড়ি বলল, 'দাদুভাই, আমি বুড়ো হয়েছি। এত বোঝা আমি একা বইতে পারব না। তুমি যদি আমার বাড়িতে বোঝাটা দিয়ে আসতে, বড়ো উপকার হত ভাই!'

রামকানাই কাঠের বোঝা মাথায় করে বুড়ির পিছনে পিছনে গেল তার বাড়ি।

তারপর বুড়ি বলল, 'দাদুভাই, এই কাঠগুলো বিক্রি করে এসো না ভাই।'

রামকানাই কাঠের বোঝা মাথায় করে গাঁয়ের লোকের দরজায় ফিরি করল। কাঠ বিক্রি করে টাকা এনে বুড়ির হাতে দিল। বুড়ি খুব খুশি হল।

'দিদিমা, বল না টাকার গাছের বীজ কোথায় পাব।' রামকানাই জিজ্ঞেস করল।

'সময় হলে আমি নিজেই বলব। ততদিন তুমি অপেক্ষা কর।' বুড়ি বুঝিয়ে বলল।

সেদিন থেকে রামকানাই বুড়ির কাছেই থাকতে লাগল। বুড়ির কথামতো সে প্রত্যেক দিন বনে যেত, কাঠ কাটত, ওই কাঠ বিক্রি করে যা পেত তা বুড়ির হাতে দিত।

এইভাবে রামকানাইয়ের দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। একদিন বুড়ি টাকাপয়সার একটা পোঁটলা এনে তার হাতে দিল। পোঁটলা হাতে নিয়ে সে তো অবাক।

তা দেখে বুড়ি বলল, 'এসব তোমারই খাটুনির দাদুভাই। পরিশ্রমই হচ্ছে টাকার গাছের বীজ। এই পোঁটলা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। পরিশ্রম করে মাকে খুশি কর।'

সেদিন রামকানাই বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। ছেলে রোজগার করে টাকা এনেছে দেখে মার খুব আনন্দ হল।

কাঠের ঘোড়া

কয়েক-শো বছর আগেকার কথা। পারস্যের বাদশাহ ছিলেন সাবুর। মস্তবড়ো নাম করা বাদশাহ। ধনসম্পত্তিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

যারা তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাততো তিনি তাদের কিছু দিতেন। খালি হাতে ফেরাতেন না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল বিরাট অনুরাগ। উৎসাহ দিতেন নানা ভালো কাজে।

বাদশাহের ছিল তিনটি চাঁদপানা মেয়ে। ছেলে মাত্র একটি।

রাজধানীতে বছরে দু-বার উৎসব হত। একটা নওরোজ বা নতুন বছরের আর অন্যটি মিহিরগান বা শারদোৎসবের। এই দুটো উৎসবের সময়েই দু-দিন ধরে মেলা বসত। দোকানপাট আর মানুষের ভিড় হত দেখবার মতো। নাচ-গান, তামাশার ব্যবস্থাও থাকত। নানা দেশের শিল্পী আসত ওই মেলায় রাজাকে নতুন নতুন জিনিস দেখিয়ে বকশিশ নিয়ে যেত।

একবার নওরোজ উৎসবের শেষের দিকে তিন জন শিল্পী একসাথে বাদশাহের কাছে হাজির হল। তিন জনের দেশ তিন জায়গায়। আলাদা দেশের মানুষ হলেও তিন জনই শিল্পী। বাদশাহকে সেলাম করে ওরা দাঁড়াল। ওই তিন জনের একজন হল হিন্দু। খোদ ভারতবর্ষের লোক। অন্যজন ছিল রোমের। আর তৃতীয় জন পারস্যেরই অধিবাসী। ওরা প্রত্যেকে বাদশাহের জন্য নতুন ধরনের অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এল। বাদশাহ তাদের দেখে খুব খুশি হয়ে তাদের ভেতর থেকে এক-এক জন শিল্পীকে ডাকলেন। প্রথমে ডাক পড়ল ভারতবর্ষ থেকে আসা শিল্পীর।

'কী এনেছ?' বাদশাহ বললেন।

ভারতবর্ষের লোক একটা সোনার মানুষ দেখাল। সোনার মূর্তির হাতে একটা সোনার ভেরি।

'এই মূর্তির কী গুণ আছে?' বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'হুজুর, এর গুণ হল পাহারা দেওয়া এবং মেরে ফেলা। একে সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলে শত্রু দরজার কাছে এলে ভেরি বেজে উঠবে। আর ওই শত্রু সঙ্গেসঙ্গে মারা যাবে।'

শিল্পীর বর্ণনা শুনে বাদশাহ খুশি হয়ে বললেন, 'এ যদি সত্য হয়, তুমি যত বকশিশ চাইবে, পাবে।'

তারপর রোমের লোকটির ডাক পড়ল। গ্রিক শিল্পী কুর্ণিশ করে দাঁড়াল।

'তুমি নতুন কী এনেছ?' বাদশাহ বললেন। সাথে সাথে রোমের শিল্পী বাদশাহের সামনে একটি রুপোর থালার উপর বসানো সোনার মুরগি রাখল। ওই মুরগির আশেপাশে চব্বিশটি মুরগির ছানা। সেগুলোও সোনার তৈরি। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে রোমের পণ্ডিত। এত, এতগুলো বাচ্চা আর একটি মুরগি! এরা কী করবে?'

'হুজুর প্রত্যেক ঘণ্টায় মুরগিটা তার এক-একটা বাচ্চার গায়ে ঠোকর মারবে। আর সাথে সাথে পাখা ঝাপটাবে। প্রত্যেক ঘণ্টায় ডাক শুনতে পাবেন। ডাকার সময় ঈদের চাঁদও দেখতে পাবেন তার গলায়।' রোমের পণ্ডিত বলল।

'চমৎকার ব্যাপার তো! সত্য হলে বকশিশ দেব।' বাদশাহ বললেন।

তারপর বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, 'তোমার কী আছে, দেখাও।'

পারস্যের শিল্পী একটা দামি কালো কাঠের তৈরি ঘোড়া রাখল। চমৎকার তার গড়ন। রূপে রেখায় জীবন্ত। ঝক ঝক করছে। জিন, লাগাম ও রেকাব আছে। তাতে আবার সোনা-মনি-মুক্তোর বাহার।

বাদশাহ কোনো কথা শোনার আগেই বললেন, 'বা! ঘোড়াটাকে তো দেখতে বেশ! এর কি কোনো গুণ আছে নাকি সুন্দর দেখতে এই যা?'

'এর গুণ হুজুর এককথায় বলে শেষ করা যাবে না। মন যত তাড়াতাড়ি চলে এর গতিও তত। এই ঘোড়ায় চড়ে কল টিপলেই ঘোড়া আপনাকে এক বছরের পথ এক দিনেই নিয়ে যাবে। যেখানে ইচ্ছা যখন খুশি, যত দূর খুশি যেতে পারবেন।' পারস্যের পণ্ডিত বলল।

বাদশাহ খুব খুশি হয়ে বললেন, 'তোমরা তিন জনে আমার এখানে দু-একদিন থাক। যা ইচ্ছে তাই খাও। যেখানে খুশি বেড়াও। এই পুতুল, মুরগি আর ঘোড়ার খেলা দেখাও। বকশিশ নিয়ে যাও।'

তিন জনে একসাথে রাজি হয়ে গেল। তারপর বাদশাহের হুকুম হল খেলা

দেখানোর। ভারতবর্ষের শিল্পী তার সোনার মূর্তির ভেরি বাজিয়ে শোনাল। বাদশাহ তা দেখে আর শুনে আনন্দ পেলেন।

তারপর রোমের পণ্ডিত তার রুপোর পাত্রে বসানো মুরগি আর তার বাচ্চা বাদশাহের সামনে রেখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের ডাক আর পাখা ঝাপটানো দেখাল। মুরগির ডাক আর তাদের খেলা দেখে বাদশাহ খুশি হলেন।

ভারতবর্ষের শিল্পী তার সোনার মানুষের মূর্তি দিয়ে ভেরি বাজালো, রোমের পণ্ডিত তার মুরগিকে দিয়ে তার বাচ্চাগুলোকে ঠোকরানো আর পাখা ঝাপটানো দেখাল। বাদশাহ এবার পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, 'ওই যে দূরে তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের গায়ে, ওই তালগাছের একটা পাতা নিয়ে এসো তো, তখন বুঝব তোমার ঘোড়ার দৌড়।'

মুহূর্তে পারস্যের শিল্পী তাই করল। বাদশাহের সামনে একটা তালপাতা এনে রেখে দিল। তারপর বাদশাহ নিজেও ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

বাদশাহ খুব খুশি হয়ে ওদের বললেন, 'বল, তোমরা কে কী চাও।'

তিন জনে সবিনয়ে বলল, 'হুজুর, শুনেছি, আপনার তিনটি কন্যা আছে। আমাদের তিন জনের সাথে আপনার ওই তিন কন্যার বিয়ে দিলে আমরা দারুণ খুশি হব আপনি কি আমাদের খুশি করার প্রতিশ্রুতি রাখবেন?'

বাদশাহের কিছু বলার ছিল না। কথা দিয়েছেন। কথা রাখা তাঁর কর্তব্য। বললেন, 'ঠিক আছে তাই হবে।' কাজিকে ও সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন বাদশাহ। বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

যা-কিছু রাজদরবারে হচ্ছিল বাদশাহের তিন মেয়ে পর্দার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তৃতীয় কন্যার ঘাড়ে তো পড়বে পারস্যের শিল্পী। তার বয়স এক-শো বছরের কম হবে না। তাকে দেখেই ভয়ে রাজকন্যার বুক কেঁপে উঠল। ছোটো রাজকন্যা ভিতরের ঘরে ছুটে গিয়ে মথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল। তিন মেয়ের মধ্য সেই ছিল সুন্দরী। আর তার কপালে পড়ল কিনা এক বুড়ো। যেমন বুড়ো তেমনি তার কদাকার চেহারা।

ছোটো রাজকন্যা যখন কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিল তখন বাদশাহ সাবুরের ছেলে কামর-অল-আকমর শিকার করে ফিরল। বোনের কাঁদার কথা শুনে সোজা তার ঘরে ঢুকে বোনকে জিজ্ঞেস করল, 'বোন, কী হয়েছে বলত? সব খোলাখুলি বল? ওভাবে কাঁদছ কেন?'
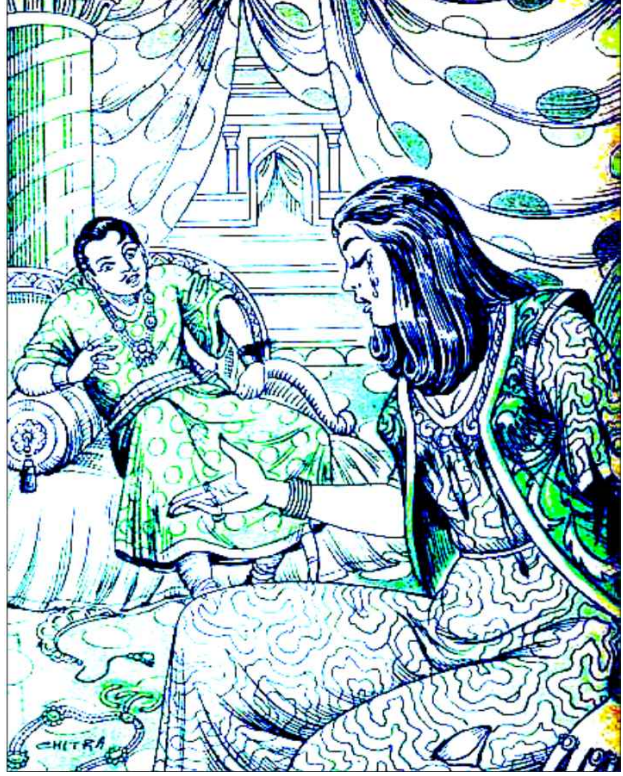
'দাদা, বাবা এক বুড়ো জাদুকরের পাল্লায় পড়ে আমার সাথে তার বিয়ে দিতে চাইছেন। ওই কদাকার বুড়োকে বিয়ে করার চেয়ে মরা ভালো। আমি মরে যাব। আমি বনে চলে যাব। আমি পাগল হয়ে যাব।'

কামর-অল-আকমর বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা, কী হয়েছে আপনার? আর লোক পেলেন না, এক বুড়ো জাদুকরের সাথে আমার ছোটো বোনের বিয়ে দিতে চান? ওই জাদুকরের হাতে বোনকে সঁপে দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চান? জাদুকর আপনাকে কী এমন জিনিস দিয়েছে যে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বাবা, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না বলে দিচ্ছি।'

কামর-অল-আকমর বাদশাহকে যখন এ-কথা বলছিল তখন পারস্যের ওই পণ্ডিত কাছেই ছিল। সে কামরের উপর ভীষণ রেগে গিয়ে মনে মনে কী যেন প্রতিজ্ঞা করল।

বাদশাহ ছেলের কথা শুনে বললেন, 'তুমি অত চোটছ কেন? আগে ওই কাঠের ঘোড়াটাকে দেখ। তারপর জিনিসটার বিচার কর। যে ওই ঘোড়া বানিয়েছে সে যে কত বড়ো গুণী তার বিচার নিজেই করতে পারবে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে ওরে কে আছিস, নিয়ে আয় ওই কাঠের ঘোড়া।'

বাদশাহের অনুচররা কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল। কামর ঘোড়াটাকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কামর এমনিতেই ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসে। 'বা! চমৎকার ঘোড়া তো' বলে সে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। রেকাবে পা ঢুকিয়ে, রেকাব সমেত পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে ঠোক্কর মারতে লাগল। কিন্তু কাঠের ঘোড়া নড়ে না চড়ে না।
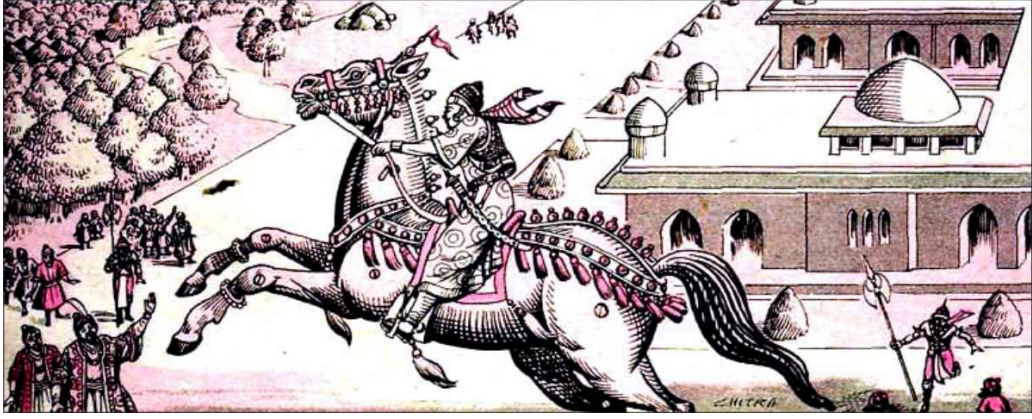
তখন বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, 'ওহে পণ্ডিত, দেখিয়ে দাও কেমন করে চালাতে হয়। ছেলে যে ঘোড়ায় চড়েই পাগল হয়ে গেছে।'

বুড়ো মনে মনে আগে থেকেই চটে ছিল। সে কামরের কাছে গিয়ে বলল, 'জিনের ডান দিকের এই বোতাম টিপলেই ঘোড়াটা উপরে উঠে যাবে।'

পারসি পণ্ডিতের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ ঘোড়াটা আকাশে উঠে গেল। চোখের পলকে কামর সকলের নাগালের বাইরে চলে গেল। অনেক ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু কামরের কোনো পাত্তা নেই।

বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, ছেলে এখনও নাবছে না কেন?'

এতে বুড়ো বলল, 'হুজুর আপনার ছেলের ফেরা অত সহজ হবে না। বাঁ-দিকের বোতাম টিপলে যে নাবতে পারবে তা বলার আগেই আপনার ছেলে ওঠে গেল আকাশে! আপনি জানেন যেকোনো বিষয়ে অর্দ্ধেক জ্ঞান মানেই অনর্থ।'

এ-কথা শুনে বাদশাহের ভীষণ রাগ হল। তিনি বললেন, 'এই কে আছিস, এই বুড়োটাকে আচ্ছা করে চাবুক কষে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখ।'

তারপর তিনি অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শোকে ডুবে রইলেন।

দুই

এমনি করে বাদশা সাবুরের আনন্দ মুখর নওরোজ উৎসব সেবার এক বিষাদে পরিণত হল।

এদিকে কামর-অল-আকমর উপরে উঠছে তো উঠছেই, লাগাম ধরে কত টানাটানি, আগেকার সেই বোতামটা নিয়ে কত নাড়াচাড়া, কিছুতেই কিছু হয় না, উপরে উঠার বেগ শুধু একটু কম বেশি হয়— এই মাত্র। ঘোড়া মেঘের এলাকা ছেড়ে কখন আরও উপরে উঠে গেছে, এবার যে চাঁদ-সূয্যির দেশে হাজির হতে

চলল। কামর-অল-আকমর এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল, যদি নামতে না পারে! বেলা তো এদিকে পড়ে এসেছে, বাড়ি ফিরবে কেমন করে! ভয় পেয়ে যারা ঘাবড়ে যায়, চিন্তাশক্তি লোপ পায়, কামর-অল-আকমর সে দলে পড়ে না। তার হঠাৎ মনে হল, যে কারিগর এর উঠবার কল তৈরি করেছে সেকি আর নামবার ব্যবস্থা করে রাখেনি। রেখেছে নিশ্চয়ই। কামর-অল-আকমর তখন উপরে উঠতে উঠতেই ঘোড়ার গায়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। দেখতে পেল বাঁ-কানের নীচে মোরগের ঝুঁটির মতো কী একটা আছে। সেটায় মোচড় দিতেই ঘোড়া নীচের দিকে নামতে শুরু করল। আনন্দে আকমর বলে উঠল, 'আলহাম্‌ দুলিল্লাহ জয় আল্লা'। তারপর ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকের চাবি ঘুরিয়ে লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উপর-নীচ এদিক-ওদিক চালাল। নিজের ইচ্ছামতো ঘোড়া চালানো অভ্যাস করে নিল। প্রথমে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল সে, তাই নীচে নামতে অনেক সময় লেগে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঘোড়া উড়ে চলেছে কত অজানা-অচেনা দেশের উপর দিয়ে। পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, সবুজ মাঠ পেরিয়ে হঠাৎ দেখল একটি শহর। ঘোড়াটা আরও নীচে নামিয়ে তার উপর পাক খেতে লাগল কামর-অল-আকমর। দেখল শহরের মাঝখানে একটা বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের চারদিকে বেশ উঁচু পাঁচিল, তাতে বসানো রয়েছে নানা ধরনের ভয়ংকর অস্ত্র। আর নীচে প্রায় চল্লিশ জন খোজা পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা। কামর-অল-আকমরের খুব খিদে পেয়েছিল, ভাবল রাতের মতো এই বাড়িতে আশ্রয় নেবে। এত বড়ো বাড়ি যখন, তখন খাবার কিছু মিলবেই।

এই কথা ভেবে সে বাড়িটার উপর কয়েক বার ঘোড়ায় চড়ে চক্কর দিল। তারপর ক্লান্ত পাখির মতো ঘোড়াটাকে নামাল বাড়ির ছাদের উপর। তখন নিশুত রাত, বাড়ির আর কেউ জেগে নেই। কামর-অল-আকমর কান পেতে শুনল কোনো শব্দ শোনা যায় কি না। কিন্তু না মানুষের কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। নামে আর কান পেতে শোনে— না, কোনো শব্দ নেই— শোনা যায় শুধু ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ।

দূরে একটা কামরায় আলো দেখা যাচ্ছিল। ওখানে গেলে যদি খাবার মেলে, এই ভেবে কামর-অল-আকমর পা টিপে টিপে রওনা হল। গিয়ে দেখে সেটা একটা হারেমের কামরা। দরজার সামনে একটা ভীমকায় কদাকার খোজা ঘুমোচ্ছে। দরজায় ঝুলছে মণিমুক্তো ঝালর দেওয়া রেশমি পর্দা। ঘরে বাতি জ্বলছে, চার কোণে চারটি মোমবাতি। খোজার পাশ কাটিয়ে পর্দা সরিয়ে চোরের মতো ঢুকল কামর-অল-আকমর। ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে এক রত্নখচিত হাতির দাঁতের পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে এক অপরূপ রাজকন্যা। মুখখানা তার গোলাপ আর চাঁদকেও হার মানায়। ঘন কাজল দিয়ে আঁকা ধনুকের

মতো দু-টি ভ্রূ, চিবুকে মসিবিন্দুর মতো ছোট্ট একটি তিল। দেখে চোখ ফেরাতে পারে না কামর-অল-আকমর।

বিস্ময়ের ভাব একটু কাটতে না কাটতেই সে দেখল পালঙ্কের চারিদিকে মসৃণ শ্বেতপাথরের মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে চারটি বাঁদি।

কামর-অল-আকমর এই রাজকন্যার সাথে দুটো কথা না বলে আর পারছে না। তাই সে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল পালঙ্কের কাছে। আর রাজকন্যার পোশাকের এক প্রান্ত ধরে সে টান দিল। রাজকন্যা পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ মেলে বলল, 'কে, কে তুমি?'

রাজকন্যা রাগ করে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাগ করা আর তার হল না। কামর-অল-আকমরকে দেখে তার পলক পড়ে না।

আকমর বলল, 'অধীনের নাম কামর-অল-আকমর, পারস্যের বাদশাহের ছেলে আমি, তোমার দাস।'

'কী করে এলে এখানে, এত খোজা আর সান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে?' রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল।

কামর-অল-আকমর বলল, 'খোদা আমায় এখানে পৌঁছে দিয়েছেন, আর দিয়েছে আমার ভাগ্য। আজ রাতের মতো শুধু এখানে একটু আশ্রয় চাই। সারারাত তোমাকে প্রাণ ভরে দেখব, আর ভোর হতে-না-হতেই আমি এখান থেকে চলে যাব।'

এই সুদর্শন যুবককে রাত ভোর হলেই আর দেখতে পাবে না শুনে বুকের মাঝে যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল রাজকন্যার। রাজকন্যা বলল, 'আপনি যে দেশে এসেছেন তার নাম সানা। সানার লোকেরা অসভ্য বা অভদ্র নয়। অতিথি এলে তার উপযুক্ত পরিচর্যা না করে অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় না। সাধারণ লোকেরাই দেয় না, আর আপনি তো রাজবাড়িতে এসেছেন।

'আমার পিতা এখানকার সুলতান, কয়েক দিন অন্তত তাঁর মেয়ে সামসুল নাহারের সেবা না নিয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।'

আকমর খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছিল, রাজকন্যা প্রশ্ন করল, 'আপনি

কি সেই রাজকুমার নন যিনি কাল এসেছিলেন, আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি তো আপনার মতো এত সুদর্শন ছিলেন না! এবং ছিলেন না বলেই বাবা তাঁর সাথে আমার বিয়ে দিতে রাজি হননি। আপনি অবশ্য অনেক বেশি সুন্দর।' রাজকুমারী বিছানা থেকে নেমে রাজকুমারের দিকে এমনভাবে এগিয়ে যেতে লাগল যেন তাকে আলিঙ্গন করবে।

ততক্ষণে দাসীরা উঠে পড়ল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাজকুমারী ইনি কে?'

'ঘুম ভাঙতেই দেখি ইনি আমার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাল যে রাজকুমার এসেছিলেন এঁকে দেখে কি সেই রাজকুমার মনে হয়?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করল।

চার জন দাসী একসাথে বলে উঠল, 'না না ইনি অন্য কেউ। এঁর পাশে ওই রাজকুমার দাঁড়াতেই পারে না। এঁর দাস হওয়ার যোগ্যতাও ওই রাজকুমারের নেই। এমন সুদর্শন যুবক আমরা কোনোদিন দেখিনি।'

তারপর ওই চার জন দাসী ঘুমন্ত নিগ্রোদের কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পরপুরুষকে তোমরা কেন অন্তঃপুরে ঢুকতে দিলে?'

চোখ ছানাবড়া করে নিগ্রোরা উঠে দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করতে গিয়ে দেখে তাদের খাপে তরবারি নেই। ওরা রাজকুমারীর ঘরে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কামরকে জিজ্ঞেস করল, 'ও মশাই আপনি কি মানুষ না শয়তান?'

কামর রাগে গর্জে উঠে তরবারি বের করে বলল, 'তোমাদের এত বড়ো সাহস! এক রাজকুমারকে শয়তান বলছ? আমি এই রাজার জামাই। এই রাজকুমারীর সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার অধিকার আছে অন্তঃপুরে আসার।'

'আজ্ঞে আপনি আমাদের রাজকুমারীর যোগ্য বর।' এই কথা বলে ওরা বাদশাহের কাছে ছুটে গিয়ে মাথার চুল টেনে বুক চাপড়ে বলল, 'জাঁহাপনা আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। রাজকুমারীকে বাঁচান। একটা শয়তান রাজকুমারের রূপ ধরে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে।'

বাদশাহের এত রাগ হল যে বলার নয়। তাঁর ইচ্ছে করল তক্ষুনি নিগ্রোদের মাথা কেটে ফেলেন কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে রাগ দমন করে বললেন, 'পাজি বদমাইশের দল শয়তান যখন অন্দরমহলে ঢুকছিল তখন তোমরা কী করছিলে? তোমাদের আমি রাতদিন পাহারা দেবার জন্য অন্তঃপুরে রেখেছি। তোমরা ঠিকমতো পাহারা দাওনি কেন? কী করছিলে তোমরা?' তারপর বাদশা সোজা রাজকুমারীর ঘরে ঢুকলেন।

দাসীরা রাজকুমারীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। বাদশাহ ওদের বললেন, 'রাজকুমারী কেমন আছে?'

'হুজুর আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কী হয়েছে জানি না। আমাদের ঘুম ভাঙতেই দেখি আমাদের রাজকুমারী এক সুন্দর যুবকের সাথে কথা বলছেন। এত সুন্দর সুদর্শন যুবককে আমরা হুজুর কোনোদিন দেখিনি। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যুবকটিকে। যুবকটি বলল রাজকুমারীর সাথে তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। এ ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না হুজুর। তাকে খুব সৎ ও ভদ্র মনে হচ্ছে হুজুর।

এ-কথা শুনে বাদশাহ কিছুটা যেন ভরসা পেলেন। মেয়ের ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন কামরকে। কামর তার কন্যার সাথে কথা বলছে।

মেয়ে অত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে দেখে বাদশাহের তার উপর রাগ হল। তরবারি টেনে বের করে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। পরক্ষণেই কামর রাজকন্যার কাছে জানতে পারল তরবারি হাতে ঘরে যিনি ঢুকেছেন তিনিই তার বাবা। অগত্যা কামরও নিজের খাপ থেকে তরবারি বের করল। নবাগতের সাহস দেখে বাদশাহ অবাক হলেন। পরমুহূর্তেই তরবারি হাতে কামর বাদশাহের দিকে ধেয়ে গেল। বাদশাহের মনে হল নবাগতের চেয়ে তিনি যেন দুর্বল। বললেন, 'শোনো, তুমি কি মানুষ না শয়তান?'

কামর তরবারি নামিয়ে বলল, 'আপনার এবং আপনার মেয়ের সম্মানার্থে আমি তরবারি নামিয়ে ফেললাম। তা না হলে পারস্যের রাজকুমার কখনো কারও কাছে অপমান সহ্য করে না। এতক্ষণে আপনাকে এবং আপনার রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম, বুঝেছেন?'

এই কথা শুনে বাদশাহ ভয় পেলেন। কামরের সাথে নীচু গলায় কথা বলতে শুরু করে দিলেন। কামরের কাছে গিয়ে বললেন, 'কোনো রাজকুমারের কি বিনা নিমন্ত্রণে আসা উচিত? অন্তঃপুরে ঢোকা উচিত? আমার মেয়ের সাথে এভাবে মেলামেশা করে আমাদের বংশের মুখে কালি দিতে চাইছ। বহু রাজকুমার আমার মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি মত দিইনি। আর তুমি বেমালুম বলে দিলে আমার
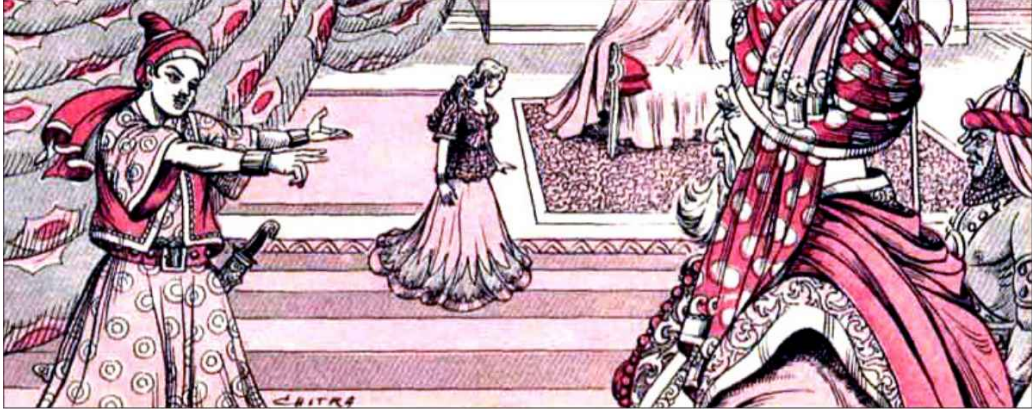
মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? হুকুম পেলেই আমার লোকজন তোমাকে এক্ষুনি কেটে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। কে তোমাকে বাঁচাবে এখানে?'

আপনার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেলাম। আচ্ছা বলতে পারেন, আমার চেয়ে ভালো পাত্র আপনার মেয়ের জন্য জুটবে? আমার চেয়ে সাহসী এবং ধনী পাত্র জোটাতে পারবেন? কামর বলল।

'তোমার কথা হয়তো সত্য। সত্যিই যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাহলে কাজি ছাড়া তো হবে না। তা ছাড়া বংশমর্যাদা অনুযায়ী অনেকগুলো কাজও করতে হবে। ওসব না করে গোপনে আমার মেয়েকে বিয়ে করলে আমার মানসম্মান বলে আর কিছু থাকবে না।' বাদশাহ বললেন।

'ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু এখন যদি আপনি সেপাইদের ডাকেন তাতে কি আপনার এবং আপনার মেয়ের সম্মান থাকবে? থাকবে না। অতএব, যা বলছি তাই করবেন।' কামর বলল।

'বল শোনা যাক।' বাদশাহ বললেন।

'আপনার সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। এক, আমার সাথে যুদ্ধ করা। আর যুদ্ধে হেরে গেলে আমার হাতে আপনার রাজ্য ছেড়ে দেওয়া। আর তা যদি আপনি না চান তবে আজ রাত্রের মতো আমাকে এইখানেই থাকতে দিন। সকাল হলেই আপনার সমস্ত সেনাদের আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার সৈন্য সংখ্যা কত?' কামর প্রশ্ন করল।

'আমার সেনাবাহিনীতে চল্লিশ হাজার সৈন্য আছে। এ ছাড়া আমার গোলাম এবং গোলামের গোলাম ধরলে আরও চল্লিশ হাজার হবে। এই আশি হাজার লোকের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করতে চাও?' বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ তাই করতে চাই। সকালের মধ্যে আপনি সমস্ত সৈন্যকে জড় হতে বলুন। আর আপনি ওদের ভালোভাবে জানিয়ে দিন যে আমি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চাই বলেই আমি একা যুদ্ধ করতে চাই। ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে

পারে তাহলে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। আর যদি না পারে, যদি আমি জিতে যাই, তাহলে প্রচার হয়ে যাবে যে আপনার জামাই এক আসাধারণ পরাক্রমশালী বীর।' কামর বলল।

বাদশাহ বুঝতেই পারলেন না যুবকটির এই ধরনের কথা বলার পিছনে কোনো রহস্য আছে কি না। বাদশা কামরের শর্ত মেনে নিলেন।

তিন

বাদশাহ ভেবেছিলেন সকাল হতে-না-হতেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ওই যুবক মারা যাবে। আর তার মেয়ের নামে কোনো বদনাম রটবে না। অনুচরের মাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে তিনি খবর পাঠালেন। সকালের মধ্যে যেন তাঁর সমস্ত সেনা সাজানো হয়। তারপর বাদশাহ সারারাত কামর-অল-আকমরের সঙ্গে নানা কথা বলে কাটালেন।

সকাল হল। বাদশাহ কামরের জন্য ঘোড়াশালা থেকে একটা ভালো ঘোড়া আনতে বললেন সেপাইকে।

এ-কথা শুনে কামর বলল, 'আমি যে ঘোড়ায় চড়ে আপনার রাজ্যে এসেছি সেই ঘোড়াই আমার যথেষ্ট। অন্য কোনো ঘোড়ার দরকার নেই।'

'ভালো কথা, তোমার যেমন ইচ্ছা।' বাদশাহ বললেন।

বাদশাহের সেনাবাহিনী সেজে দাঁড়িয়ে ছিল রণক্ষেত্রে।

বাদশাহ নিজের সেনাবাহিনীকে বললেন, 'হে সৈনিকগণ, এই যুবক আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশে এসেছে। এই যুবক দেখতে যেমন সুন্দর সাহসও রাখে তেমনি। এ বলে কিনা আমার সমস্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একাই লড়তে পারবে। সে নাকি লাখ লাখ সেনার বিরুদ্ধেও একাই লড়তে পারবে। এখন, ও যখন তোমাদের উপর হামলা করতে আসবে আমি আশা করব তোমরা সহজেই তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করতে পারবে। তার দম্ভ চূর্ণ করতে পারবে। সতর্ক হও, যুদ্ধে জয়ী হও।'

তারপর বাদশাহ কামরকে বললেন, 'বাবা, তুমি সাহসের সঙ্গে লড়াই করে নিজের শক্তির পরিচয় দেবে। আমার সেনাবাহিনীকে দেখেই পালিয়ে যেয়ো না যেন। এ তোমার সম্মানের প্রশ্ন। তোমার সম্মান যেন ধুলোয় মিশে না যায়।'

সতর্ক কামর বাদশাহকে বলল, 'হুজুর, আপনি কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করছেন। আমি পায়ে হেঁটে এতগুলো ঘোড়সওয়ারের বিরুদ্ধে লড়ব কী করে?'

আমি তো তোমাকে ঘোড়া দিতে চেয়েছিলাম। তুমিই তো নিতে চাইলে না। এখনও আমি দিতে প্রস্তুত। যে ঘোড়া চাইবে সেই ঘোড়াই তোমাকে দেব।' বাদশাহ বললেন।
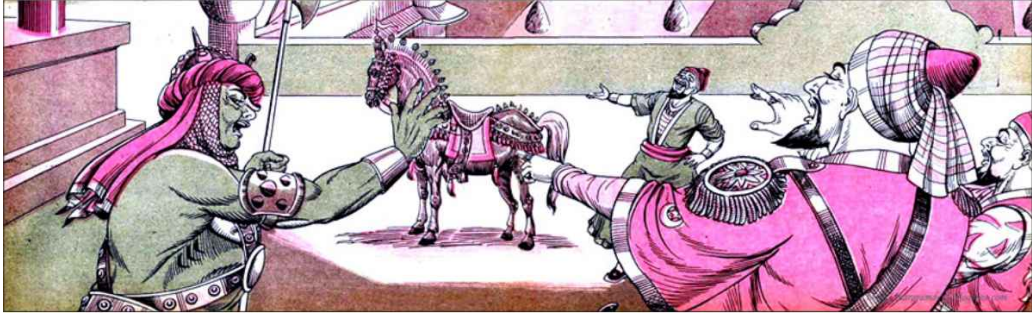
'থাক, আপনার কোনো ঘোড়াই আমার দরকার নেই। আমি যে ঘোড়ায় চড়ে আপনার দেশে এসেছি, সেই ঘোড়াই আমার যথেষ্ট।' কামর জবাবে বলল।

'তোমার সেই ঘোড়া কোথায় আছে বল। আনিয়ে দিচ্ছি।' বাদশাহ বললেন।

'আপনার প্রাসাদের ছাদে আছে।' কামর বলল।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন, 'আমার প্রাসাদের ছাদে! ছাদে ঘোড়া থাকবে কী করে, বাবা। না, তোমার দেখছি মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। তুমি যা বলছ তাতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে তোমার মাথার ঠিক নেই। যাই হোক আমি ছাদে লোক পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি তোমার কথা সত্য কি না।' বাদশাহ এ-কথা বলে সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ছাদে গিয়ে কোনো কিছু দেখতে পেলে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে এসো।'

কামরের কথা সেনাবাহিনীর লোক শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'ঘোড়া প্রাসাদের এত সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠল কী করে। তা কি কখনো সম্ভব।'

ইতিমধ্যে বাদশাহের সেনাপতি ছাদে উঠে ওই কাঠের ঘোড়াটাকে দেখল। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল। কী সুন্দর। হাতির দাঁতের কাজ করা আছে। এই ধরনের ঘোড়া সে আগে কখনো দেখেনি। সেনাপতি ও তার সঙ্গীরা ওই ঘোড়া দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এটাই কি ওই যুবকের ঘোড়া? এই দিয়ে সে যুদ্ধ করবে! ব্যাটা নির্ঘাত পাগল। তবু আসল ব্যাপারটা যে কী তা যতক্ষণ না জানতে পারছি ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চল, এটাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক।'

ওরা কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে বাদশাহের সামনে রাখল। বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই তোমার ঘোড়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ঘোড়ার যে ক্ষমতা কতখানি আমি তা আপনাকে দেখাব।' কামর বলল।

'তাহলে দেখাও।' বাদশাহ বললেন।

'এই সেপাইরা সরে গেলে আমি ঘোড়ায় চড়ব।' কামর বলল।

বাদশাহ সেনাদের যেতে বললেন।

'হুজুর, আপনি লক্ষ রাখুন। আমি আপনার সেপাইদের উপর কীভাবে আক্রমণ করছি। কীভাবে তাদের ছড়িয়ে সরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে দেখবেন সব।' কামর বলল।

'তোমার যা ইচ্ছে করবে। সেনাদের প্রতি তোমাকে কোনোরকম দয়া দেখাতে হবে না আর সেনারাও তোমার প্রতি কোনোরকম দয়া দেখাবে না।' বাদশাহ বললেন।

তৎক্ষণাৎ কামর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। সেনারা ভেবেছিল কামর যখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন তারা আক্রমণ করবে। বল্লম দিয়ে তাকে গেঁথে মাটিতে শুইয়ে দেবে। কিছু সেনা ভাবল এমন সুন্দর যুবককে মারব কী করে! বাকি সেনারা ভাবল যুবকটি নিশ্চয় পাগল। ওর মাথায় খেয়াল চেপেছে জিতে যাবে। ব্যাস, যুদ্ধ করতে চায়। পাগলের খেয়াল!

ঘোড়ায় চড়ে কামর কল টিপল। ঘোড়াটা একটু সামনের দিকে গেল। পরক্ষণে পিছিয়ে লাফাতে লাগল। তারপর উঠে গেল আকাশে। বিরক্ত হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বাদশাহ সেনাদের বললেন, 'আরে বোকার দল! হাঁ করে দেখছ কী। ব্যাটা পালাচ্ছে আর তোমরা ধাওয়া করছ না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছ।'

'হুজুর, উড়ন্ত পাখিকে কে ধরতে পারে। একে দেখে মনে হচ্ছে হয় তান্ত্রিক, না হয় ভূত বা পিশাচ। এখান থেকে পালিয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আল্লার আশীর্বাদে আমাদের কারও কোনো ক্ষতি হল না। যা ঘটে গেল তাতে তো হুজুর আপনার খুশি হওয়া উচিত।' মন্ত্রীরা বাদশাহকে ভালো করে বুঝিয়ে বলল।

বাদশাহ একেবারে বিস্মিত হলেন। অন্দরমহলে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার মেয়েকে জানালেন। যাকে সে ভালোবাসে তাঁর চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বাদশাহের মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বাদশাহ তাকে বোঝাতে বোঝাতে বললেন, 'কাঁদছ কেন মা। ও নিশ্চয় কোনো জাদুকর, নিশ্চয় খারাপ মতলব ছিল তার, চলে যাওয়াতে তো আমাদের ভালোই হয়েছে। এতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। খুশি হওয়া উচিত তোমার।'

মেয়েকে বোঝাতে কত চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হল না। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওকে যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ আমি কিচ্ছু খাব না।'

বাদশাহ মেয়ের দুঃখ দূর করা দূরে থাক নিজেই মেয়ের অবস্থা দেখে দুঃখে ভেঙে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

এদিকে কামর ওই কাঠের ঘোড়ায় করে নিজের দেশে ফিরে এল। ওই রাজকুমারীর সাথে দেখা করার ইচ্ছা তারও মনে জাগতে লাগল। ইতিমধ্যে সে
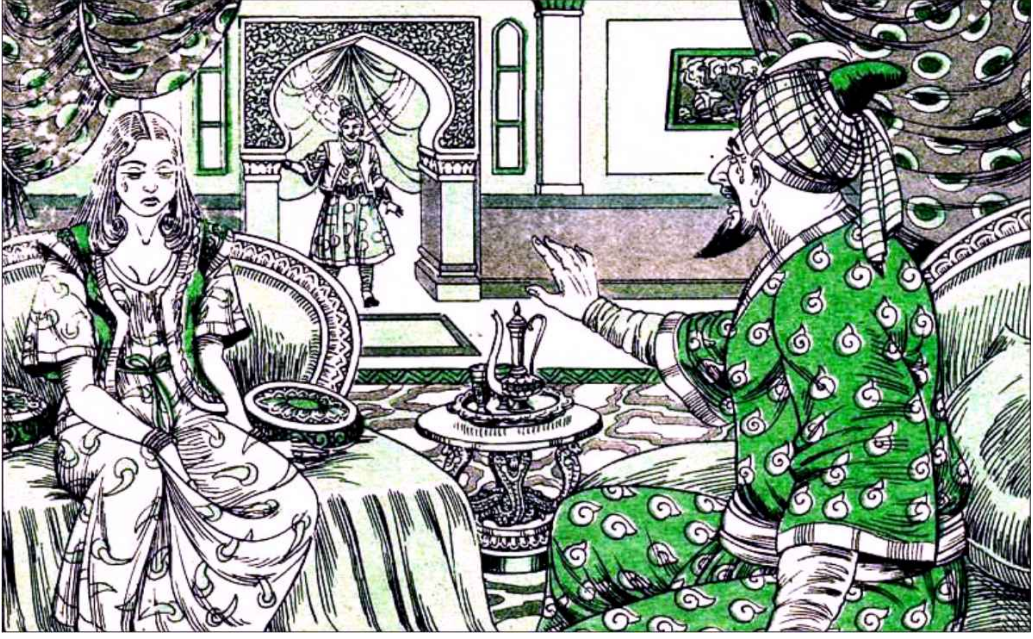
জানতে পারল ওই দেশের নাম। নাম তার যমন আর রাজধানী যে নগরে ছিল তার নাম সানা। কিন্তু আবার সেই নগরে যাবে কী করে। কীভাবে যাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে।

কাঠের ঘোড়া তীব্র গতিতে যাওয়ার ফলে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের দেশ পারস্যে ফিরতে পারল। সিরাজ নগরের চারদিকে উপর থেকে ঘুরে কামর নাবল একেবারে প্রাসাদের ছাদে। ছাদেই ঘোড়াটাকে রেখে মহলে ঢুকল কামর। লক্ষ করল যত্রতত্র ছাই ছড়ানো আছে। কামর ভাবল নিশ্চয় কেউ মারা গেছে। বাবার ঘরে এসে দেখল বাবা আর বোনেরা কান্নাকাটি করছে।

কামরকে দেখেই বাদশাহ আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হওয়ার পর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সবার কান্না যখন থামল তখন কামরকে তারা নানা ধরনের প্রশ্ন করল। কোথায় ছিল, কীভাবে ছিল ইত্যাদি।

সমস্ত কথা শুনে বাদশাহ সাবুর আল্লার অশেষ কৃপার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। সাতদিন ধরে সমস্ত দেশবাসীকে নিমন্ত্রণ করা হল। পুরস্কার বণ্টন করা হল। কয়েদিদের মুক্তি দেওয়া হল। সমস্ত দেশবাসীকে জানাবার জন্য বাদশাহ ছেলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কামর বাপকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, এই বিচিত্র ঘোড়া যে বৃদ্ধ শিল্পী তৈরি করেছে সে কোথায়?'

'ওর কথা চিন্তা করাই পাপ। কোন কুক্ষণে যে ওকে দেখেছি কে জানে। ওর জন্যই আমি তোমাকে হারালাম। অন্য সমস্ত কয়েদিদের তো ছেড়ে দিয়েছি।

তবে, তাকে ছাড়া হয়নি। ওকে রাখা হয়েছ এক অন্ধকার কক্ষে।' বাদশাহ সাবুর বললেন।

কামরের অনুরোধে বাদশাহ পারস্যের ওই পণ্ডিতকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দিলেন। ভালো পোশাক পরিয়ে, উপহার দিয়ে তাকে বিদায় করা হল। তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে বাদশাহ কোনোক্রমেই রাজি হলেন না। বাদশাহ ছেলেকে ওই ঘোড়ায় চড়তে বলাই অনুচিত হয়েছে ভাবলেন। এখন ছেলে কোন কল টিপলে ঘোড়া উড়বে আর কোন কল টিপলে থেমে যাবে সব জেনে গেছে।

ওই ঘোড়া বাদশাহের হয়েছে এক আপদ। ছেলেকে বললেন, 'বাবা, আর কোনোদিন ওই সর্বনেশে ঘোড়ায় তুমি চড়ো না। ওই ঘোড়ায় কোথায় যে কোন কলকাঠি আছে তা তোমার হয়তো জানা নেই। কখন যে কোন কল ঝট করে টিপে দেবে আর কোন বিপদ ঘটে যাবে তা বলা যায় না।'

কিন্তু কামর-অল-আকমরের পক্ষে বাপের এই উপদেশ পালন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, মুহূর্তের জন্যও সে সানা নগরের কথা ভুলতে পারেনি। পারস্যের আনাচেকানাচে উৎসব হচ্ছিল কামর ফিরে আসার আনন্দে আর কামর ভাবছিল সানা নগরের বাদশাহের কন্যার কথা। কোন এক গীতিকার মধুর স্বরে বিরহের গান গাইছিল। ওই গানে কানে যেতেই কামরের মন তোলপাড় করে উঠল। কামর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। সোজা ওই কাঠের ঘোড়ায় চড়ে কল টিপে দিল। পরক্ষণেই ঘোড়া পাখির মতো আকাশের বুকে উড়তে লাগল।

পরের দিন সকালে উঠে বাদশাহ কামরের খোঁজ পেলেন না। রাজমহলের ছাদে ঘোড়াও ছিল না। বাদশাহ আবার অনুশোচনায় অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। বার বার মনে মনে বলতে লাগলেন, কেন যে ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম না। ঠিক করলেন, এবার হাতের কাছে ঘোড়াটাকে পেলে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দেবেন। ভাবতে ভাবতে বাদশাহ আবার দুঃখের অতল সাগরে ডুবে গেলেন।
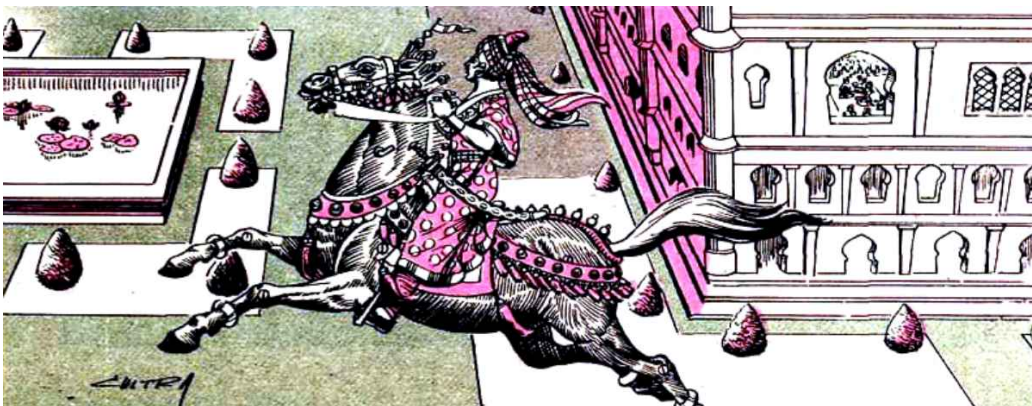
চার

কামর-অল-আকমর দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে এল সানা নগরে। রাজপ্রাসাদে নেমে চেনা পথে হাঁটার মতো হেঁটে রাজকুমারীর শোওয়ার ঘরে ঢুকল।

পাহারাদার যথারীতি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। দাস-দাসীরা রাজকুমারীর চার দিকে ছড়িয়ে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।
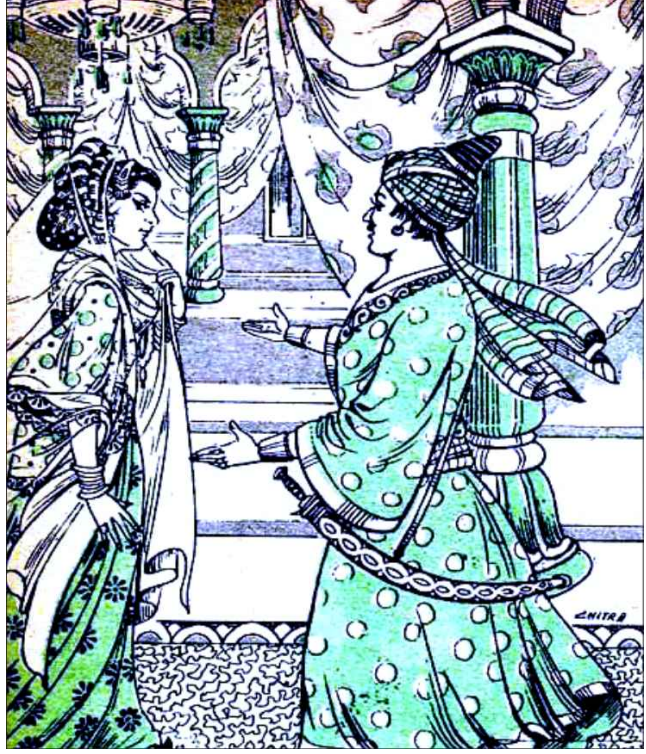
তারপর পর্দা সরিয়ে কামর লক্ষ করল তার প্রেয়সী কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তার সাথীরা রাজকুমারীকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। প্রেমিক তাকে হয়তো ভুলে গেছে বলে জানাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারী দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার প্রেমিক, আমার কামর আমাকে কোনোদিন কোনোক্রমেই ভুলতে পারে না। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তোমরা আর আমাকে ও-কথা বলো না।' শুনে আনন্দে কামর-অল-আকমরের দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। নাহার এমনভাবে নিজেকে আর কোনোদিন প্রকাশ করেনি।

কামর ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রেয়সীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত কাঁদছ কেন? কেঁদো না লক্ষ্মীটি।' রাজকুমারী তাড়াতাড়ি উঠে কামরকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

রাজকুমার তখনই বলে উঠলেন, 'তাহলে এক কাজ করা যাক, তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমার সাথে আমার দেশে নিয়ে যাব। সেখানে নিয়ে গিয়ে বাবাকে সব কথা জানিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করব। আমি বাবার একমাত্র ছেলে। বাবা আমার কথায় "না" বলবেন না। আর "না" বলবেনই বা কেন, তোমার মতো রত্ন পেলে তিনি মাথায় করে রাখবেন।'

এরপর রাজকুমারীর কান্না একটু থামল। রাজকুমারী বলল, 'বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু তোমায় ছেড়ে থাকতে হলে আমি বাঁচবোই না।'

তাহলে তাই করা যাক, 'তুমি চল আমার সঙ্গে।' রাজকুমার বলল।

‘এত খিদে পেয়েছে যে বলার নয়। আগে কিছু খাই তার পরের কথা পরে।’ কামর বলল। দাসীদের বলে রাজকুমারী খাবার আনাল।

রাজকুমারী বলল, ‘তোমার ঘোড়া তুমি ঠিক চালাতে পারবে? কোনো ভুল হবে না তো?’

‘না গো না, যে শিল্পী ওই ঘোড়া তৈরি করেছে তার চেয়েও ওর অন্ধি-সন্ধি আমি এখন ভালো জানি।’ রাজকুমার জবাবে বলল।

সেই দিন শেষরাতে রাজকুমারী বাবা-মার জন্য দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলল। গভীর প্রেমে অনেক আনন্দের আশা নিয়ে কামর-অল-আকমরের সাথে জাদু-ঘোড়ায় চড়ে আকমরের দেশ পারস্যে রওনা হল।

সারাদিন ঘোড়া চালিয়ে দুপুরের কাছাকাছি রাজকুমার পারস্যের রাজধানী সিরাজে এল। প্রাসাদে আর নিয়ে গেল না রাজকুমারীকে। নিয়ে গেল বাপের এক বাগানবাড়িতে। সামনেই পদ্মভরা দীঘি, আর আশেপাশে ফুলের বাগান। মালী, রাঁধুনি, খোজা প্রহরী সবই আছে সেখানে। ঘোড়াটাও রইল ওখানে, আকমর হাঁটতে হাঁটতে রাজকুমারীকে বলে গেল, ‘বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা আগে বলি, তা ছাড়া তোমার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে তো। একটুও ভয় পেয়ো না তুমি, খোজা প্রহরী আছে। শিগ্‌গিরই সৈন্যসামন্ত নিয়ে শোভাযাত্রা করে বাবা তোমায় নিতে আসবেন। আমি জানি বাবা খুশি হবেন।’

রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামর-অল-আকমর যখন প্রাসাদে এল তখন তাকে দেখে আনন্দের রোল পড়ে গেল। বাদশা সাবুর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মা এসে ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, ‘বাবা, তুই আমাদের ফেলে কোথায় ছিলি!’ বোনেরা ছুটে এসে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল, ‘দাদা এসেছে, দাদা এসেছে!’ বলে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগল।

কামর-অল-আকমর তখন সব ঘটনা বাবাকে খুলে বলে রাজকুমারীর গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করে বলল, ‘বাবা, আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার

অনুমতি পেলে তাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে আসব। তারপর আমার ইচ্ছে আমি তাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করি।'

সব শুনে বাপ আবার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোকে আর যেতে হবে না বাবা! আমিই যাচ্ছি, শোভাযাত্রা করে তাকে আনতে। যে তোকে এত সেবাযত্ন করেছে তুই নিজে না আনলে আমিই তার পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটক পাঠাতাম।'

পিতার নিজেরই এ বিয়েতে মত আছে জেনে কামর-অল-আকমর মহা খুশি।

সাবুর বললেন, 'আমার নিজেরই দেরি সইছে না। আজই তোকে আমি এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।'

সিরাজে তখন উৎসবের ধুম পড়ে গেল। চারিদিকে সাজ সাজ রব। বাদশা উজিরকে ডেকে শোভাযাত্রার আয়োজন করতে হুকুম দিলেন। কনেকে আনবার জন্য সাদা জরির ঢাকনা দেওয়া চতুর্দোলা সাজানো হতে লাগল। রাজপথ আর বাড়িঘর সব ফুল ও আলো দিয়ে সাজানোর আয়োজন চলতে লাগল।

ছেলে ফিরে আসার আনন্দে রাজকারাগারে যত বন্দি ছিল সুলতান তাদের মুক্তি দিলেন।

এদিকে কামর-অল-আকমর বাপকে শোভাযাত্রা নিয়ে ঘোড়ায়, মাকে গোরাবাঁদি আর হাবশি বাঁদিদের নিয়ে তাঞ্জামে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে আগে এক ঘোড়ায় চড়ে বাগানবাড়িতে এল রাজকুমারীকে আগে জানিয়ে দিতে। কিন্তু একি, যে জায়গায় সে কাঠের ঘোড়াটি রেখে গিয়েছিল সেখানে তো সেটা নেই! তবে! বুকটা কেঁপে উঠল তার, তাড়াতাড়ি ছুটল যেখানে রুপোর পালঙ্কে রাজকুমারীকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। কই রাজকুমারী তো সেখানে নেই। ঘোড়া চালানোর কৌশলটাও তো শিখিয়ে দেয়নি সে। তবে?

কোথায়, কোথায় গেল রাজকুমারী, পাগলের মতো একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর এবং বাইরে তাকে খুঁজে বেড়াল। তারপর ছুটে এল দরজার খোজা প্রহরীর সামনে। তাকে জিজ্ঞেস করল রাজকুমার, 'হ্যাঁরে, এর মাঝে বাইরের কেউ ঢুকেছিল এ বাগানে? সত্যি কথা বলবি, নইলে এখনই তোকে খুন করে ফেলব।'

প্রহরী উত্তরে বলল, 'মিথ্যে কথা কেন বলব হুজুর, ঢুকেছিল ওই পারসি কারিগর ওই যে কাঠের ঘোড়া এনেছিল!'

শুনে কামর-অল-আকমরের চোখে অন্ধকার নেমে এল। পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, নিজেকে ঠিক রাখতে খোজার কাঁধে হাত রাখল রাজকুমার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে যে ঘোড়ায় সে এসেছিল সেই ঘোড়ায় চেপে ছুটল।

বাদশা সাবুরের কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাবা, মায়ের দোলা, আপনার শোভাযাত্রা ফিরিয়ে নিয়ে যান, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

ছেলের ওইরকম আলুথালু বেশ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে রাজা উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল বাবা!'

'সেই পারসি দুশমন রাজকুমারীকে নিয়ে তার জাদু-ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছে।' রাজকুমার শোকে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'হায়-আল্লা!' বলে সুলতান মাথায় হাত দিয়ে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাবার জোগাড়। শোভাযাত্রার লোকজন তো থ বনে গেল।

রাজকুমার বলল, 'বাবা, আপনারা সব বাড়ি ফিরে যান, আমি আর বাড়ি যাব না। এখন থেকে দেশে দেশে রাজকুমারীকে খুঁজে বেড়াব। যদি খুঁজে পাই তবে দেশে ফিরব— নইলে...'

ছেলের মুখে এ-কথা শোনার পর রাজার চোখে জল এসে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ছেলের হাত ধরে বললেন, 'অত অস্থির হয়ো না বাবা, রাজকুমারীকে আর পাওয়া যাবে না। তুমি ঘরে ফিরে চল বাবা!'

রাজকুমার বলল, 'না, রাজকুমারীকে ছাড়া আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।' এই কথা বলে রাজকুমার বাবাকে সালাম করে সোজা চলে গেল। রাজপ্রসাদে নেমে এল বিষাদের ছায়া। ঘন অন্ধকার।

পারসি পণ্ডিত ভুলতে পারেনি সেদিনের সেই অপমানের কথা।

কারাগারে বসে প্রত্যেক দিন সে শপথ করছিল মুক্তি পেয়ে একদিন না একদিন সে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

এমন প্রতিশোধ যা বাদশা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তাই সেদিন মুক্ত হয়ে রাজকুমার যে কোথায়, কী কী ঘটেছে আর ঘটছে সব কায়দা করে জেনে নিল। জানতে পারল রাজকুমার তার প্রেমিকাকে রেখেছে একটি বাগানবাড়িতে। সেখান থেকে ঘটা করে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

পারসি তখনই ঢুকে পড়ল বাড়িতে কারণ বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। এখনই রাজা শোভাযাত্রা নিয়ে কনেকে নিয়ে যাবে। বাড়ি প্রায় নিরালা। শ্বেতপাথরের বারান্দার সামনেই ঘোড়াটা রয়েছে।

প্রথম তার কাছে গিয়ে কলকবজাগুলো নাড়াচাড়া করে টিপেটুপে দেখল। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এবার আসল জিনিসের খোঁজ করতে হবে। রাজকন্যা কোন ঘরে আছে। দক্ষিণ দিকের ঘরটা থেকে কস্তুরী আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে মনে হচ্ছে! একটু খস খস ঝুনঝুন আওয়াজ!

বারান্দায় উঠে দক্ষিণের ঘরের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল পারসি। দেখে, রূপের ছটায় ঘর আলো করে রুপোর পালঙ্কে বসে আছে অপরূপ এক কন্যা। জানালার দিকে মুখ করে বসে ছিল রাজকন্যা।

পারসি নত হয়ে নমস্কার করে বলল, 'রাজা আর রাজকুমার আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কে? কে তুমি?' রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল।

'আমি রাজার অনুচর। একমাত্র আমারই উপর হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার?'

'কিন্তু রাজকুমার যে বলে গেলেন রাজা স্বয়ং শোভাযাত্রা করে নিতে আসবেন!' রাজকুমারী সন্দেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল।

'হ্যাঁ শোভাযাত্রাই আসছে, কিন্তু এত দূরে আসতে পারবেন না। সবাই পায়ে হেঁটে আসছেন কিনা, রানির পায়ে ব্যথা। বাদশার মহলের কাছেই একটা বাগানবাড়ি আছে, সেখানে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।' বলল পারসি কারিগর।

'কী করে নিয়ে যাবে?' প্রশ্ন করল রাজকুমারী।

'ওই ঘোড়ায় করে।' পারসি বলল।

'ঘোড়া তো চালাতে জানি নে আমি।' রাজকন্যা বলল।

'আপনি জানেন না, আমি জানি।' বলল পারসি শিল্পী।

'তুমি জানো?' রাজকুমারী প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে।' পারসি কারিগর জবাবে বলল।

সরল বিশ্বাসে পালঙ্ক থেকে নেমে এল রাজকুমারী। পারসি বেশ সমীহ

করে তার হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিজের পিছনে বসাল। আর নিজে সামনে সোজা হয়ে বসল। তারপর নিজের পাগড়ি খুলে আচ্ছা করে বেঁধে দিল রাজকন্যাকে নিজের দেহের সঙ্গে। তারপর পারসি ঘোড়ার ডান দিকের বোতামটা দিল টিপে। সঙ্গেসঙ্গে ঘোড়া তিরের বেগে আকাশে উঠে গেল।

পাঁচ

রাজকুমারী বুঝল যে বুড়োটা তাকে রাজকুমারের কাছে না নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। এত দূরে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! কেন নিয়ে যাচ্ছে! বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কর্তা তোমাকে কী বলেছে? আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে বলেছে? তুমি কি তোমার কর্তার নির্দেশ মতো কাজ করছ?'

বুড়ো হেসে বলল, 'কে আমার কর্তা? কামর? সে তো বদ্ধ পাগল। একটা বালক।'

'নিজের কর্তার সম্বন্ধে এসব কথা বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়?' রাজকুমারী রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'আমি যে কে তা তুমি জানো না বলেই ও কথা বলছ। কামর আমার কর্তা কোনোদিনই ছিল না। হবেও না।' পারসি শিল্পী বলল।

'তুমি যে কে তা আমি জানব কী করে?' রাজকুমারী বলল।

'তোমাকে ধোকা দেবার জন্যই আমি মিথ্যা কথা বলেছি। এই কাঠের ঘোড়াটা আমার। আমিই এটা বানিয়েছি। আমার হাত থেকে জোর করে কামর কেড়ে নিয়েছে। আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার উপর অসহ্য অত্যাচার করেছে। যাই হোক এখন আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার ডেরায়। আমার কোনো কিছুর অভাব নেই। তোমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে রাখব। সোনা আর জহরতে তোমাকে ঢেকে দেব। চল আমার সঙ্গে।'

সামনেই একটা পাহাড়ি নদী। তার আশেপাশে নানা ধরনের ফল ও ফুলের গাছ। এত সুন্দর দৃশ্য দেখে যেন মনে হয় বেহস্তের এক ফালি খসে পড়েছে জমিতে। খিদে পেয়েছিল দু-জনেরই খুব, পারসি গাছ থেকে ফল পেড়ে আনল। রাজকুমারীকে দিল। নিজেও খেল পেট ভরে। কিন্তু রাজকুমারী সে ফল স্পর্শ করল না। বলল, 'আমার খিদে নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আর তা না হলে এ জীবন আমি আর রাখব না।' এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

পারসি তখন রেগে বলে উঠল, 'ওসব ন্যাকামো ছেড়ে দাও, কান্না থামাও আর ফলগুলো খেয়ে নাও। ছেড়ে দেবার জন্যই কি আমি তোমাকে এনেছি? আমার সাথে সুখে ঘর করবে। অনেক দাস-দাসী, সাজপোশাক, ভালো খাবারদাবার সব কিছু পাবে তুমি। তাড়াতাড়ি এখন খেয়ে নাও।'

যতই এসব কথা শুনছে রাজকুমারী ততই তার মন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলগুলি সে স্পর্শও করল না। সরিয়ে রেখে শুধু কাঁদতে লাগল।

ওদের ভাগ্য ভালো। যেখানে ওরা এসে নেবেছিল সেটা তুর্কিস্তানের একটা বন। তুর্কিস্তানের বাদশাহ ঘটনাচক্রে সেদিন শিকারে এসেছিলেন। সাথে তাঁর অনেক লোকজন আর অনেক শিকারি। বাদশাহ একটু দূরে থাকতেই হঠাৎ তাঁর লোকজন শিকারের খোঁজ করতে করতে ওই স্থানে এসে উপস্থিত হল। ওদের দু-জনকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়াল। কী ব্যাপার, এই নির্জন বনের মধ্যে কদর্য চেহারার এক বুড়ো আর স্বর্গের অপ্সরার মতো সুন্দরী একটি মেয়ে। সাথে রয়েছে আবলুস কাঠের ঘোড়া। এরা কোথা থেকে এল এখানে! মেয়েটি কাঁদছেই বা কেন আর বুড়ো তাকে শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, এর কারণ কী?

একজন শিকারি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, 'এ তোমার কে হয়? কাঁদছেই বা কেন?'

পারসি উত্তরে বলল, 'এ আমার খুড়তুতো বোন, আমার স্ত্রী। ও এখন মাংস রুটি খেতে চায়। ফল পেড়ে দিয়েছি তা কিছুতেই খাবে না তাই কাঁদছে। বলুন তো এই বনের মধ্যে আমি এখন রুটি মাংস কোথায় পাব?'

রাজকুমারী অনেক লোকজন দেখে মনে সাহস পেয়ে বলল, 'জনাব, ও আমার কেউ নয়, কোনো সম্বন্ধ নেই ওর সাথে আমার। আমি ওকে কোনোদিন দেখিনি, চিনিও না। ও জাদু-ঘোড়ায় চাপিয়ে আমাকে চুরি করে এনেছে। আমাকে ছেড়ে দিতে বলছি, তাও ছাড়বে না। বলছে আমাকে ও বিয়ে করবে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও জানি না। তাই আমি অজানা আশঙ্কায় কাঁদছি।'

এসব কথা হতে-না-হতেই বাদশাহের আরও লোকজন সেখানে হাজির হল। শিকারিরা তাদের বলল, 'এদের দু-জনকেই বাদশাহের কাছে নিয়ে চল। বাদশাহই বিচার করবেন এদের।'

শিকারিদের মুখে সব শুনে বাদশাহও অনেক প্রশ্ন করলেন পারসিকে।

কিন্তু জবাবে পারসি যা বলল বাদশাহ তার এক বর্ণও বিশ্বাস করলেন না। বরং মেয়েটি যা বলল তাই সত্যি বলে মনে হল। বাদশাহ তখন আদেশ দিলেন বুড়োটাকে বেশ কয়েক ঘা বেত লাগিয়ে কারাগারে নিয়ে যেতে ও ওই ঘোড়াটাকে কোষাগারে রাখতে। বাদশাহের সেপাইরা পারসি বুড়োকে মেরে মেরে আধমরা করে দিল। তারপর তাকে কয়েদ ঘরে ফেলে রাখল। বাদশাহ হুকুম দিলেন ওই সুন্দরী মেয়েটাকে রাজকীয় সম্মানে রাজার প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে যেতে। পরে সব বিচার করা হবে। পারসি দুষমনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পেয়ে রাজকুমারী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঈশ্বর বুঝি এবার মুখ তুলে তাকালেন।

এদিকে কামর-অল-আকমর রাজকুমারীর সন্ধানে ফকিরের বেশে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই লোকদের জিজ্ঞেস করছে, একটা লোককে ঘোড়ায় চড়ে একটা সুন্দর মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেছ কেউ? সবাই বলছে না তারা দেখেনি। আর রাজকুমারের জিজ্ঞাসা ও চালচলন দেখে সবাই ভাবে লোকটা একটা পাগল। কামরের মনে শুধু একটাই চিন্তা। রাজকুমারীকে উদ্ধারের চিন্তা। দিনের পর দিন অবিরাম পথ চলতে লাগল। দেশ থেকে দেশান্তরে রাজকুমারীর খোঁজ করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও খোঁজ পেল না রাজকুমারীর। কামর শেষে এল সানাতে। সেখানেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আবার পথ চলতে শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হল তুর্কিস্তানের সীমায়। সেখানে এক ধর্মশালায় উঠল। সেখানে কয়েক জন ব্যাবসাদার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। শুনল কয়েক জন খাবার খেতে খেতে গল্প করছে। তাদের মধ্যে একজন বলছে, 'কাল টাকা আদায়ের জন্য তুর্কিস্তানে গিয়েছিলাম। ওখানে এক অদ্ভুত খবর শুনলাম। সবারই মুখে এক কথা। কিছুদিন আগে নাকি বাদশাহ গিয়েছিলেন শিকারে। তাঁর লোকজন শিকারের খোঁজে এদিক-ওদিক করতে করতে এক নদীর ধারে গাছতলায় দেখে, এক বুড়ো আর একটি পরীর মতো মেয়ে বসে রয়েছে। মেয়েটি কাঁদছে আর বুড়ো তাকে শাসাচ্ছে। তাদের পাশে ছিল সুন্দর কাঠের এক ঘোড়া। ব্যাপারটা কী বুঝতে না পেরে তারা ঘোড়া সহ দু-জনকেই বাদশাহের কাছে নিয়ে যায়।

কামর নিশ্বাস বন্ধ করে যেন সব কথা শুনল। ওই পর্যন্ত শুনেই কামর বুঝতে পারল এ সেই রাজকুমারী। সে পরদিনই তুর্কিস্তানে যাত্রা করল। সমস্ত দিন হাঁটার পর সে রাজধানীর কাছে গিয়ে হাজির হল। শহরে ঢুকবে এমন সময় এক প্রহরী তাকে বাধা দিল। বলল, 'তুমি যাচ্ছ কোথায়? কী দরকার, কোথা থেকে এলে?'

রাজকুমার বলল, 'আমি বৈদ্য দরবেশ। এসেছি অনেক দূর থেকে। দেশে দেশে ঘুরে বিনা দক্ষিণায় রোগ সারানোই আমার ব্রত। রোগ সারলে খুশি হয়ে যে যা

জোর করে দেয় বাধ্য হয়ে নিয়ে থাকি। আগে রোগ সারানোই আমার কাজ।'

প্রহরীরা রাজকুমারের চেহারা ও কথাবার্তা শুনে বুঝল যে এ একজন খুব বড়ো ঘরের ছেলে। তাই কারাগারে না পাঠিয়ে তাকে নিজেদের কাছেই রাখল। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল।

পরের দিন সকালে দরবারে বাদশাহের সামনে কামর-অল-আকমরকে হাজির করল।
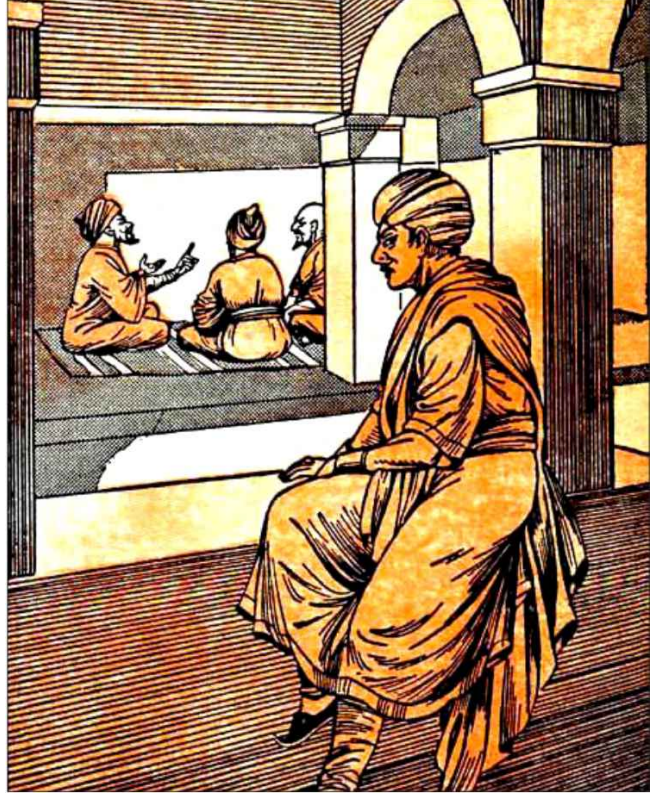
কামর বাদশাহকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। তখন বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি? তোমার দেশ কোথায়? কেন এখানে এসেছ?'

রাজকুমার উত্তরে বলল, 'আমি বৈদ্য দরবেশ। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আর লোকের রোগ সারানোই আমার কাজ। বিশেষভাবে উন্মাদ রোগ, জিন পরীতে পাওয়ার দরুন যারা পাগল, তাদের সারানোর মন্ত্রতন্ত্রও জানি আমি। যত জটিল রোগই হোক না কেন আমি সহজেই সারাতে পারি। রোগ সারানোই আমার জীবনের ব্রত। রুগিকে রোগ মুক্ত করাই আমার মূল লক্ষ্য। আমার দেশ অনেক দূরে। পারস্যে।'

এই সব কথা শুনে বাদশাহ খুব খুশি হলেন। বললেন, 'আমার প্রাসাদে এক রোগিণী আছে। সে কেবল হাসে কাঁদে আর বুক চাপড়ায়। লোক দেখলে তাদের কামড়াতে আসে। তাকে পারবে তুমি ভালো করতে?'

দরবেশ শুনে বলল, 'মনে হচ্ছে পারব। মনে হয় ওকে জিনে পেয়েছে। একবার দেখলে বুঝতে পারব।'

তাহলে এসো আমার সাথে। এই বলে বাদশাহ কামরকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে একেবারে রাজকুমারীর ঘরে। বাদশাহ আর কামরকে দেখেই রাজকুমারী ছুটে এল তাঁদের কামড়াতে। পাগল হলেও কামর দেখেই চিনতে পারল এ সেই রাজকুমারী। তখনই সে বাদশাহকে ইঙ্গিতে বাইরে ডেকে এনে বলল, 'হুজুর, একে আমি ভালো করতে পারব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। একে জিনে ধরেছে।'

বাদশাহ খুব খুশি হয়ে বললেন, 'যদি সারাতে পার তাহলে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। দেখ একটু চেষ্টা করে।'

কামর বলল, 'আজ এই মুহূর্তে আমি ঝাড়ফুঁক করে ওর অর্দ্ধেক রোগ ভালো করে দিচ্ছি। কিন্তু আমার ঝাড়ফুঁক করার সময় আপনি ঘরে থাকবেন না। আমি ছাড়া অন্য কেউ ঘরে থাকলে জিন দেখা দেবে না।'

বাদশাহ বললেন, 'বেশ তাই হবে। আমি কাছে থাকলে তোমার রোগ সারাতে যদি অসুবিধা হয় তবে আমি দূরেই অপেক্ষা করছি। যেকোনোভাবে এই পরমা সুন্দরীকে রোগমুক্ত করে তোল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।'

কামর রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই সে রাজকুমারকে চিৎকার করে কামড়াতে এল। তক্ষুনি রাজকুমার তার হাত ধরল এবং কানে কানে বলল, 'দেখ একবার ভালো করে, কে আমি। আমি তোমার সেই রাজকুমার।'

রাজকুমারী এবার ভালো করে তাকিয়েই চিনতে পারল কামরকে। তার চিৎকার থেমে গেল। দু-চোখ জলে ভরে গেল। বলল, 'তুমি এসেছ? আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।'

রাজকুমার বলল, 'মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু আস্তে কথা বল। যা বলছি তা ঠিক ঠিক ভাবে করে যাও। তাহলে হয়তো পারব তোমায় উদ্ধার করতে।'

'তাড়াতাড়ি বল আমায়, কী করব। আমার আর দেরি সইছে না।' রাজকুমারী তাকে বলল।

'আজ চান করবে ভালো করে, খাওয়া-দাওয়া করবে, চুল বাঁধবে, কাজল পরবে চোখে, ভালো করে সাজবে। তারপর যখন সন্ধ্যায় বাদশাহ আসবেন তখন তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাবে। বাদশাহ দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। আজ যেভাবে বললাম সেভাবে কাজ কর। তারপর যা করতে হবে পরে বলে দেব।' এই বলে কামর বুকে রাজকুমারীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ চেপে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অভ্যাস মতো সন্ধ্যায় বাদশাহ রাজকুমারীকে দেখতে এলেন। দেখে অবাক। সে অনেক বদলে গেছে। আজ আর তাঁকে তাড়া করল না, মারতে এল না, চুল

ছিঁড়ল না। বুক চাপড়েও কাঁদতে বসল না। পরিবর্তে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাল। কুশল জিজ্ঞাসা করল।

বাদশাহ কিছুক্ষণ রাজকুমারীর সাথে কথাবার্তা বললেন। কিন্তু শেষের দিকে রাজকুমারী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকাচ্ছিল আর ভয়ে আঁতকে উঠছিল।

বাদশাহ আর দেরি না করে উঠে পড়লেন। অনেকটা সুস্থ হবে বৈদ্য বলেছিল। বাইরে এসে তিনি বৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন। বৈদ্য এলে তাকে কিছুটা আনন্দ প্রকাশ করে সব কথা বললেন।

শুনে বৈদ্য বলল, 'ঠিক আছে হুজুর। কাল আর একবার ঝাড়ফুঁক করব। পরশু দিন একটা বড়ো ধরনের ব্যাপার করতে হবে। তা ঠিক ভাবে করতে পারলে রোগিণী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে।'

বাদশাহ কামরকে এক-শো মোহর পুরস্কার দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কী জিনিস চাই তোমার বল? আর কী কী করতে হবে বল?'

কামর বলল, 'যেখান থেকে ওকে আনা হয়েছিল, সেখানে নিয়ে যেতে হবে, সাথে থাকবে ওই কাঠের ঘোড়া। কারণ জিনটা ওখানেই এঁকে ধরেছে। তাই ওখানে গিয়েই তাড়াতে হবে। না হলে তাড়ানো যাবে না।'

সেদিন সকালে বৈদ্যের কথানুযায়ী সব জিনিস এসে গেল। বৈদ্যের কথামতো রোগিণীকে নিয়ে যাওয়া হল সেই বনে। চতুর্দোলায় করে রাজকন্যাকে আর ধরাধরি করে কাঠের ঘোড়াটাও নিয়ে যাওয়া হল বনের সেই জায়গায়। প্রকাণ্ড বড়ো একটা কী যেন তিরের মতো আকাশে উড়ে গেল। লোকজন সব চিৎকার করে উঠল, 'ঘোড়া, ঘোড়া।'

বাদশাহ এই ব্যাপার দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। কারণ প্রকাণ্ড জিনিসটা যে হুস করে হাওইয়ের মতো উপরে উঠে গেল তা চট করে বুঝে উঠতে পারেননি। আর এখন বুঝবারও উপায় নেই। কারণ এত উপরে উঠে পাখির মতো ছোটো হয়ে মিলিয়ে গেল যে তা আর দেখাও গেল না।

আর একটু পরেই ফিরবে ভেবে বাদশাহ দুপুর পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা ছিল বৈদ্য রাজকুমারীর রোগ সারাবার জন্যই উপরে উঠে গেছে। আবার ঠিক নাববে। পার্শ্বচরদের কথায় বাদশাহ ফিরে গেলেন প্রাসাদে। সারাদিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু বৈদ্য আর এল না রাজকুমারীকে নিয়ে।

বাদশাহ তখন ভয়ানক রেগে গিয়ে পারসি বুড়োটাকে ডেকে বললেন, 'পাজি বদমাইশ, তুমি কেন আমাকে জানালে না যে ঘোড়াটা উড়তে পারে? জবাব দাও? এই কে আছিস এখানে? এই বুড়োটার গর্দান নে। বাদশাহের নির্দেশে বুড়োর গর্দান নেওয়া হল।

মনের আনন্দে রাজকুমার ঘোড়া ছোটাল। কামর রাজকুমারীকে নিয়ে এল পারস্যের সিরাজ শহরে নিজের বাড়িতে। রাজবাড়িতে আবার আনন্দের ঢেউ। এবার দেরি না করে সাবুর পরের দিনই রাজকুমারের সাথে রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন। এক মাস পর্যন্ত বিয়ের উৎসব চলল।

সাবুর কিন্তু ঘোড়াটা আর রাখেননি। ছেলের বিয়ের পরদিনই ওটা ভেঙে ফেলেছিলেন।

কামর পরের দিনই সানায় একটা চিঠি পাঠাল। সেই চিঠিতে সবিস্তারে সব জানাল। বিশেষ দূতের মাধ্যমে ওই চিঠি পাঠানো হল। আর তার সাথে অনেক উপহারও দূতের হাত দিয়ে পাঠাল তার শ্বশুরের কাছে।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে বাদশাহ সাবুরের মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কামর সিংহাসনে বসল।
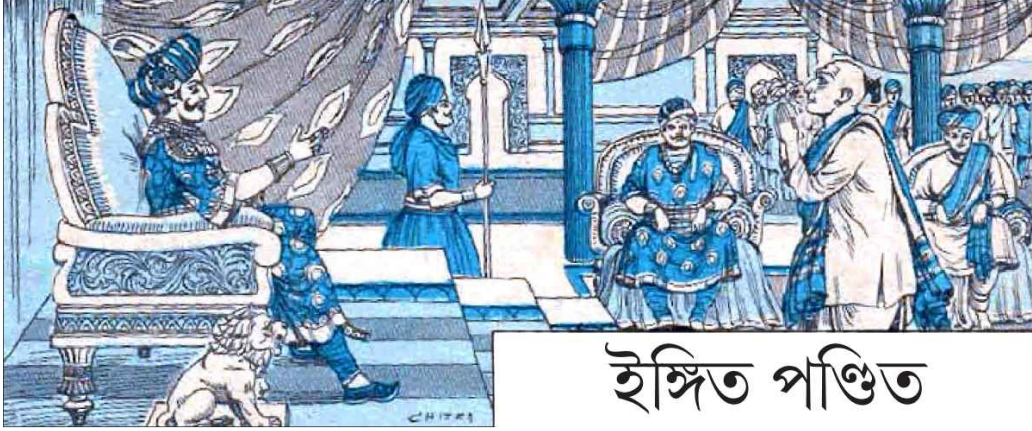
ইঙ্গিত পণ্ডিত

প্রাচীন কালে কাঞ্চিপুরে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে সবাই ইঙ্গিত পণ্ডিত নামে ডাকত। উনি প্রচার করে বেড়াতেন যে মানুষ নিজের মনোভাব শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে প্রকাশ করলে ভালো হত।

একদিন ওই পণ্ডিতমশাই রাজার কাছে গিয়ে এই কথাটি বললেন।

রাজা পণ্ডিতের এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গে তর্ক না করে মনে মনে হেসে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই এই কথা জানাবার জন্যে এত দূর থেকে এলেন। আমি অনেক আগেই ইঙ্গিত বিষয়ক এক শাস্ত্রী মশাইকে শিবগংগপুরের পাঠশালায় নিযুক্ত করেছি।'

রাজার এই ঠাট্টা বুঝতে না পেরে ওই পণ্ডিত কথাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে বললেন, 'মহারাজ আপনি সত্যিই দূরদর্শী। বাচ্চা বয়স থেকেই ইঙ্গিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করালে ফল ভালোই হয়। আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি সেই ইঙ্গিত বিষয়ক শাস্ত্রীমশাইকে দর্শন করে ফিরে আসব।' কথার শেষে রাজাকে প্রণাম করে ইঙ্গিত পণ্ডিত শিবগংগপুরের দিকে চললেন।

দু-তিন দিন যাত্রার পর ইঙ্গিত পণ্ডিত শিবগংগপুরে পৌঁছালেন। সেখানকার পাঠশালার অধিকর্তারা ওই পণ্ডিতকে সাদরে আহ্বান জানালেন। পরে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই আমাদের শাস্ত্রীমশাই যে দেশান্তরে গেছেন। উনি এক মাস পরে ফিরবেন।'

'ভালো কথা। কিন্তু এত দূর এসে তাঁকে দর্শন না করে আমি ফিরে যাই কি করে? শাস্ত্রীমশাই-এর ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থেকে যাই।' ইঙ্গিত পণ্ডিত জবাবে বললেন।

পাঠশালার অধিকর্তারা বুঝল যে পণ্ডিতের হাত থেকে ওরা অত সহজে ছাড়া পাবে না, তাই তারা এক উপায় উদ্ভাবন করল। পাঠশালার এক চাকরের এক চোখ কানা ছিল। অধিকর্তারা ওকে শাস্ত্রীমশাইয়ের পোশাক পরিয়ে বলল, 'ওহে শোনো ওই পণ্ডিত তোমাকে আকারে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করবে, তুমিও সেই প্রশ্নের জবাব ইঙ্গিতে দেবে। কোনোক্রমেই তুমি কিন্তু মুখ খুলবে না।'

তারপর অধিকর্তারা ওই পণ্ডিতকে বলল, 'পণ্ডিতমশাই! আমাদের ইঙ্গিত শাস্ত্রীমশাই দেশান্তর থেকে ফিরে এসেছেন। উনি এখন ওই সামনের ঘরে বসে আছেন। আপনি এখন ওঁর, সাথে দেখা করতে পারেন।'

ইঙ্গিত পণ্ডিত সানন্দে শাস্ত্রীমশাইয়ের সাথে দেখা করতে ওই ঘরে ঢুকলেন। সেখানে দেখলেন একচোখ কানা একটি লোক মাথায় পাগড়ি বেঁধে আর কাঁধে কাশ্মীরি শাল ঝুলিয়ে বসে আছেন।

ইঙ্গিত পণ্ডিত শাস্ত্রীর সামনে গিয়ে বসে তাঁকে একটি আঙুল দেখায়।

প্রত্যুত্তরে ওই কানা লোকটি দু-টি আঙ্গুল দেখায়। তারপর ইঙ্গিত পণ্ডিত তিনটি দেখায়। তাই না দেখে শক্ত করে মুঠো উঁচিয়ে কানা লোকটি দেখায়।

তখন ইঙ্গিত পণ্ডিত হাসতে হাসতে একটি বড়ো কুল দেখাল।

সাথে সাথে পুঁটলি থেকে একটি রুটি বের করে কানা লোকটি দেখাল।

তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে ওই কানা লোকটিকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরের বাইরে অপেক্ষমান পাঠশালার কর্মকর্তারা ওই পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করল, 'পণ্ডিতমশাই, আমাদের ইঙ্গিত বিষয়ক শাস্ত্রীমশাই সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?
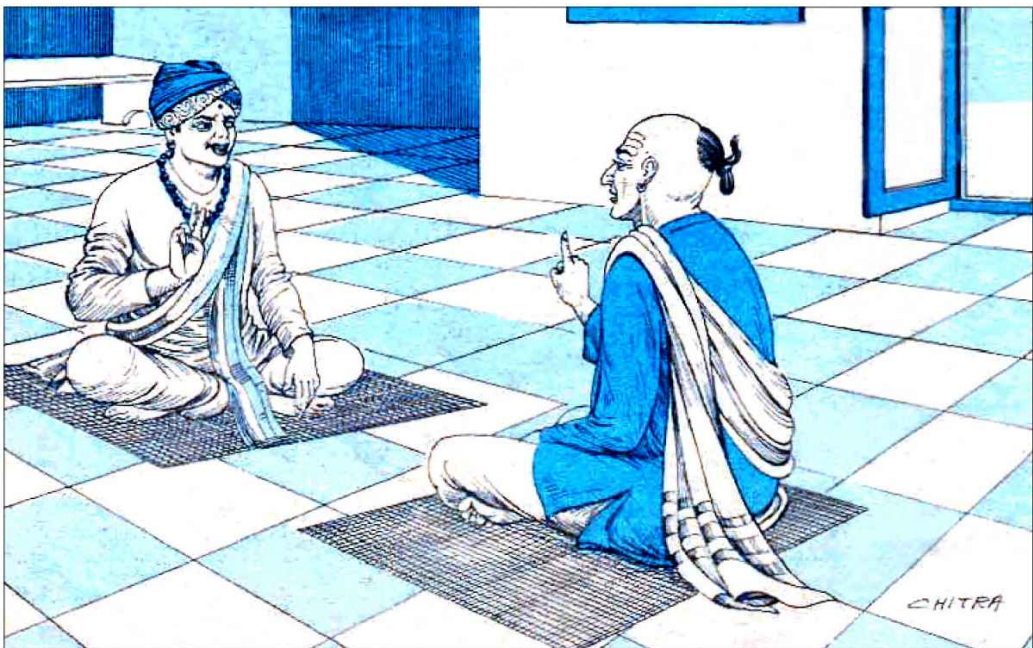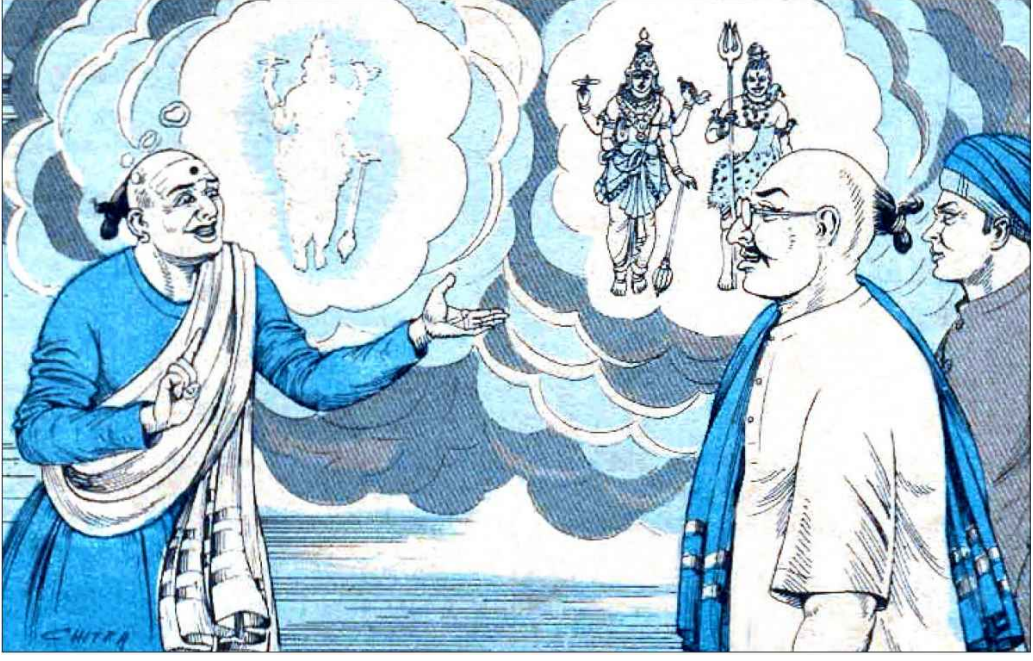
জবাবে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনাদের ইঙ্গিত বিষয়ক শাস্ত্রীমশাই খুব যোগ্য লোক। উনি এক উচ্চস্তরের দার্শনিক। ঈশ্বর যে এক তা বোঝানোর জন্য আমি একটি আঙুল দেখিয়েছিলাম। কিন্তু উনি দু-টি আঙুল দেখালেন, যারা অর্থ হয়, ঈশ্বর এক নয়। শিব এবং কেশব দু-জন। তখন আমি ভাবলাম, তাহলে তো ব্রহ্মাকে জুড়ে দিয়ে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি হয়, তাই না ভেবে আমি তিনটি আঙুল দেখালাম। কিন্তু তিনি মুঠো উঁচিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে ওই তিনে মিলে এক হয়।

'তাই না দেখে আমিও মানব জাতিকে দয়ালু ঈশ্বরের দেয়া অত্যন্ত রুচিকর ফলের মধ্যে বড়ো কুলও যে একটি তা বোঝানোর জন্য বের করে দেখালাম।

কিন্তু উনি তো তত্ত্ববেত্তা তাই নিজের কাছ থেকে একটি রুটি বের করে দেখিয়ে আমাকে এ-কথা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে ভগবানের দেয়া রুটিই সমস্ত মানব কুলের কাছে সবসময়ের আদরের জিনিস। বড়ো কুলের চেয়ে মানুষের শ্রমের ফল এবং অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হল রুটিই। উনি যে ইঙ্গিতে এই বিশেষ অর্থ আমাকে বোঝাতে চাইলেন আমি তো বুঝতে পেরেছি।'

ইঙ্গিত পণ্ডিত এই কথাগুলো বলে খুশি খুশি মনে চলে গেলেন।

তারপর পাঠশালার কর্মকর্তারা কানা চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, ওই পণ্ডিতমশাই তোমাকে ইঙ্গিতে কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

কানা জবাবে বলল, 'বাবু ওই পণ্ডিতমশাই বড়ো চালাক। ঘরে ঢুকেই আমাকে উপহাস করে একটি আঙুল দেখিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইলেন, তুমি তো একচোখ দিয়েই দেখতে পাও।'

এতে কিন্তু আমি চটিনি, আমি বরং দু-টি আঙুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, তোমার দুটো চোখের চেয়ে আমার একটা চোখ অনেক ভালো।

'এতেও কিন্তু পণ্ডিতমশাই দমলেন না। উনি আবার আমাকে তিনটি আঙুল দেখালেন, তার মানে আমার এক চোখ ওনার দু-চোখ সব মিলে তিন চোখ হয়।

'তখন আমার ভীষণ রাগ হল। আমিও মুঠো দেখিয়ে বলতে চাইলাম ফের যদি তিন আঙুল দেখাও তো এই মুঠো দিয়ে তোমার নাক ফাটিয়ে দেব।

'তাই না দেখে পণ্ডিত বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে একটা বড়ো কুল বের করে আমাকে ঘুস দিতে চাইল।

'আমি ওর ঘুসের লোভে পড়িনি বরং নিজের পুঁটলি থেকে রুটি বের করে তাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে ওই ফলে আমার দরকার নেই। আমার রুটির কাছে তোমার ফল তুচ্ছ।'

পাঠশালার কর্মকর্তারা পণ্ডিত আর কানার ব্যাখ্যা শুনে হেসে খুন। আর সমস্ত খবর শুনে রাজার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল।

আসল লক্ষ্মী

প্রাচীন কালে উজ্জয়িনী নগরের রাজা ছিলেন ধীমন্ত। সমস্ত ভালো গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

একদিন এক যোগী রাজার কাছে এল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই তোমার?'

'মহারাজ, আমার কাছে একটা লোহার ঘটি এবং লাঠি আছে। আপনার কাছে এই দুটো বিক্রি করতে এসেছি।' যোগী বলল।

'কততে বিক্রি করবে?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'এই দুটো নিয়ে আমাকে এক লক্ষ টাকা দিন।' যোগী বলল।

রাজা আগে-পিছু ভালো-মন্দ না ভেবে, মন্ত্রীদের বারণ না শুনে যোগীকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ওই দুটো জিনিস কিনে নিল।

সেই রাত্রেই ঘুমোতে না ঘুমোতেই রাজা একটি স্বপ্ন দেখল এক মহিলা সমস্ত আভরণ ধারণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে চলে যাচ্ছে।

'কে তুমি?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'আমি ধনলক্ষ্মী।' মহিলা বলল।

'চলে যাচ্ছ কেন?' রাজার প্রশ্ন।

'লক্ষ টাকা দিয়ে যোগীর কাছ থেকে একটা লোহার ঘটি আর লাঠি কিনে আমাকে অপমান করলে কেন? আমি আর এক মুহূর্ত তোমার ঘরে থাকব না।' ধনলক্ষ্মী বলল।

'ঠিক আছে যাও।' রাজা নির্বিকার ভাবে বলল।

পরের দিন রাজা স্বপ্নে দেখল বেশ লম্বা-চওড়া এক মহিলা তার প্রাসাদ থেকে চলে যাচ্ছে।

'কে তুমি?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'আমি শক্তিলক্ষ্মী।' মহিলা বলল।

'চলে যাচ্ছ কেন?' রাজার প্রশ্ন।

'তোমাকে ধনলক্ষ্মী ছেড়েছে। এরপর তুমি আর কতদিন আমাকে রাখতে পারবে? তাই চলে যাচ্ছি। আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না।' শক্তিলক্ষ্মী বলল।

'যাও।' রাজা নিশ্চিন্তে বলল।

তৃতীয় রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখতে পেল এক বৃদ্ধা চলে যাচ্ছে। তার মুখে উজ্জ্বল দীপ্তি।

'কে তুমি?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'আমি জ্ঞান লক্ষ্মী।' বৃদ্ধা বলল।

'চলে যাচ্ছ কেন?' রাজার প্রশ্ন।

'ধনলক্ষ্মী আর শক্তিলক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর আমার এখানে থাকার কি মানে হয়? আমি চলে যাচ্ছি।' জ্ঞানলক্ষ্মী বলল।

'যাবে বই কী, যাও।' রাজা বিনা দ্বিধায় বলল।

চতুর্থ রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখল, এক দেবীপ্রতিম মহিলা চলে যাচ্ছে।

'কে তুমি?' রাজা জানতে চাইল।

'আমি ধৈর্যলক্ষ্মী।' মহিলা বলল।

রাজা তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছে কেন?'

'সবাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি থেকে কী করব?' বলল ধৈর্যলক্ষ্মী।

রাজা ঝট করে তার হাত ধরে বলল, 'না তুমি যেতে পারবে না। তোমাকে যেতে দেব না। শুধু তুমি আছ বলে আমি অন্য সব লক্ষ্মীদের যেতে দিয়েছি। গ্রাহ্যই করিনি। শুধু তুমি থাকলেই আমার আর ভয় নেই।

ধৈর্যলক্ষ্মী হেসে বলল, 'ঠিক আছে আমি তাহলে তোমার কাছেই থেকে যাচ্ছি।' রাজা সানন্দে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে সকালে উঠল।

জয় আমাদের

আরব দেশের একটি গ্রামে আলিমহম্মদ নামে একটি লোক ছিল। সে ছিল ফকির। কারও সাতে-পাঁচে থাকত না। কারও সাথে ঝগড়া নেই বিবাদ নেই! কখনো কাউকে খারাপ বলত না। সবাই এইজন্যই অমায়িক লোক বলেই জানে।

একদিন ওর বন্ধুরা বলল ভূত আছে। ও বলল ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। কিন্তু ওরা বলল পশ্চিমের পাহাড়ে বহু ভূতপ্রেত আছে। ওই পাহাড়ের বেলগাছে ভূত ভরতি।

'ওসব ডাহা মিথ্যা।' আলি বলল।

'বললেই হল নাকি? অমাবস্যার রাত্রে ওই গাছের নীচে কাটাতে পার?' আলির বন্ধুরা বলল।

'পারি। আমার কোনো ভয় নেই।' আলি বলল।

'তাহলে কালকেই অমাবস্যা। কাল রাতদুপুরে গাঢ় অন্ধকারে পাহাড়ের ওই গাছের নীচে বসে থাকো দেখি। তা যদি বসতে পার তোমাকে ভালো করে খাইয়ে দেবো। আর যদি না পার আমাদের সবাইকে খাওয়াতে হবে।' আলির বন্ধুরা বলল।

পরের দিন সন্ধ্যায় খচ্চরের উপর চড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল তিন বন্ধু মিলে। রাত হতেই আলিকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়ে চলে এল দু-জন। ফেরার আগে ওরা আলিকে বলল, 'যেই কথা সেই কাজ। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যেতে আসব। ততক্ষণ তুমি বেঁচে থাকলে আমাদের দেখা পাবে। রাজি তো? তাহলে আসি।' ওরা ফিরে এল গ্রামে।
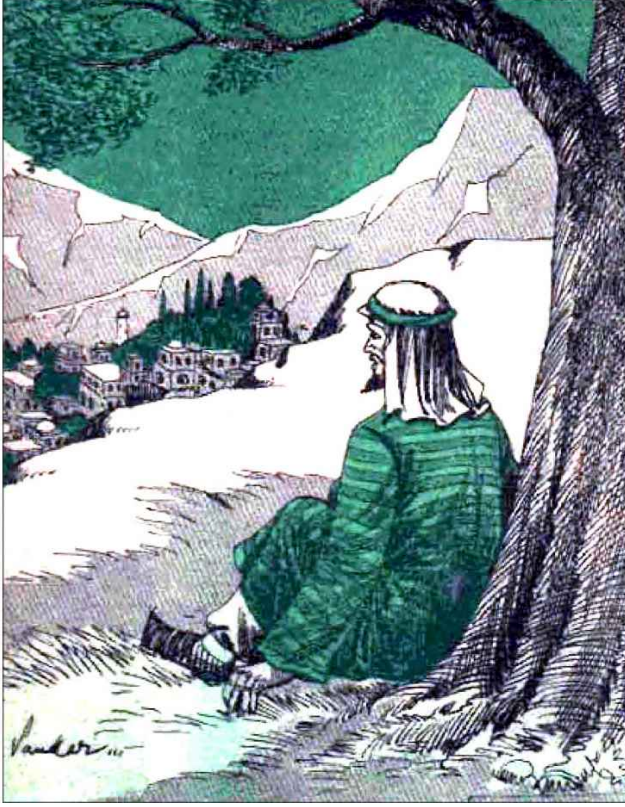
ওদের গ্রামে ফিরতে রাত হল। কিছু বাড়িতে বাতি জ্বলছে। শীত পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন শিশির পড়ছে।

আলির খুব শীত করছিল। খিদেও পেয়েছিল খুব।

'শীতের ভয় আর ক্ষুধার ভয়ের চেয়ে ভূতের ভয় কি বেশি? সকাল হোক না, ওদের ধরে তিন জনের খাবার আমি একাই খাব।' আলি মনে মনে বলল।

রাত যত শেষ হয়ে আসছে বাড়ির আলোগুলো নিভে যাচ্ছে নজরে পড়ল। একে একে গ্রামের বহু বাড়ির আলো নিভে গেলেও একটি কোঠা বাড়ির আলো জ্বলছিল। আলি দেখল। আলি ভাবতে লাগল ওই বাড়িতে কী হচ্ছে? কেন আলো জ্বলছে। কারা আছে? না-জানি কেন ওই বাড়ির আলো সকালেও জ্বলছিল। ওই আলোর কথা ওই বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে আলি শীতের কথা ভুলে গেল। খিদের কথাও মনে ছিল না।

সকাল হল। আলির বন্ধুরা খচ্চরে চড়ে আলির কাছে এল।

'ভীষণ খিদে পেয়েছে! বাজি জিতেছি। এবার ঝটপট খাওয়াও দেখি।' বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি যদি ঠিকমতো রাত এখানেই কাটিয়ে থাকো তবেই তো আমরা হেরে যাব? তা যদি না হয়ে থাকে তোমাকেই হেরে যেতে হবে।' আলির বন্ধুরা বলল।

'সেকি সারারাত এই গাছের নীচে বসে অন্ধকারে কাটালাম, আবার কী?' আলি বলল।

'ঠিক করে ভেবে বল। সকাল হওয়ার পরেও কি তুমি গাঢ় অন্ধকারে ছিলে?' বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল।

'তবে কি আমি আলো নিয়ে বসে আছি?' আলি বলল।

'তোমার কাছে আলো না থাকলেই-বা। গত রাত্রে গ্রামের একটি কোঠা বাড়িতে সকাল পর্যন্ত মোমবাতি জ্বলছিল, জানতে পেরেছি। সেই আলো তুমি দেখতে পাওনি তো?' আলির বন্ধুরা বলল।

আলি অবাক হয়ে বলল, ‘তোমরা ঠিক বলেছ। আলো জ্বলছিল বটে।’

‘তবে আর কী! তুমি হেরে গেলে। এখন আমাদের দু-জনকে খাওয়াতে হবে।’ বন্ধুরা বলল। ওরা আরও বলল, তুমি আলো দেখেছ, ওই আলোর উত্তাপ পেয়েছ।

‘অত দূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে, আমি হেরে গেলাম? বারে, এ তো অদ্ভুত কথা!’ আলি বলল।

‘দূরেই হোক আর কাছেই হোক দেখতে তো পেয়েছ? আর আলো যখন দেখেছ, তুমি বলতে পার না যে তুমি অন্ধকারে ছিলে?’ বন্ধুরা বলল।

ওকে এভাবে ঠকানোর জন্যই, আলি ভাবল, ওর বন্ধুরা ওই বাড়িতে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আলি বলল, ‘ঠিক আছে আমি হেরে গেছি। আমি তোমাদের খাওয়াব। আজ দুপুরে তোমরা আমার বাড়িতে এসো, ভর পেট খাওয়াব।’

আলি অমায়িক। অতএব একবার যখন খাওয়াব বলেছে, নিশ্চয়ই খাওয়াবে। বন্ধুরা দুপুরে পেট পুরে খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এল।

আলি বন্ধুদের সাদরে ডেকে বসিয়ে গল্পগুজব করতে লাগল।

অনেকক্ষণ গল্প করার পর বন্ধুরা আলিকে জিজ্ঞেস করল, ‘কি হল এখনও রান্না হয়নি?’

আলি ঝট করে উঠে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বলল, ‘এখনও হয়নি।’

আবার কিছুক্ষণ কথার পর আলি নিজেই উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বলল, ‘রান্না হচ্ছে।’

খিদের জ্বালায় আলির বন্ধুরা ছটফট করতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। আলি মাঝে মাঝে ঘুরে আসে আর বলে, হয়ে এল। রান্না হচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণে যে রান্না হবে তা আর আলি বলছে না।

শেষে আলির এক বন্ধু বলল, ‘এত যখন দেরি হচ্ছে, নিশ্চয় অনেক পদ তৈরি করছ। কি বল?’

আলি হ্যাঁ না কিছু বলল না। একগাল অমায়িক হাসি হেসে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বলল, 'এইতো হয়ে এল।'

আলির বন্ধুরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো-মন্দ অনেক পদ খাওয়ার আশায় গল্প করতে লাগল। ওদের পেটে ইঁদুরে ডন কষছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আলির বন্ধুরা আর সহ্য করতে না পেরে বলল, 'কই দেখি কী রাঁধছ এত। চোখে না দেখলে আর ভালো লাগছে না।'

'বেশ তো আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমরা নিজেরাই দেখবে চল।' আলি বলে বন্ধুদের রান্নাঘরে নিয়ে গেল।

উনুনের কাছে ভালো-মন্দ মাংস তরকারি রাখা আছে। উনুনে চাপানো আছে একটা বিরাট হাঁড়ি। উনুনে কাঠ নেই। আগুনও নজরে পড়ল না। খুব কাছে গিয়ে ওরা দেখল একটা মোমবাতি জ্বলছে।

'সেকি। এই এতক্ষণ ধরে আমাদের খাবার মোমবাতিতে রান্না করা হচ্ছে? এই রান্না শেষ হবে কখন, আর আমরা খাব কখন। এটা ধোকাবাজি। ঠকানো।' আলির বন্ধুরা বলল।

'হে আমার বন্ধুরা তোমাদের কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। অত দূরের বাড়ির আলো দেখে আমি ওই শীতের মধ্যে, গাঢ় অন্ধকারে যদি উত্তাপ পেয়ে থাকি, আলো পেয়ে থাকি তাহলে রান্না এই মোমবাতিতে হবে না কেন? আমি ওখান থেকে ফিরেই পেট ভরতি খেয়ে নিয়েছি। মোমবাতিতে তোমাদের রান্না হচ্ছে। হলেই খেতে দেব।' বলল।

আলির কথা শুনে লজ্জা পেয়ে আলির বন্ধুরা যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল। তারপর থেকে ওরা আলিকে আর অমায়িক ভাবল না।

দারুণ জ্ঞান

এক গ্রামে চার জন যুবক ছিল। চার জনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। ওদের মধ্যে তিন জন নানান বিদ্যা লাভ করতে পণ্ডিতদের কাছে গেল।

চতুর্থ জন লেখাপড়ার দিকে গেল না। হাতের কাজ শিখল।

কিছুকাল পরে ওই তিন জন শিক্ষিত যুবক দেশান্তরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। চতুর্থ জনও ওদের সাথে যেতে চাইল। তিন জনই নিজেদের খুব জ্ঞানী ভেবেছিল। তাই চতুর্থ বন্ধুকে বলল, 'বন্ধু তুমি আমাদের সাথে গিয়ে কী করবে? আমরা তো আমাদের জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কোনো-না-কোনো রাজার কাছে চাকরি জোগাড় করে নেব। কিন্তু তোমাকে কোন রাজা আশ্রয় দেবে! আমরা জানি তোমার ব্যবহারিক জ্ঞান আছে। কিছু হাতের কাজ জানো। কিন্তু রাজদরবারে তোমার মতো লোকের কি কোনো প্রয়োজন থাকে? তাই বলছি তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

'দেখো ভাই আমি তো তোমাদের বন্ধু। বাচ্চা বয়স থেকে আমরা একসাথে আছি। তোমরা আমাকে সাথে না নিলে আর কে নেবে। রাজদরবারে তোমরা চাকরি নেবে, এ আমি নিজের চোখে দেখব, কত আনন্দ হবে। আমাকে সাথে নাও ভাই।' চতুর্থ বন্ধু বলল।

ওই তিন জন দেখল চতুর্থ জন নাছোড়বান্দা, তখন আর কী করবে সাথে নিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর পথে পড়ল এক অরণ্য। অনেকগুলো হাড় এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে আছে! ওগুলো দেখে ওই তিন জনের একজন বলল, 'এ

হাড়গুলো তো সিংহের। এসব জড়ো করে মন্ত্র পড়ে পূর্ণ এক সিংহের কঙ্কাল তৈরি করতে পারি।'

সিংহের কঙ্কালমূর্তি হয়ে গেল। ওই তিন জনের দ্বিতীয় জন বলল, 'আমি এই কঙ্কালে মন্ত্র পড়ে রক্ত-মাংস-চামড়া দিয়ে আস্ত সিংহ করে দিতে পারি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটি সিংহ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

তখন তৃতীয় বন্ধু এগিয়ে এসে বলল, 'তোমরা আর কী দেখালে। আমি এখন এই প্রাণহীন সিংহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করব।' এই কথা কানে যেতেই চতুর্থ বন্ধু হাতে-পায়ে ধরে অমন কাজ না করার জন্য অনুরোধ করে বলল, 'ওরে ভাইরে, এই দেহে প্রাণ সঞ্চার করো না। যতই হোক সিংহ বলে কথা। হিংস্র পশু একবার বেঁচে উঠলে আমাদের প্রাণ নিয়ে টান দেবে।'

তৃতীয় জন রেগে গিয়ে বলল, 'সবাই সব কিছু দেখাল, আর আমি আমার ক্ষমতা দেখাতে গেলেই তোমার যত আপত্তি। এত খরচ করে এত বছর ধরে যে বিদ্যা আমি শিখেছি তা প্রয়োগ করবোই। কারও কথা শুনব না।'

'ভালো কথা তোমাদের যাইচ্ছে কর। দাঁড়াও আমি আগে গাছে উঠে পড়ি। তারপর তুমি সিংহকে বাঁচাও।' যেই কথা সেই কাজ। সোজা সে গাছে উঠে বসল।

বেঁচে উঠেই সিংহ গর্জে উঠে ওই তিন জন জ্ঞানীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলল।

খলিফার স্বপ্ন

বাগদাদ নগরের শাসক ছিলেন হারুন অল রসিদ। উনি সে বছরে মক্কা যাত্রা করে বাড়ি ফিরলেন। যেদিন ফিরলেন সে রাত্রেই স্বপ্ন দেখলেন।

ওই স্বপ্নে ছিল দু-জন দেবদূত। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

'এ বছর হজ যাত্রী কত জন ছিল?' এক দেবদূত অন্য দেবদূতকে প্রশ্ন করল।

'দশ লক্ষ।' দ্বিতীয় দেবদূত বলল।

'ওদের মধ্যে কত জনের যাত্রা সফল হয়েছে?' প্রথম দেবদূত প্রশ্ন করল।

'একজন বাদে কারও যাত্রা সফল হয়নি।' বলল দ্বিতীয় দেবদূত।

'দশ লক্ষ লোকের মধ্যে কোন সে পুণ্যবান সফল হয়েছে? কোথায় থাকে?' প্রথম দূত জিজ্ঞেস করল।

'ওর নাম ইসমাইল। বস্ত্রানগরে হারুনমিয়া নামক রাস্তায় থাকে।' দ্বিতীয় জন বলল।

হঠাৎ হারুন অল রসিদ খলিফার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলেন। ইচ্ছে করল দেবদূতেরা যার নাম করল তাকে দেখে আসার।

পরের দিন খলিফা সাধারণ পোশাক পরে বস্ত্রানগরে গেল। সেই নগরে হারুনমিয়া রাস্তাটাও সহজে খুঁজে পাওয়া গেল। সেই রাস্তায় উঠে ইসমাইলের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে করতে ইসমাইলের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ওই রাস্তার শেষ প্রান্তে ইসমাইলের ঘর। ঘরটি ভীষণ ছোটো। সেই ঘরের সামনে এক মাঝবয়সি লোক বসে জুতো সেলাই করছিল।
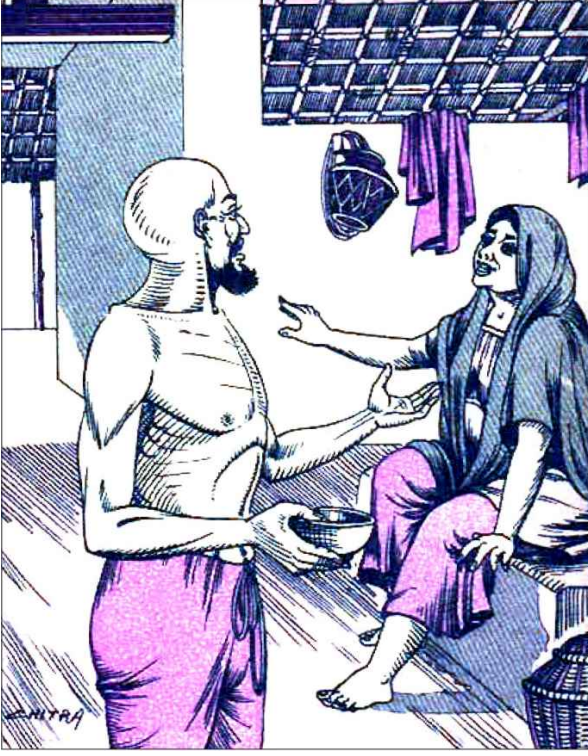
খলিফা তাকে প্রশ্ন করল, 'এটাই কি ইসমাইলের ঘর?'

'আমারই নাম ইসমাইল। আপনি কে? জুতো সেলাই করতে হবে?' ইসমাইল বলল।

ওর কথা শুনে, ওকে দেখে, ওর ঘর দেখে খলিফা ভাবল, এত গরিব লোক যে মক্কায় যেতে পারে এ তো আমি জানতাম না।

'আমি জুতো সেলাই করাতে আসিনি। একটা ব্যাপার জানতে এসেছি। এ বছর আপনি মক্কায় গিয়েছিলেন?' হারুন অল রসিদ জিজ্ঞেস করল।

ইসমাইল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মহাশয়, আমি যেদিন ঠিক করেছিলাম মক্কায় যাব, সেদিন থেকেই একটা করে পয়সা জমাতে লাগলাম। এই বছর গুণে দেখলাম আমার জমানো পয়সা দিয়ে মক্কা যাওয়া যাবে। আমার কত বছরের ইচ্ছা এ বছর পূর্ণ হবে। মনে ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু ঠিক করার মালিক উপরওয়ালা। আমি মক্কা যাত্রায় বেরুব আর মাত্র দু-একদিন পরে। এমন সময় আমার বউ বলল, হ্যাঁ গা শুনছ, আমাদের পাশের বাড়ির লোক মাংস রান্না করছে। আমরা কতদিন ধরে মাংস খাই না। ওদের কাছে চেয়ে একটু মাংস নিয়ে এসো না। আমি ভাবলাম পাশের ঘরের রজাক গরিব লোক। আমাদেরই মতো দিন আনে দিন খায়। ও বেচারা কোত্থেকে হয়তো একটু মাংস জোগাড় করে এনেছে। ওইটুকু ওর নিজের বাচ্চাদেরই হয়তো হবে না। তার উপর আবার হাত পেতে চাওয়া। আমি যা ভাবলাম বউকে তাই বললাম। কিন্তু বউ নাছোড়বান্দা। যতকমই হোক না কেন মাংস সে একটু খেতে চায়। আমাকে চেয়ে আনতেই হবে একটু মাংস।

'ওর ইচ্ছা পূরণের জন্য একটা ছোট্ট বাটি নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ওকে বললাম, রজাক ভাই আমার বউয়ের পেটে বাচ্চা আছে। এই সময় এটা-ওটা খেতে ইচ্ছে করে। বউ বলল তোমার ঘরে নাকি মাংস হচ্ছে? একটু দেবে ভাই? একটা টুকরো হলেও চলবে। একদম নেই বলে তাড়িয়ে দিও না।

'আমার কথা শুনে রজাক আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

তারপর বলল, "ইসমাইল ভাই যে মাংস রান্না হয়েছে সেটা আমাদের নিজেদের খাওয়ার জন্য। ওই মাংস অন্য কারও খাওয়ার উপযুক্ত নয়।"

'শুনে আমি বললাম, আরে তাতে কী হয়েছে। একটা টুকরো বই তো নয়? ও তোমরা যা খাবে তাই দিও। আমি একেবারে ওকে যেন আকুল আবেদন জানাতে লাগলাম।

'রজাক অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে তারপর বলল, "দেখুন, পাঁচ দিন ধরে আমাদের ঘরে কারও খাওয়া-দাওয়া নেই। পাছে লোকে ছ্যা ছ্যা করবে তাই আমি ভিক্ষে করতে বেরুইনি। আজ যখন দেখলাম বাচ্চারা খাবি খাচ্ছে তখন আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখি একটা গাধা মরে পড়ে রয়েছে। তার উরু থেকে একটু মাংস কেটে এনে বউকে রান্না করতে বলেছি। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে ক্ষুদার জ্বালায় মরার চেয়ে যা হোক কিছু খেয়ে প্রাণ বাঁচানো ভালো।"

'রজাকের কথা শুনে আমার ভীষণ দুঃখ হল। এতকাল আমি জানতাম দুনিয়ায় সবচেয়ে গরিব আমি। এখন দেখেছি আমার চেয়ে গরিব আছে আমার দুঃখটাই শেষ নয়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার জমানো পয়সা রজাকের হাতে দিয়ে ব্যাবসা করতে বললাম। আমার মক্কা যাত্রা হল না।'

ইসমাইলের কাহিনি শুনে খলিফা হারুন অল রসিদ বললেন, 'হে পূণ্যবান, কিছু ভেবো না। এই বছরে দশ লক্ষ মক্কা যাত্রীদের ভেতরে একমাত্র তুমিই পূণ্য অর্জন করছ। সফল হয়েছ। এই কথা আমি দেবদূতের কাছে জানতে পেরেছি। দেবদূতেরা আমার স্বপ্নে এসেছিল। আমি বাগদাদের শাসক খলিফা হারুন অল রসিদ।'

এই কথা শুনে ইসমাইল হারুন অল রসিদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।
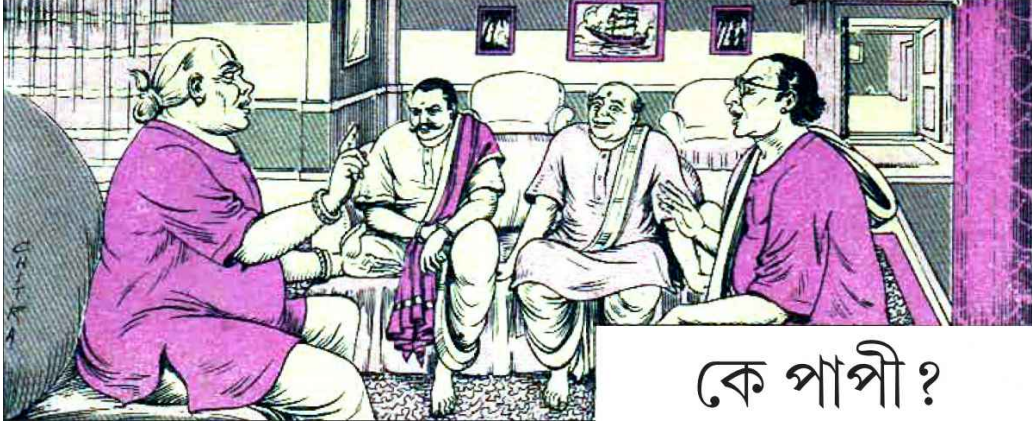
কে পাপী?

এক দেশে এক বুড়ো ধনী ছিল। সারাজীবন অনেক পাপ কাজ করে কোটিপতি হল। নাম ধনগুপ্ত।

ওর কথামতো চলে, ওর সাহায্য নিয়ে আরও কয়েক জন লাখ টাকার মালিক হল।

ধনগুপ্ত অনেক বুড়ো হয়ে গেল। ভাবল যেকোনোদিন মরে যাবে। সারাজীবন তো পাপ করল এবার ওর ইচ্ছে করল পুণ্য করতে। একটাও পুণ্য কাজ না করে মরে গেলে যে নরকে যেতে হবে। পাপ ভয় বড়ো ভয়। ঠিক করল এবার পুণ্য অর্জন করবে। তীর্থে বেরুবে।

ধনগুপ্ত তীর্থে বেরুবে, এ-কথা রটে গেল চারিদিকে। তাই না শুনে ওর কথামতো যারা চলত, পাপ কাজ করত তাদের তিন জন জুটল। দিনক্ষণ দেখে তারা সবাই বেরুল তীর্থে।

যে পথে টাকা নেই ধনগুপ্ত সে পথ কোনোদিন মাড়ায়নি। অতএব পথে কখন কীভাবে চলতে হয় তা ঠিক সে জানত না। তাই ওদের তিন জনকে সাথে নিল অনেক ভেবে। পুণ্য তো হবেই। এর থেকে লাভও আছে। চার জনে মিলে বেরুলে গড়ে খরচ কম হয়। পথে অসুখে পড়লে দেখাশোনা করার লোক থাকবে। এইসব ভেবে ধনগুপ্ত ওদের সঙ্গে নিল।

ওরা প্রথমে ভাবল কাশী যাবে না রামেশ্বরম যাবে। অনেক তর্কাতর্কির পর ঠিক করল যেটা কাছে পড়বে সেখানেই যাবে। ওরা সঙ্গে নিল রামুকে। পথে
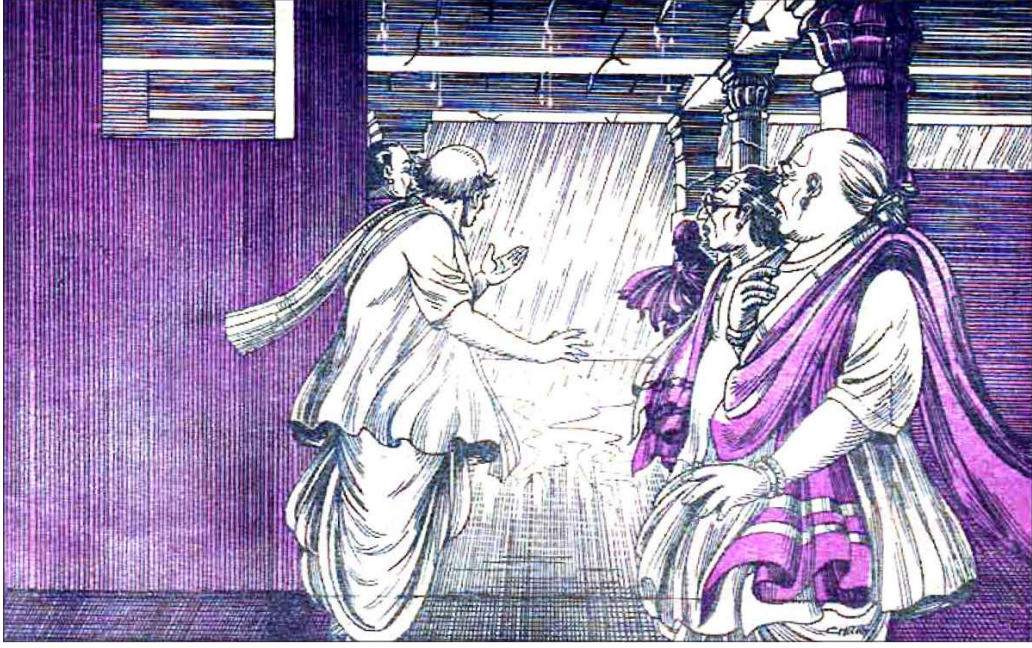
হোটেলে দোকানে খেতে গেলে অনেক খরচ পড়ে যাবে। রামু রান্না করবে ওরা খাবে। আর মাত্র দু-দিনের পথ বাকি ছিল।

হঠাৎ পথে সারা আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ওরা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। প্রাণ নিয়ে প্রাণান্ত। পড়ে গেলে মরে যাবে। কারণ বজ্র পড়ছে। কোথাও আশ্রয় পেলে দাঁড়াবে। ওরা ছুটতে ছুটতে চোখের সামনে দেখছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বজ্র পড়ছে। অনেক দূর ছোটার পর ওরা এক ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নিল। বৃষ্টি থামছে না। প্রতি মুহূর্ত বজ্রবিদ্যুতের ঘনঘটা।

'একি সর্বনেশে বৃষ্টিরে বাবা! আমার জন্মে এ-রকম বৃষ্টি দেখিনি। আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ পাপী রয়েছে। ওই পাপীর জন্যই আজ আমাদের সবার মাথায় বজ্র পড়বে।' ধনগুপ্ত বলল।

বাকি তিন জন ধনী একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল, 'এই রামুই পাপী। এর জন্যেই আমাদের এত দুর্ভোগ। আমাদের পিছু পিছু এও ভাঙা মন্দিরে ঢুকে পড়েছে। এর মন্দিরে ঢোকার পর থেকে আরও যেন বেশি করে বৃষ্টি হচ্ছে। পাপীরা যেখানেই লুকোবার চেষ্টা করুক ভগবানের ঠিক নজর আছে। একে মন্দির থেকে বের করে দিলে কেমন হয়?'

ধনীরা ভাবতে লাগল কে পাপী। ওরা ভেবে ঠিক করল রামুই পাপী। পরক্ষণেই ওরা সবাই একমত হয়ে রামুকে বেরিয়ে যেতে বলল। রামু তো অবাক। সে কত কাজ করে। রান্না করে। খাওয়ায়। ওদের হাত-পা টিপে দেয়। তবু তার উপর এত নির্দয়। এত নিষ্ঠুর।

'আজ্ঞে আমাকে এভাবে বের করে দেবেন না। একদম ভিজে যাব। গরিব

মানুষ। আর কোনো জামাকাপড় নেই। আমি যদি পাপী হই, আপনারা চার জন তো পুণ্যবান। ভগবান নিশ্চয়ই এমন কিছু করবেন না যাতে আপনাদের কোনো বিপদ হয়। ভগবান অন্যায় করেন না।' রামু ওদের হাতে-পায়ে ধরে বলল।

রামু কান্নাকাটি করতে লাগল। কিন্তু কোনো ফল হল না। ওদের মন গলল না। তীর্থে গেলে কী হবে, মন তো ওদের পাপে ভরা। তাই ওরা কিছুতেই রাজি হল না। রামুকে ঠেলে মন্দির থেকে বের করে দিল।

রামু বৃষ্টিতে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দূরের এক গাছের নীচে দাঁড়াল।

তারপরেই ভীষণ আওয়াজ হল। রামু ভয়ে চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখে ওই মন্দির একেবারে ভেঙে পড়েছে। ওই মন্দিরের ওপর বজ্র পড়েছিল তাহলে, রামু ভাবল। ওখানে মন্দিরের টুকরো ছাড়া ওই ধনী চার জনের একজনকেও দেখতে পেল না। যারা নিজেদের পূণ্যবান ভেবে ছিল তাদের পাপে ভরা দেহগুলো মাটির সাথে একেবারে মিশে গেল।

কথায় বলে রাখে হরি মারে কে আর মারে হরি রাখে কে।

মন্দিরের ওপর বজ্র পড়ায় মন্দিরের সাথে সাথে নিজের লোকসহ ধনগুপ্তও শেষ হয়ে গেল।

আধ আনার রাজা

পাটলিপুত্র নগরে এক গরিব লোক ছিল। লোকটি বাড়ি বাড়ি জল বয়ে রোজগার করত। লোকটি থাকত সেই নগরের উত্তর দ্বারে।

সেই নগরেরই দক্ষিণ দ্বারে এক রমণী বাস করত। সেও কলসি কলসি জল বয়ে রোজগার করত। কীভাবে ওদের দু-জনের মধ্যে আলাপ হল। বিয়েও হল।

বিয়ে হলেও নগরের দুই প্রান্তে দু-জন থাকায় ওদের দেখাসাক্ষাৎ হত না। দু-জনকেই যে কাজ করে খেতে হয়।

এইভাবে চলছিল। কী এক পরব এল। লোকটা তাড়াতাড়ি বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে দক্ষিণ দ্বারে গেল। বউ-এর সাথে দেখা করতে।

'আজ পরবের দিন। সবাই আনন্দ করছে। আমরা কিছু করব না? আমার কাছে আধ আনা আছে। তোমার কাছে কত আছে?' ওর বউ জিজ্ঞেস করল। নিজের কাছে যে আধ আনা আছে তা দেখাল।

'আমার কাছেও আধ আনা আছে। সেটাকে উত্তর দ্বারে দেয়ালের ইটের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছি। দু-জনের মিলিয়ে এক আনা হয়। ওই দিয়ে আমরা কী আনন্দ করব?' স্বামী বলল।

'এক পয়সা দিয়ে ফুল কিনব। আর এক পয়সা দিয়ে চন্দন। বাকি দু-পয়সা খরচ করে পায়েস খাব।' বউ বলল।

বউয়ের কথা শুনে লোকটি খুব খুশি হল। বেশ মজা হবে। দু-জনে মিলে একদিন আনন্দ করা যাবে।
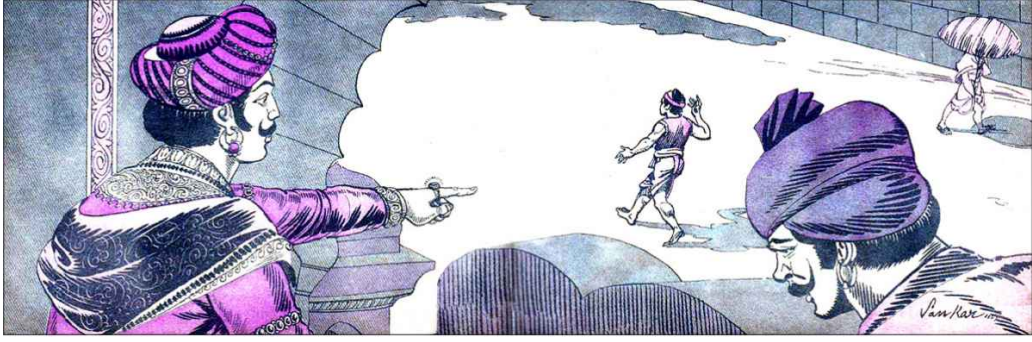
'তুমি এখানেই থাকো। আমি এক্ষুনি উত্তর দ্বার থেকে আমার পয়সা নিয়ে আসছি।' এই কথা বলে লোকটি উত্তর দ্বারের দিকে চলল।

ভরা দুপুর। মাথার উপর সূর্য। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে। পায়ের নীচের বালি যেন আগুন। কিন্তু সেই লোকটির কোনো কিছুর খেয়াল নেই। উত্তর দিকে চলেছে তো চলেছেই। লোকটা যেন লাফাতে লাফাতে মনের আনন্দে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ দ্বারের মাঝ পথে রাজার প্রাসাদ ছিল। লোকটির হাঁটা রাজার নজরে পড়ল। রাজা অবাক হল। এত কড়া রোদে এত উৎসাহের সঙ্গে লোকটা হেঁটে যাচ্ছে কোথায়!

রাজার কৌতূহল হল। এত উৎসাহ লোকটা কোত্থেকে পেল! কেন পেল!

রাজা লোক পাঠাল। ওই লোকটিকে ধরে আনতে।

রাজার লোক ওই লোকটির কাছে গিয়ে তাকে বলল, 'ওহে, রাজা তোমাকে ডাকছেন, চল।'

'রাজার সাথে আমার কী কাজ? আমি রাজাকে চিনি না।' বলেই লোকটা আবার হাঁটা দিল।

রাজার লোক লোকটাকে জোর করে ধরে-বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা ওকে বলল, 'কিহে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? রোদে বালি পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি তার উপর দিয়ে হাঁটছ? এই কড়া রোদ মাথায় করে কোথায় যাচ্ছ?'

'মশাই, আমার বুকে আনন্দের আগুন জ্বলছে। সেটা আরও গরম। বাইরের রোদ আমি কিছুই টের পাচ্ছি না। আমি যে যাচ্ছি তার একটা কারণ আছে। আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করব।'

রাজা ভাবল না-জানি কী ইচ্ছা, কত বড়ো ইচ্ছা। রাজা বলল, 'কীসের ইচ্ছা তোমার?'

'মশাই, আজ পরবের দিন। আমার বউয়ের কাছে আধ আনা, আর আমি উত্তর দ্বারের দেয়ালের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছি আধ আনা। দু-জনের মেলালে হবে এক

আনা। তার মধ্যে এক পয়সা দিয়ে কিনব ফুল। আর এক পয়সা দিয়ে কিনব চন্দন। বাকি দু-পয়সা খরচ করে খাব পায়েস। সেইজন্য যাচ্ছি উত্তর দ্বারে। এক্ষুনি আমাকে পয়সা নিয়ে দক্ষিণ দ্বারে ফিরতে হবে। আমার বউ আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে দিন।' বলল লোকটা।

ওর কথা শুনে রাজা অবাক হয়ে তাকে বলল, 'তুমি যতটা পথ এসেছ এখনও তোমাকে ততটা পথ যেতে হবে তবে তুমি পৌঁছাবে উত্তর দ্বারে। তারপর আবার ডবল পথ হেঁটে তুমি যাবে দক্ষিণ দ্বারে। এত পরিশ্রম করতে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে তুমি একটা কাজ কর। আমি তোমাকে আধ আনা দেব। তুমি দক্ষিণ দ্বারে ফিরে যাও।'

'খুব ভালো কথা। আপনি আধ আনা দিতে চান দিন। কিন্তু আমিও আমার আধ আনা আনতে যাব।' সে বলল।

'ওই আধ আনার জন্য অত ছোটাছুটি করবে কেন? চাও তো নিয়ে যাও আমি তোমাকে চার আনা দেব। তাই নিয়ে ফিরে যাও।' রাজা বলল।

'খুব ভালো কথা। আপনি চার আনা দিতে চান দিন। কিন্তু আমি আমার আধ আনা নিয়ে দক্ষিণ দ্বারে ফিরে যাব।' লোকটি বলল।

রাজার জিদ চাপল। কত দিলে যে লোকটি আধ আনার কথা ভুলবে তা পরখ করে দেখতে চাইল। এক টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে লক্ষ টাকা দিতে চাইল।

রাজা যতই দিতে চাক লোকটি কিন্তু ওই আধ আনা ইটের ফাঁক থেকে আনতে চাইল।

শেষে রাজা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি যদি ওই আধ আনা না আনো তো তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্যের এক্ষুনি রাজা করে দেব।'

'ঠিক আছে আমাকে রাজা করে দিন।' অন্য কোনো উপায় না পেয়ে লোকটি রাজি হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এই লোকটাকে অর্দ্ধেক রাজ্য লিখে দিয়ে দলিল তৈরি করুন।'

তারপর রাজা লোকটিকে বলল, 'আমার মন্ত্রী দলিল লিখে দেবেন। তুমি রাজ্যের কোন দিকটা চাও?'

'আজ্ঞে উত্তর দিক চাই।' লেকটি বলল।

সবাই বলাবলি করল, অর্দ্ধেক রাজত্ব পেয়েও উত্তর দিকের ফাঁকে লুকিয়ে রাখা আধ আনার কথা লোকটি কিছুতেই ভুলতে পারল না!

রাজার কথামতো মন্ত্রী লোকটির নামে অর্দ্ধেক রাজত্ব লিখে দিল।

লোকে কিন্তু ওই লোকটির নাম রেখেছিল— 'আধ আনার রাজা'।

বংশগৌরব

বুন্দেলখণ্ডে ঠাকুর বংশের একজন ছিল। সবাই ওকে ‘দেওয়ান সাহেব’ নামে ডাকত। লোকটা দু-বেলা খেতে না পেলেও গর্ব ছিল। কোনো চাকরিই তার পছন্দ নয়। নিজের বংশগৌরবের কথা প্রচার করত। অনেকে তার কথা শুনতে বাধ্য হত।

একদিন দেওয়ান সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক বণিকের সাথে কথা বলছিল। এমন সময় দূরে দেখতে পেল একটা গাড়ি আসছে। ওই গাড়ি বোঝাই ধানের বস্তা। গাড়িটা ওদের দিকেই আসছিল।

ওই গাড়ি দেখতে পেয়েই দেওয়ান সাহেব বলল, ‘আরে বাপরে। কত বড়ো হাতি এদিকে আসছে। আমার ঠাকুরদার এই ধরনের হাতি ছিল।’

‘আপনি ভুল দেখছেন দেওয়ান সাহেব। যেটা এদিকে আসছে সেটা একটা হাতি নয়। ধানের বস্তা বোঝাই গাড়ি।’ বলল বণিক।

দেওয়ান সাহেব এ-কথা শুনে বলল, ‘আপনি চোখে কম দেখছেন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি হাতি আসছে।’

‘ক্ষমা করবেন। আমি ঠিকই দেখছি। এ কিছুতেই হাতি হতে পারে না। ধানের বস্তা বোঝাই গাড়ি আসছে।’ বণিক বলল।

কথাটা শুনেই দেওয়ান সাহেব বাজি রেখে বলল, ‘ওটা যদি হাতি হয় আমি আপনার মাথা কেটে নেব, আর যদি গাড়ি হয় তাহলে আমার মাথা আপনি কেটে নেবেন। রাজি থাকেন তো বাজি রাখুন।’

বণিক বাজি রাখতে রাজি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ওদের কাছে এসে গেল।

'দেখলেন তো দেওয়ান সাহেব, আপনি হেরে গেলেন!' বণিক বলল।

'ঠিক বলেছেন। আপনি এখন আমার মাথা কেটে নিন!' দেওয়ান সাহেব বলল।

'যাকগে ছেড়ে দিন।' বণিক বলল। সে ভেবে ছিল এইভাবে ছেড়ে দিলে দেওয়ান সাহেব আর কোনোদিন বংশগৌরবের কথা প্রচার করবে না।

'তা হতে পারে না। বাজি যখন রেখেছেন, বাজিই যখন জিতেছেন, আমার মাথা কেটে নিতেই হবে। ঠাকুর বংশের লোক এককথার মানুষ।' ঠাকুর সাহেব জিদ ধরল।

বণিক বিপদে পড়ল। কী করবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'তাহলে, আমাদের উচিত হবে বিচারকের কাছে যাওয়া।'

দেওয়ান সাহেব তাতে রাজি হল। দু-জনে মিলে বিচারকের কাছে গেল।

বিচারক সমস্ত ব্যাপার শুনে, বণিকের মনের অবস্থা বুঝে রায় দিল, 'দেওয়ান সাহেবের মাথা বণিক কেটে নিতে পারে। কিন্তু বণিকের যখন ইচ্ছা হবে তখন সে কাটতে পারে। বণিককে ব্যস্ত করার অধিকার কারও নেই।'

এই রায় শুনে বণিক খুশি হল। কিন্তু দেওয়ান সাহেব বলল, 'তাই যদি হয়, এই মুহূর্ত থেকে এই মাথা রক্ষা করার এবং লালনপালন করার দায়িত্বও বণিকের। আমার মাথার ব্যাপারে আমার আর কোনো মাথা ব্যথা নেই।

অন্য কোনো উপায় না থাকায়, অগত্যা দেওয়ান সাহেবের মাথা রক্ষা করার ও লালনপালন করার দায়িত্ব সে নিল।

অত বড়ো বংশের দেওয়ান সাহেবের মাথা অর্থাৎ তার সব খরচ বহন করতে ভালো করে পুষতে দু-হাতে খরচ করতে হল দেওয়ান সাহেবের জন্য। ফলে বণিকের টাকা শেষ হয়ে এল।

বণিকের এই বিপদ নিয়ে তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভাবনায় পড়ে গেল।

শেষে একটা উপায় বের করল। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন একটা লোক বণিকের বাড়ির কাছে হেঁকে বলল— নাক, কান কেনা হয়।

বণিক ওই লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন কিনব বলছ?'

'বাবু, আমি মানুষের নাক, কান কিনে থাকি।' ওই লোকটা বলল।

'কত করে কিনবে?' বণিক ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করল।

'উচ্চ বংশের লোকের একটা নাক এবং দুটো কান মোট পাঁচ-শো টাকায় কিনে থাকি।'

বণিক ওই লোকটাকে দেওয়ান সাহেবকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটা উচ্চ ঠাকুর বংশের। এর মাথা এখন আমার। তাই আমাকে পাঁচ-শো টাকা দিয়ে এর নাক এবং কান কেটে নাও।'

দেওয়ান সাহেবের টনক নড়ল। মাথায় যেন বাজ পড়ল।

'বণিকমশাই, এ কিন্তু বড়ো অন্যায়।' দেওয়ান সাহেব বলল।

'কেন অন্যায় হবে? এ মাথা তো আমার। আমার পালিত মাথা। কত টাকা এর পেছনে ঢেলেছি।' বণিক বলল।

'এক কাজ করি, বিচারকের কাছে আমরা আবার যাই। উনি যা বলবেন তাই হবে।' দেওয়ান সাহেব বলল।

দু-জনে আবার বিচারকের কাছে গেল। সব কথা শুনে বিচারক রায় দিল আপনার নাক, কান বিক্রি করার অধিকার বণিকের আছে। এতদিন আপনার নাক, কান সহ মাথার পেছনে বণিক যে খরচ করেছেন তা ফেরত দিলে নাক, কানের উপর আপনার অধিকার ফিরে পাবেন।

এই রায় পেয়ে দেওয়ান সাহেব আর কোনো কথা না বলে নিজের যা-কিছু সামান্য বিষয়সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

মেয়েদের পরামর্শ

পারস্য দেশের বাদশা ছিলেন, তখন খুসরো। একদিন সকালের কথা। বউ সহ বাদশাহ প্রাসাদের ছাদে বসে আছেন। এক জেলে বিরাট একটা বড়ো মাছ এনে বাদশাহকে ভেট দিল।

মাছটি যেমন দেখতে তেমনি খেতে। বাদশাহ খুশি হয়ে, জেলেকে চার হাজার মুদ্রা দিতে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিলেন। বাদশাহের বেগম শিরিন বিরক্ত হল। বেগম সেদিন দেখল বাদশাহ যখনই খুশি হয় তখনই কয়েক হাজার করে মুদ্রা উপহার দিয়ে দেয়। একবার নয় দু-বার নয় বাদশাহ বার বার এভাবে অপচয় করে থাকেন। বেগমের কাছে এই ব্যাপারটা ভালো লাগল না।

জেলে টাকা নিয়ে প্রাসাদ থেমে নেমে যখন চলে যাচ্ছে তখন বেগম বাদশাহকে বলল, 'আপনি আচ্ছা লোক তো? একটা মাছের জন্য আপনি চার চার হাজার মুদ্রা উপহার দিয়ে দিলেন। এইভাবে উপহার দিলে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য উপহার দিতে হবে। পদে পদে কথায় কথায় এভাবে মুদ্রা খরচ করলে খাজনা শেষ হয়ে যাবে। আপনি এক কাজ করুন যেকোনো অজুহাতে মুদ্রাগুলো জেলের কাছ থেকে নিয়ে নিন। ওকে এক্ষুনি ডেকে পাঠান।'

'আমি যে মুদ্রা উপহার দিয়েছি তা ফেরত নেওয়া উচিত হবে না। এতে আমার বদনাম হবে। এইবার গেছে যাক ভবিষ্যতে দেখা যাবে।' খুসরো বললেন।

'তা কেন হবে! আমাদের বদনাম হবে কেন? আমি এমন কায়দা বাতলে দিচ্ছি যাতে বদনাম হবে না। আপনি এক কাজ করুন। এক্ষুনি জেলেকে ডেকে পাঠান।
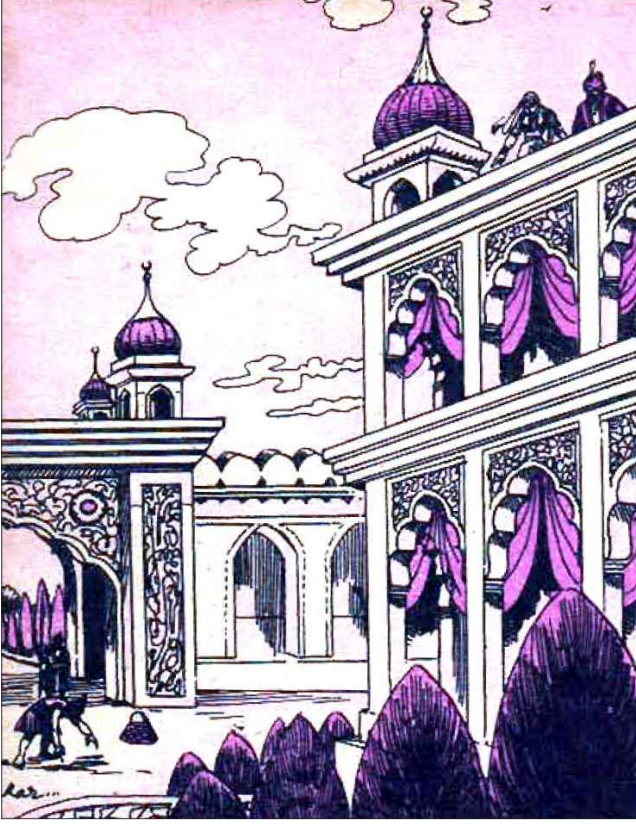
তাকে প্রশ্ন করুন, এই মাছ মাদী না মদ্দা? ও যদি বলে মদ্দা আপনি তখন বলবেন আমি মদ্দা মাছ চাই না, মাদী হলে নিতাম। আবার ও যদি বলে মাদী, আপনি বলবেন, মাদী মাছ চাই না মদ্দা হলে নিতাম।' শিরিন বলল। শিরিনের বড়ো আশা তার কথামতো তার স্বামী চলবে। এত বড়ো বাদশা চলেন তার স্ত্রীর কথায়।

বাদশাহ খুসরো বেগম শিরিনকে খুব ভালোবাসতেন। তাই বেগমের কথা উড়িয়ে দিতে চাইলেন না। লোক পাঠিয়ে ওই জেলেকে ডেকে পাঠালেন।

জেলে বাদশাহের কাছে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এক্ষুনি যে মাছটা দিলে সেটা মদ্দা না মাদী?'

জেলে কী বলে তো শোনার জন্য শিরিন বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জেলের একটি কথায় চার হাজার মুদ্রা ফেরত আসবে। এমন সময় জেলে মাথা হেঁট করে সেলাম করে বাদশাহকে বলল, 'হুজুর এই জাতের মাছের মধ্যে মাদী মদ্দের কোনো ভেদ নেই। প্রত্যেক মাছ ডিম পাড়ে। আর তা দেয়।'

ওর কথা শুনে বাদশাহ খুসরো হো-হো করে হাসলেন। খাজাঞ্চিকে বলে দিলেন আরও চার হাজার মুদ্রা ওকে দিতে।

বেগম শিরিন রাগে ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে মনে মনে জ্বলতে থাকে।

জেলে মোট আট হাজার মুদ্রা ঝুড়িতে নিয়ে খুশি মনে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মুদ্রা ঝুড়ি থেকে নীচে পড়ে গেল। জেলে সেই মুদ্রা কুড়িয়ে নিল। প্রাসাদের ছাদ থেকে সেই দৃশ্য দেখে বেগম শিরিন বাদশাহকে বলল, 'দেখলেন তো, জেলেটা কি হাড়কেপ্পন? আট হাজার মুদ্রা থেকে মাত্র একটি পড়ে গেছে জেলেটা তাই কুড়িয়ে নিল। কেন? ওই একটা মুদ্রা কি কোনো গরিব লোক কুড়িয়ে পেলে খারাপ হত?'

বেগমের এই কথার অর্থ বুঝে বাদশাহ ওই জেলেকে আবার ডেকে পাঠালেন।

জেলেকে ডেকে পাঠাতেই বেগম শিরিনের সব রাগ যেন জল হয়ে গেল। কী বলবে এবার জেলেটা। এবার ঠিক আট হাজার মুদ্রা ঘরে ফিরে আসবে। জেলে ততক্ষণে এলে বাদশাহ বললেন, 'তুমি তো খুব খারাপ লোক। আট হাজার থেকে মাত্র একটা পড়ে গেছে আর সেটা তুমি হাঁকপাক করে কুড়িয়ে নিলে! কেন, ওটা যদি কোনো গরিব কুড়িয়ে পেত, খারাপ হত? তুমি দেখছি হানকেপ্পন লোক।'

এবারেও মাথা হেঁটে করে বাদশাহকে সেলাম করে বলল, 'আল্লা, বাদশাহকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি একটা মুদ্রার জন্য কিপ্টেমি করিনি। আপনার দেয়া প্রত্যেকটি মুদ্রা আমার কাছে পবিত্র জিনিস। মুদ্রার একদিকে বাদশাহের ছবি আছে আর অন্য দিকে রয়েছে বাদশাহের পবিত্র নাম। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার ভয় হল কেউ যদি ওই পবিত্র মুদ্রা মাড়িয়ে দেয়। অথবা যারা দেখতে পাবে তারা যদি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ওই মুদ্রা যত্ন করে না তোলে! সেটা তো বাদশাহেরই অপমান? এই সব ভেবে হুজুর আমি ওই একটি মুদ্রা মাটি থেকে তুলে নিয়েছি।'

জেলের জ্ঞান এবং ভক্তি দেখে বাদশাহ খুশি হয়ে আবার তাকে চার হাজার মুদ্রা উপহার দিলেন। জেলে খুশি মনে ফিরে গেল।

এই একটি ঘটনার মাধ্যমে বাদশাহ খুসরো বুঝলেন যে স্ত্রীর পরামর্শ মতো চললে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়। উনি সেই দিনই ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করালেন: 'মেয়েদের কথামতো চললে একটা ভুল শোধরাতে দুটো ভুল বেশি করতে হয়।'

জুতোর আপদ

আগেকার কথা। কায়রোতে আবু কাসিম নামে এক বৈদ্য বা হাকিম থাকত। লোকটা হাড়কেপ্পন ছিল। ওষুধ বিক্রি করে লোকটা খুব লাভ করত। কিন্তু কিছুতেই কানাকড়িও খরচ করতে চাইত না। ভিখিরিদের গায়ে যত ছেঁড়া এবং নোংরা জামাকাপড় থাকে ও তার চেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরত। ওর মাথার পাগড়িতে ধুলো জমে রং বদলে গিয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে বিচ্ছিরি দেখতে ছিল তার জুতো। সেগুলো এত পুরোনো ছিল যে বলার নয়। মুচিরা ওই জুতোতে কয়েক হাজার সেলাই ফোঁড় করেছে। পেরেক ঠুকেছে। অনেক বার মেরামত হওয়ায় জুতোটা ভারীও হয়েছে খুব।

আবু কাসিমের জুতোর ব্যাপারটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বোঝা বহনকারী কুলিরা কথায় কথায় বলত, ‘ওরে বাবা, এত বড়ো বোঝা, এ যে একেবারে আবু কাসিমের জুতো।’ বদহজমের জন্য কারও পেটে ব্যথা উঠলে সে বলত, পেটটা কচরমচর করছে। ঠিক যেন আবু কাসিমের জুতো।’

একবার ব্যাবসায় আবু কাসিমের অনেক লাভ হল। অন্য কোনো ব্যাবসাদার হলে সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াত। কিন্তু আবু কাসিম তা করে কী করে। ও যে হাড়কেপ্পন লোক। ভালো লাভ হলে অনেকে নিজের বাড়িতে উৎসবের মতো কিছু-একটা করে। আবু সে পাত্র নয়। ওর কাছে কানাকড়িও মহা মূল্যবান জিনিস। উৎসব করলে তো অনেক খরচ। খরচ করলেই তো কমে যাবে টাকার অঙ্ক। আবু কাসিম ঠিক করল সে পাড়ার স্নানাগারে গিয়ে স্নান করবে। কারণ অনেক বছর
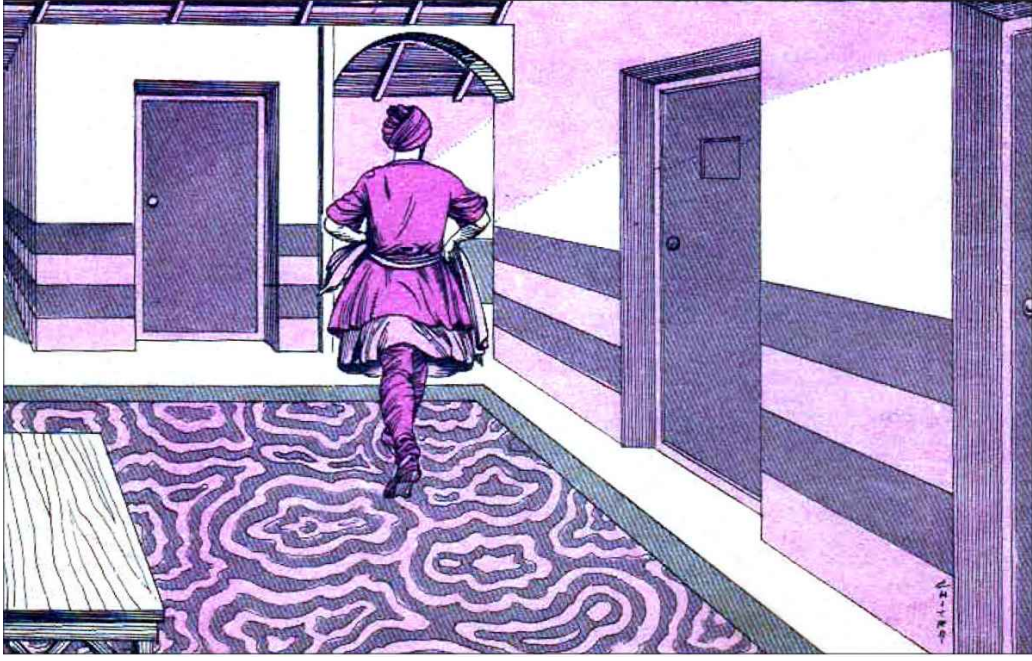
সে চান করেনি। এইভাবে বিনা খরচে সে আনন্দ করবে। এইভাবে আনন্দ করলে কোনো খরচ হবে না।

আবু ওষুধের দোকান বন্ধ করে সকালেই চলে গেল চান করতে। জুতো পায়ে দিয়ে গেল না, পাছে নষ্ট হয়ে যায়। তাই হাতে করে বয়ে নিয়ে গেল। স্নানাগারের বাইরে সবাই জুতো রেখেছে। সেও সেখানে রাখল। চান করতে গেল।

আবু কাসিমের গায়ে কয়েক বছরের মাটি জমে রয়েছে। চান করানোর লোকগুলো আবু কাসিমের গা কয়েক ঘণ্টা ধরে রগড়াতে লাগল। স্নানাগার থেকে যখন বেরিয়ে এল সূর্য তখন ডুবু ডুবু। ততক্ষণে যারা চান করতে এসেছিল সবাই ফিরে গেছে। স্নানাগারের বাইরে কাসিম দেখতে পেল সবুজ রং-এর জুতো পড়ে রয়েছে।

'আহা হা, ঠিক এই রকমের জুতো আমি কত বছর ধরে কিনতে চাইছিলাম। আল্লা বোধ হয় আমার মনের কথা শুনতে পেয়েছেন। সেইজন্যই উনি আমাকে এই জুতো জোড়া উপহার দিয়েছেন। অথবা এও হতে পারে কেউ হয়তো ভুলে ফেলে গেছে। আর আমার জুতো জোড়া পরে গেছে।' এই সব কথা মনে মনে বলে নতুন জোড়া পরে খুশি মনে চলে গেল।

আসল ব্যাপার ছিল অন্য ধরনের। কাজি সাহেব তখন স্নানাগারে ছিল। আর সেই জুতো জোড়া কাজি সাহেবের। কাসিমের জুতো নোংরা বলে দূরে সরিয়ে ফেলে রেখেছিল জুতোর পাহারাদার। কাসিম যখন বেরুলো পাহারাদার তখন সেখানে ছিল না।

কাজি চান করে বেরিয়ে দেখে তার জুতো নেই। স্নানাগারের চাকরেরা আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করল। দেখতে পেল বহু পরিচিত কাসিমের জুতো। ওই তল্লাটে সবাই কাসিমের জুতো চেনে।

চাকর এবং কাজি বুঝতে পারল কাসিম জুতো জোড়া পরে চলে গেছে। ওই হামামের চাকরেরা কাসিমকে ধরে নিয়ে এল কাজির কাছে।

কাজি নিজের জুতো জোড়া নিয়ে জুতো চুরির অপরাধে কাসিমকে জেলে পাঠাল। জেলের কর্মকর্তাদের প্রচুর ঘুস দিয়ে কাসিম ছাড়া পেল।

এ ঘটনার ফলে নিজের জুতোর উপর কাসিমের ভীষণ রাগ হল। ও সেই জুতো জোড়া নীল নদীর জলে ফেলে এল। ভাবল আপদ গেছে। কিন্তু অত সহজে কি আর ওই জুতো কাসিমকে ছাড়ে।

এর কিছুদিন পরে ওই জুতো জোড়া উঠে এল জেলেদের জালে। ওই জুতো সবাই চেনে। জুতোর পেরেক লেগে জাল ছিঁড়ে গেছে।

রেগে গিয়ে জেলেরা কাসিমের দোকানে এল। কাসিমকে গালাগালি দিল। আর ওই জুতো জোড়া দোকানের ভেতর ছুড়ে মারল। দুটো জুতো লেগে ওষুধের আরকের কয়েকটি বোতল পড়ে ভেঙে গেল। ফলে কাসিমের অনেক লোকসান হল।

আবু কাসিম মাথায় হাত দিয়ে বসল। প্রাণ ভরে জুতো জোড়াকে গাল দিল। তারপর ওই জুতো জোড়া নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে এক গর্ত খুঁড়ে জুতো জোড়া পুঁতে দিল। পুঁতে দিয়েই আবু কাসিমের মন আনন্দে ভরে উঠল যেন। যাক আর কোনো বিপদ নেই।

আবু কাসিমের প্রতিবেশী কাসিমকে দু-চোখে দেখতে পারত না। প্রতিবেশী

নগরপালের কাছে অভিযোগ করে বলল, 'আবু কাসিম মাটি খুঁড়ে দেশের সম্পত্তি তুলে নিচ্ছে।'

সবাই জানে আবু কাসিম খুব লোভী। তাই নগরপাল বিশ্বাস করল। বিচারের দিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আবু কাসিম বলল, 'আমি আমার জুতো জোড়া পুঁতে ফেলতে মাটি খুঁড়ে ছিলাম। আমার প্রতিবেশীর অভিযোগ সত্য নয়। আমার বাড়ির পেছনে দেশের কোনো সম্পত্তি পোঁতা নেই।' কাসিম যত কথাই বলুক অত সহজে ছাড়া পেতে পারেনি। অনেক টাকা ঘুস দিয়ে সে ছাড়া পেয়েছিল।

রাগে-দুঃখে কাসিম নিজের দাড়ি যেন উপড়ে ফেলে। এইবার সে জুতো জোড়া নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিরাট নদীতে ফেলে দিয়ে আসে।

কিন্তু কাসিমের কপাল মন্দ। নদীর ওই জায়গায় একটা যন্ত্র বসানো ছিল। জুতো জোড়া ওই যন্ত্রে ঢুকে গেল। কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

যন্ত্র সারানোর সময়ে লোকে দেখে তার ভেতরে কাসিমের জুতো। চিনতে পেরেই যন্ত্রের মালিক কাসিমের নামে অভিযোগ পেশ করল। সে যাত্রা অনেক টাকা জরিমানা দিয়ে কাসিম যেন ফতুর হয়ে গেল।

আর কোনো উপায় না পেয়ে কাসিম নিজের বাড়ির ছাদের দেওয়ালে জুতো জোড়া রেখে দিল। পরক্ষণেই পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কুকুর লাফ দিয়ে কাসিমের ছাদে এল। জুতো জোড়া টানাটানি করতে লাগল। ফলে জুতো জোড়া পাশের গলিতে পড়ে গেল।

ঠিক তক্ষুনি ওই গলি দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ি! ওই ভারী জুতো জোড়া মাথায় পড়তেই বুড়ি মারা গেল।

বুড়িকে ঘিরে বহুলোক দাঁড়াল। জুতো চিনতে পেরে কাসিমকে যা মুখে এল তাই গাল দিল।

বুড়ির আপনজনেরা আদালতে কাসিমের নামে হত্যার অপরাধে অভিযোগ পেশ করল। অতীতের মতো এবারেও কাসিম কিছু টাকা দিয়ে মুক্ত হতে চাইল।
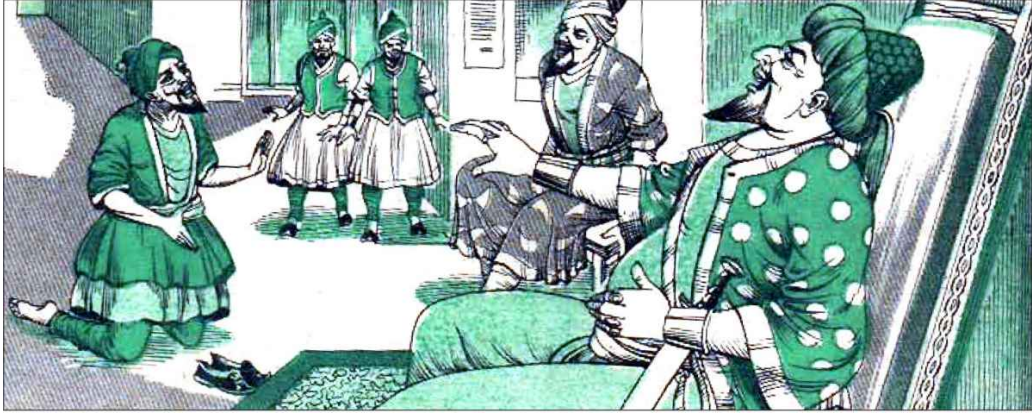
কিন্তু হত্যার অপরাধ বলে কথা, অত সহজে অত কম টাকায় ছাড়বে কেন। তাই সেবারে নিজের সর্বস্ব দিয়ে কাসিম ছাড়া পেল।

এতদিনে বুঝি আবু কাসিমের জ্ঞানোদয় হল। সে জুতো জোড়া নিয়ে কাজির কাছে গিয়ে বলল, 'মহামান্য কাজি সাহেব, এই জুতো জোড়া নিয়ে আমি আর পারছি না। এর জন্য আমি ফতুর হয়ে গেলাম। আমার সর্বস্ব গেছে। এই জুতো জোড়া এইবার আমি আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। আমি কোথাও ফেলে দিতে চাই। অতঃপর এই জুতো জোড়ার জন্য কারও যদি কোনোরকম ক্ষতি হয় তখন যাতে আমাকে অপরাধী না করে আপনি এমন একটা নতুন আইন ঘোষণা করে দিন। দয়া করে এটা করুন, আমাকে বাঁচান।'

আবু কাসিমের কথা শুনে কাজিসহ বিচারক মণ্ডলীর সবাই হেসে গড়াগড়ি খেল।

ঋণের বাঁধন

সেকালের কথা। ধারা নগরীতে ধর্মু নামে এক মুচি ছিল। জুতো সেলাই করে দিন যাপন করত। আর রাত্রে নগরে পাহারা দিয়ে চৌকিদারের কাজও করত। ধর্মু সারারাত ধরে শহরের পথে পথে ঘুরে প্রহরে প্রহরে লোককে হুঁশিয়ার করে দিত হুঁশিয়ার জেগে থাক।

ধর্মুর সময় ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে একটা চিন্তা যেন তাকে পেয়ে বসেছিল, একটিও সন্তান হল না।

সেই গ্রামে এক নামকরা পণ্ডিত ছিল। ধর্মু যখন পাহারা সেরে ঘরে ফিরত তখন সেই পণ্ডিত স্নানের জন্য ঘর থেকে বেরুত। একদিনের কথা। পণ্ডিত স্নান করতে নদীর দিকে যাচ্ছে ধর্মু তার সামনে এসে প্রণাম করে তাকে এমন আশীর্বাদ করতে বলে যাতে তার একটি সন্তান হয়।

ওর কথা শুনে পণ্ডিত বলল, ‘ধর্মু তোমার সন্তান হয়নি তারজন্য তুমি এত ভাবছ কেন? আগেকার লোকে বলে গেছেন:

ঋণানুবন্ধ রূপেণা
পশু পত্নী সুতালয়া

অর্থাৎ পত্নী, বাচ্চা, পশু, ঘরদোর সবই ঋণের বাঁধন হিসেবেই পেয়ে থাকি। সেই ঋণ যখন চুকে যায় তখন ওসবের কোনোটাই থাকে না।’ এই কথাগুলো বলে পণ্ডিত স্নান করতে চলে গেল।

পণ্ডিতের এই উপদেশ ধর্মুর মনে বৈরাগ্য ভাব আনতে পারেনি। উলটে তার মনে হল, আমার ধনদৌলত কেউ যদি খরচা করে আমাকে শোধ না দেয় তাহলে তো সে চিরকাল আমার কাছে ঋণীই থেকে যাবে। অতএব তার উচিত আমার ঘরে জন্ম নিয়ে আমার ঋণ শোধ করা। তাহলে কেউ-না-কেউ আমার কাছে ঋণী থাকলে নিশ্চয়ই তা শোধ করতে জন্মাবে।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে ধর্মু ঠিক করল এবার থেকে যাদের জুতো সেলাই করবে তাদের কাছ থেকে আর পয়সা নেবে না। যারা জুতো কিনতে আসবে ওদের কাছ থেকেও পয়সা নেবে না। তাই করতে গেল। কিন্তু যারা জুতো সেলাই করায় তারা পয়সা দিতে চায় আর যারা জুতো কেনে ওরাও ফোকটে জুতো নিতে চায় না। ওরা বলে, 'তোমার কাছে ঋণী থাকার মতো দুর্ভাগ্য আমাদের এখনও হয়নি।' ওরা রাগ করে চলে যায়।

এরপর ধর্মু অন্য এক উপায় ঠাওরালো। এক গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটি নদী গিয়েছিল। নদীর মাঝে প্রায় দেড় ক্রোশ ধু-ধু বালি। ধর্মু ঠিক করল ওর ওপর দিয়ে বহু লোক হাঁটে কেউ-না-কেউ খালি পায়ে হাঁটবেই। আর সে যদি এক জোড়া জুতো দেখতে পায় নিশ্চয় পরে নেবে। জুতো না পরে কড়া রোদে হাঁটবে কী করে। আর যে একবার পরবে সেই আমার কাছে ঋণী।

এই সব ঠিক করে পরের দিন ভোরে এক জোড়া নতুন জুতো ওইখানে রেখে এল। সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখে জুতো জোড়া ওই ভাবেই পড়ে রয়েছে!

বহুদিন কেটে গেল কিন্তু কেউ নতুন জুতো জোড়া নেয়নি। ধর্মুর মন নিরাশায় ভেঙে পড়ল। মনে মনে বলল, হে ভগবান, আমার তো আর তাহলে সন্তান হবে

না। কেউ তো আমার নতুন জুতো জোড়া নিচ্ছে না! কেউ তো আমার কাছে ঋণী হচ্ছে না!

তবুও ধর্মু ওই একই ভাবে রোজ জুতো জোড়া পথের মাঝখানে রেখে আসত আর সন্ধ্যায় গিয়ে দেখত সেটা আছে।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখে জুতো জোড়া নেই।

এতদিনে আমার ইচ্ছা পূরণ হল। আমি সফল হয়েছি। আমার ভাগ্য প্রসন্ন। তাড়াতাড়ি ধর্মু বাড়ি গিয়ে বউকে বলল। বউয়ের আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু ধর্মুতো জানত না কে ওর জুতো জোড়া নিয়ে গেছে। ওসব জানার ইচ্ছাও যেন তার জাগল না।

২

একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। যে পণ্ডিত ধর্মুকে ঋণের বাঁধনের উপদেশ শুনিয়েছিল, সেই পণ্ডিত একদিন জরুরি কাজে ওই পথে পাশের গ্রামে গিয়েছিল। ফেরার পথে ভরা-দুপুরে তাকে ওই পথে হাঁটতে হয়েছিল। পণ্ডিতের পায়ে জুতো ছিল না। গরম বালির ছেঁকায় তার পা পুড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল ওই নতুন জুতো জোড়া। পণ্ডিতের শুকনো বুকে যেন প্রাণ এল।

পণ্ডিত ভাবল, কোনো মুচি হয়তো বিক্রি করতে এই জুতো জোড়া এনেছে। এখানে হয়তো ভুলে ফেলে গেছে। তাই ভেবে চারিদিকে খুঁজল সেই মুচিকে।

পণ্ডিত ভাবল, এক কাজ করি, জুতো জোড়া গ্রামে নিয়ে গিয়ে খোঁজ করি এটা কার জুতো। যার জুতো হবে তাকে দাম দিয়ে দেব। এই কথা ভেবে সে জুতো পরে গ্রামের দিকে হাঁটা দিল। সেইদিন সন্ধ্যায় সেই গ্রামে যত মুচি ছিল সবাইকে ডেকে পাঠাল। সবাইকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কেউ স্বীকার করে না। সবাই এল ধর্মু এল না। সে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকে পণ্ডিতকে। সব জায়গায় ঘোরে কিন্তু পণ্ডিতের সামনে পড়ে না।

জুতো যে কার তা জানার জন্য পণ্ডিত অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারল না। বড়ো দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবতে ভাবতেই কয়েক দিনের মধ্যে অসুখে পড়ে গেল। সে অসুখ কিছুতেই সারে না। অবশেষে পণ্ডিতের মৃত্যু হল। পণ্ডিত তো ধর্মুর কাছে ঋণী রয়েছিল, তাই সে ঋণ শোধ করার জন্য ধর্মুর স্ত্রীর গর্ভে এল।

৩

ধর্মুর স্ত্রী দশ মাস গর্ভধারণ করে এক সুন্দর শিশুর জন্ম দেয়। মুচিদের মহলে সাড়া পড়ে গেল। ধর্মু এবং তার বউ-এর আনন্দের আর সীমা রইল না। মা-বাবা অনেক ভেবে বাচ্চার নাম রাখল রইদাস।

দিনে দিনে বাড়ল রইদাস। বড়ো হয়ে সেও বাপের মতো জুতো সেলাই করে। জুতো বেচে। যা পায় তা বাবার হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ধর্মু নিতে চায় না।

ধর্মুর ভয় ছেলে তো ঋণের বাঁধন। যত তাড়াতাড়ি ঋণ শোধ করে দেবে তত তাড়াতাড়ি বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। ধর্মু বউকেও সাবধান করে দিল। ছেলের কাছ থেকে যেন পয়সাকড়ি না নেয়।

রইদাস জানত যে সে আগের জন্মে ছিল এক পণ্ডিত। ধর্মুর ছেলে হয়ে যে সে কেন জন্মেছে তাও জানত। রইদাসের রাতদিন ওই এক চিন্তা। কত তাড়াতাড়ি সে ঋণ শোধ করে মুক্তি পাবে। কিন্তু তার বাপ-মা তো কিছুতেই টাকাপয়সা নিতে চায় না। ধার শোধ হবে কী করে? মুক্তি কী করে পাবে।

একদিন ধর্মুকে অন্য কোনো গাঁয়ে যেতে হল। ছেলেকে ডেকে বলল, ‘বাবা রইদাস আমি আজ অন্য এক গ্রামে যাব, আজকের রাতটা নগরে তুমি পাহারা দাও। প্রহরে প্রহরে ঘুমন্ত লোককে সাবধান করে দাও।’

বাবার কথামতো রইদাস রাত্রে পাহারা দিতে বেরিয়ে পড়ল। রইদাসের সাথে অন্য এক পাহারাদার ছিল। সে বলল, রইদাস এখন রাত্রি একপ্রহর শেষ হল। তুমি হেঁকে ডেকে ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে সাবধান করে দাও।

তারপর রইদাস উচ্চকণ্ঠে এই শ্লোক হেঁকে বলল :

মাতা নাস্তি, পিতা নাস্তি,
নাস্তি বন্ধু, সহোদর,
অর্থ নাস্তি, গৃহনাস্তি,
তস্মাৎ জাগ্রত, জাগ্রত!

সাথে যে পাহারাদার ছিল, সে থ বনে গেল। সে রইদাসকে বলল, ‘আরে ভাই এর মানেটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

রইদাস তাকে বুঝিয়ে বলল, ‘আমাদের নেই কোনো মা, নেই কোনো বাবা, নেই কোনো বন্ধু আর নেই কোনো ভাই। আমাদের নেই ধন, নেই ঘর, অতএব সাবধানে জেগে থাক।’

এক প্রহর পরে রইদাস আবার উচ্চস্বরে বলল:

কাম ক্রোধশ্চ, লোভশ্চ
দেহে তিষ্ঠান্তি তস্করাঃ
জ্ঞান রত্নোপহরায়,
তস্মাৎ জাগ্রত জাগ্রত!

রইদাস যখন এই শ্লোক শুনিয়ে ঘুমন্ত মানুষকে জাগাচ্ছিল তখন তার সাথে

অন্য পাহারাদারের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সে ভাবতে লাগল রইদাস এসব শিখল কোথায়, কী করে? সে এর অর্থ জানতে চাইল।

'কাম, ক্রোধ এবং লোভ নামের চোর আমাদের জ্ঞানের রত্নকে চুরি করার জন্য আমাদের শরীরের ভেতরে লুকিয়ে বসে থাকে। অতএব তোমরা সাবধানে জেগে থাক।' রইদাস বলল।

রইদাসের সাথের পাহারাদার অবাক হয়ে তাকে বলল, 'রইদাস তোমার এই কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। এতদিন তোমার বাবা ঘটি-বাটি যারা চুরি করে তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে সাবধান করে দিত, কিন্তু এই চোরদের ব্যাপারে কোনো কথা তো বলত না। এই সব কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে?'

দেখতে দেখতে তৃতীয় প্রহরও কেটে গেল। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্য রইদাস জোরে জোরে বলল :

জন্ম দুঃখম্, জরা দুঃখম্
জায়া দুঃখম্, পুনঃ পুনঃ
সংসার সাগরম্ দুঃখম্
তস্মাৎ! জাগ্রত জাগ্রত!

এই শ্লোক শুনে সাথী পাহারাদার হকচকিয়ে গেল। ও আবার জানতে চাইল এর অর্থ। সে বলল, 'রইদাস তুমি এক নিঃশ্বাসে অনেক বার দুঃখ শব্দটা বললে, এর মানে কী বলত?'

রইদাস আবার বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের জন্মগ্রহণ করাই দুঃখের, ঘর-সংসারও সমুদ্রের মতো বিরাট দুঃখের। তাই, তোমরা সব সাবধানে জেগে থাক।'

‘এই দেখ, তোমার বাবা ওদিকে তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্য একটি সুন্দরী পাত্রীর খোঁজ করছেন আর তুমি কিনা বৈরাগ্যের কথা বলছ। কী ব্যাপার বলত?’ সাথী পাহারাদারের প্রশ্ন।

একটু পরে চতুর্থ প্রহরও শেষ হল। তখন রইদাস শেষ প্রহরের শেষ শ্লোক জোরে জোরে উচ্চারণ করল :

আশয়া বদ্ধতে, লোকে
কর্মনা বদ্ধ চিন্তয়া,
আয়ু ক্ষীণম্ ন জনাতি,
তস্মাৎ জাগ্রত, জাগ্রত!

সাথের পাহারাদার এই শ্লোকেরও অর্থ বুঝিয়ে দিতে বলল। রইদাস মানে করে দিল, ‘আশা, কাজ এবং চিন্তা মিলে এই সংসার বাঁধা পড়ে রয়েছে। এর মাঝে আয়ু যে আমাদের ক্ষীণ তা খুব কম লোকই জানে। অতএব সাবধানে জেগে থাক।’

সেই শহরের রাজা রইদাসের প্রথম প্রহরে উচ্চারণ করা শ্লোক শুনতে পেয়েছিল। ওই শ্লোক শুনে রাজা অবাক হল। ফলে একের-পর-এক শ্লোক শোনার জন্য রাজা সারারাত জেগে বাকি তিনটি শ্লোকও শুনে নিল।

সকালে রাজা নিজের লোক দিয়ে ওই পাহারাদারকে ডেকে পাঠাল। রইদাস সামনে আসতেই রাজা তাকে প্রণাম করে বলল, ‘মহাশয় আপনি তো মহাপণ্ডিত। আপনি তো সাধরণ মানুষ নন। এক সাধারণ পাহারাদারের এত জ্ঞান, এত পাণ্ডিত্য থাকতে পারে না। আপনি অনুগ্রহ করে এই পুরস্কার গ্রহণ করুন!’ এই কথা বলে রাজা স্বর্ণমুদ্রায় ভরতি এক থলে রইদাসের দিকে এগিয়ে ধরল।

কিন্তু রইদাস এত ধন নিয়ে কী করবে। রইদাস ভাবছে। হঠাৎ তার মনে হল সে তো এই ধন বাবা-মাকে দিয়ে ধার শোধ করতে পারে। এ-কথা ভেবে সে ওই থলে নিয়ে নিল।

পরের দিন ধর্মু বাড়িতে ফিরল। রইদাস জানত সে যদি এই থলে বাবাকে দেয়, বাবা নিতে রাজি হবে না। এই নিয়ে সে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল।

হঠাৎ মুচিদের বস্তিতে আগুন লেগে গেল। সবাই ছোটাছুটি করে আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করতে লাগল। রইদাসও নিজের ঘরের জিনিস এক-একটা বের করে এনে তার বাবার হাতে দিচ্ছিল। তার বাবা দূরে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখছিল।

এই সুযোগে রইদাস ওই স্বর্ণমুদ্রার থলি অন্যান্য জিনিসের সাথে বাপের হাতে তুলে দিল। বাবাও তাড়াহুড়োর মধ্যে দেখল না যে কোনটা কী।

রইদাস মনে মনে খুব খুশি। এতদিনে সে পিতার ঋণ শোধ করতে পেরেছে। তারপর সে ধর্মুর জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে আর বেরুলো না।

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে ধর্মুর খুব বেশি দেরি লাগল না। তখন ধর্মু স্মরণ করল রইদাসের কথা, রইদাসের পূর্ব জন্মের, সেই পণ্ডিতের কথা। ঋণের বাঁধনের উপদেশ। ধর্মুও সেই উপদেশ বুঝে জ্ঞানী হল।

রাজার তদন্ত

শ্রাবস্তি নগরে প্রসেনজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। দূর দেশ থেকে সে রাজার শাসনকালে এক ব্রাহ্মণ এল। ব্রাহ্মণের ছেলে বউ আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। সেই নগরে নানান জাতের লোক ছিল কিন্তু ছিল না ব্রাহ্মণ। আর এই ব্রাহ্মণও বড়ো একা। সেই নগরে ব্রাহ্মণ কেউ না থাকায় বহু লোক তাকে দানদক্ষিণা দিয়ে যেত। চাল, কলা, মূলো সবই পেত।

বেচারা তো একা। অত খাবে কে? অত খরচ করবে কী করে! তাই জমতো। জমতে জমতে এক হাজার মুদ্রা জমে গেল। কাউকে প্রাণভরে দিতেও তার ইচ্ছা করত না। খরচ করতে পারবে না, আবার দানও করবে না তো কী আর করবে! ওসব একটা পাত্রে ঢেলে গভীর বনে মাটিতে পুঁতে রেখে দিল। কারও কথা তো কিছু ভাববার নেই। ভাবনা শুধু ওই হাজার মুদ্রার। মাঝে মাঝে বনে গিয়ে দেখে আসত ওই হাজার মুদ্রা কেউ খুঁড়ে নিয়ে গেছে কি না।

এইভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন বনে গিয়ে দেখে মাটি খোঁড়া রয়েছে। হাজার মুদ্রার পাত্র নেই। কেউ চুরি করেছে। ব্রাহ্মণ দিশেহারা হয়ে গেল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে লাগল নগরের বিভিন্ন পথে ঘুরতে ঘুরতে। অনেকে প্রশ্ন করে। ব্রাহ্মণ নিজের বিপদের কথা ওদের কাছে বলে। লোকে শোনে আর অবাক হয়। কারণ কেউ জানত না যে ব্রাহ্মণের এত মুদ্রা ছিল।

বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণ ঠিক করল আর এ জীবন সে রাখবে না। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে মারা যাবে। ব্রাহ্মণের কাণ্ডকারখানা অনেকেরই নজরে

পড়ল। কিন্তু ব্রাহ্মণকে এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেও কেউ তার কোনো সুরাহা করতে পারল না।

ও নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবে। এমন সময় প্রসেনজিৎ ওই নদীতে স্নান করে উঠে আক্ষ্ম সছিলেন। ব্রাহ্মণকে থামিয়ে তার কুশল সংবাদ রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গেসঙ্গে ব্রাহ্মণ বুক চাপড়ে রাজার কাছে কান্নাকাটি করে সমস্ত ব্যাপারটা রাজাকে বলল। রাজা বললেন, 'তাহলে কী করবেন?'

রাজার দিকে একবার অসহায় ভাবে কান্নামাখা মুখে তাকিয়ে বলল, 'এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব।' ব্রাহ্মণ জবাব দিল।

রাজা বললেন, 'ছি ছি সেকি কথা। আপনার হাজার মুদ্রা চুরি হয়ে গেছে তারজন্য আপনি আত্মহত্যা করবেন কেন? চুরি যদি হয়ে থাকে চোর ধরার ভার আমার। আর আমি যদি ধরতে না পারি রাজকোষ থেকে আপনাকে হাজার মুদ্রা দেওয়া হবে। তাই বলে আপনি আত্মহত্যা করবেন এ কখনোই হতে পারে না। আমি রাজা থাকা কালীন আপনার মুদ্রা হারাবে আর আপনি আত্মহত্যা করবেন! আচ্ছা আপনি কোথায় পুঁতেছেন আপনার মনে আছে?'

'মহারাজ আমি ওই বনে নাগবল (বুনো গাছের নাম) নামক গাছের গোড়ায় পুঁতে রেখেছিলাম। আজকে দেখছি সেই গাছও নেই আর আমার হাজার মুদ্রাও নেই।' ব্রাহ্মণ বলল।

'কী করে? ওরকম গাছ তো আরও অনেক এই বনে থাকতে পারে।' রাজা বললেন।

'না মহারাজ। এই বনে নাগবল গাছ আর একটিও নেই।' ব্রাহ্মণ বলল।

'আপনি যে ওখানে রেখেছেন তা আর কে কে জানে?' রাজার প্রশ্ন।

'মহারাজ এই রহস্য আমি আর কাউকে বলিনি। কাকে বলব? আমার যে
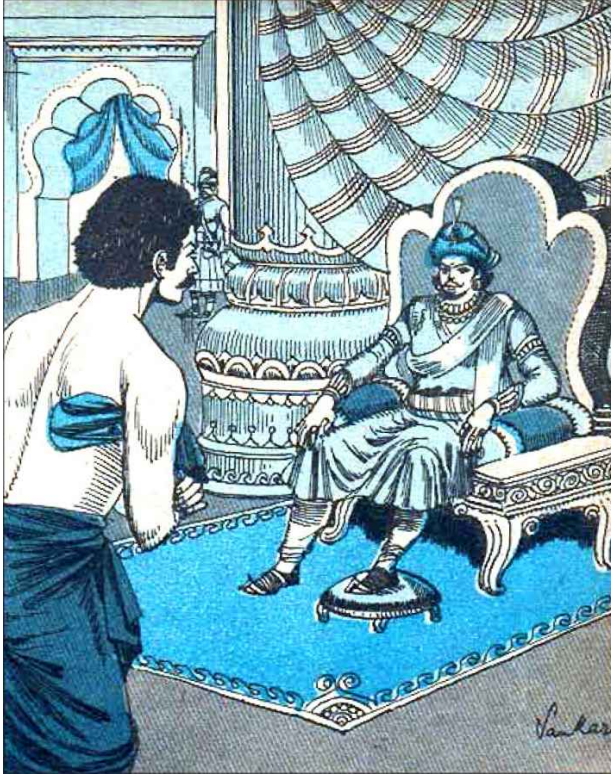
কেউ নেই। সারাদিন আমি কোথায় যাই, কী করি এসব কেউ দেখে না, কেউ প্রশ্নও করে না।' ব্রাহ্মণ বলল।

রাজা ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন। রাজা নিজে প্রাসাদে ফিরে গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন। চোর ধরতেই হবে, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। চোর ধরার উপায়ও মনে মনে ঠিক করে নিলেন।

মন্ত্রীকে ডেকে রাজা বললেন, 'মন্ত্রীমশাই আমার শরীর একদম ভালো নেই। আমাদের নগরের সমস্ত বৈদ্যকে ডেকে পাঠান।'

রাজা ডেকেছেন শুনে নগরের সমস্ত বৈদ্য হাজির হল। রাজা সবাইকে এক ঘরে বসিয়ে প্রত্যেক বৈদ্যকে অন্য ঘরে আলাদা আলাদা ডাকিয়ে জানতে চাইলেন ওরা দু-দিন ধরে কোন কোন রোগের চিকিৎসা কোন কোন গাছের পাতা বা শেকড় দিয়ে করেছে। বৈদ্যরাও একে একে বলে যেতে লাগল।

রাজার কাছেই মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রী বুঝতে পারেনি রাজার বৈদ্যদের এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য।

বৈদ্যরা আসে রাজার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে যায়। একজন বৈদ্য বলল যে সে আগের দিন নাগবল গাছের শেকড় ব্যবহার করেছে। রাজা তাকে বললেন, 'সেই গাছ তুমি পেলে কোথায়?'

'আমি পাইনি মহারাজ আমার চাকর খুঁজে এনে দিয়েছে।' বৈদ্য বলল।

'তুমি গিয়ে তোমার চাকরকে পাঠিয়ে দাও।' রাজা বললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই চাকর রাজার কাছে এসে হজির হল।

'তুমি ওই এক হাজার মুদ্রা কী করলে?' রাজা বলল।

চাকরের মুখ সাদা হয়ে গেলে। বলল, 'আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি মহারাজ।'

'ওই সমস্ত মুদ্রা আমাদের ব্রাহ্মণকে দিয়ে এসো। ওই হাজার মুদ্রা ওই ব্রাহ্মণেরই। যাও।' রাজা বললেন।

‘আজ্ঞে যাচ্ছি মহারাজ।’ বলে চাকর প্রণাম করে চলে গেল।

এতক্ষণ মন্ত্রী কান খাড়া করে শুনছিল রাজার কথাবার্তা। রাজা কী করে যে ওই স্বর্ণমুদ্রার চোরকে ধরতে পারলেন মন্ত্রী বুঝতে পারেনি। রাজাকে জিজ্ঞেস করল, ‘মহারাজ আপনি এত সহজে এত বড়ো একটা চুরির তদন্ত কী করে করলেন?’

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে রাজার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠল। রাজা একগাল হেসে বললেন, ‘ওই ব্রাহ্মণের কথা সত্য বলে ধরে নিয়ে আমি তদন্ত করা শুরু করেছি। এই নগরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে চুরি একজনই করেছে। ব্রাহ্মণ যে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে তা কেউ জানত না। অথচ ঠিক ওই জায়গায় খুঁড়তে পারে কে? নাগবল যার দরকার সে ছাড়া আর কে হবে।

‘ওই বনে আর একটিও নাগবলের গাছ নেই বলে ব্রাহ্মণের কাছে জানলাম। যে মুদ্রা চুরি করেছে সে নিশ্চয়ই গাছ খুঁড়তে গিয়ে পেয়েছে। শুধু মুদ্রার জন্য খুঁড়লে গাছ ওখানেই ফেলে যেত।

‘এখন দেখতে হবে ওই নাগবল গাছ কার দরকার হতে পারে। নিশ্চয় বৈদ্যের। তাই নগরের সমস্ত বৈদ্যকে ডেকে পাঠালাম। নাগবল গাছ যে বৈদ্য ব্যবহার করেছে তাকে পেতেই চোরকেও সন্ধান করা সহজ হল। এর মধ্যে তো জটিল কিছু নেই। জলের মতো সহজ। তাই না মন্ত্রী?’

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী মনে মনে খুশি হল। বিস্মিত হল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবনত হল এবং তাঁর অপূর্ব তদন্ত করার ক্ষমতায় মুগ্ধ হল।
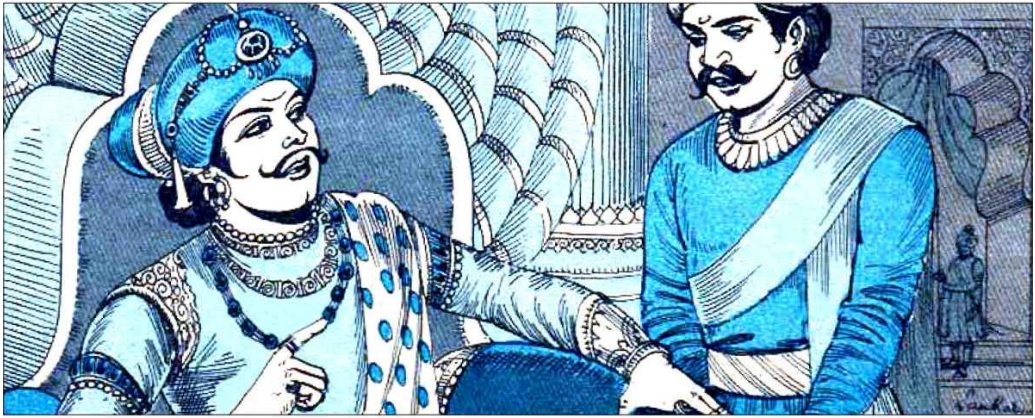
বিচিত্র বিচার

এক গ্রামে কণকদাস ও কণকলক্ষ্মী নামে দম্পতি ছিল। কণকদাস টাকা রোজগার করতে ও জমাতে খুব ওস্তাদ ছিল। সে প্রত্যেক মাসে শত শত টাকা রোজগার করত। খরচ করত মাত্র দুটো টাকা। বাকি টাকা সিন্দুকে রেখে চাবি নিজের কোমরে বেঁধে রাখত। কণকলক্ষ্মী যতই অনুরোধ করুক, কাঁদুক সে তার বেশি এক পয়সাও বের করত না।

একদিন সকালে কণকদাস কোনো একটা কাজে অন্য গ্রামে গেল। বেরুনোর আগে বউয়ের হাতে আধুলি রেখে বলল, 'এটা খরচ করে তুমি এক বেলা খেয়ে নাও।'

কণকলক্ষ্মী আধুলিটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সন্দেহের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে রাত্রে কী খাব? রাত্রে কি আমাকে উপোস করে থাকতে হবে?'

'আরে আমি সন্ধে নাগাদ ফিরে আসব। রাত্রে খরচের পয়সা ফিরে এসে দেবে।' কণকদাস জবাবে বলল।

'আর আট আনা দিয়ে গেলে কি ফতুর হয়ে যাবে। সিন্দুকে টাকা ভরে রেখেছ কিন্তু আমার হাতে দু-পয়সা বেশি দিতে চাও না। মা-বাবা আর পাত্র পেল না, তোমার মতো কিপটেকেই খুঁজে পেল।' বলে কণকলক্ষ্মী চোখ মুছল।

বউয়ের কথা কানে না তুলে কণকদাস হনহন করে নিজের কাজে চলে গেল।

কণকলক্ষ্মী মনে মনে স্বামীকে যা মুখে এল তাই বলল, বাজারে গিয়ে যা হোক

কিনে রান্না করে খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেল। দরজা খুলে দেখে তার বাবা।

বাবা বাড়িতে পা রেখেই জিজ্ঞেস করল, 'ভালো আজ তো মা?' কণকলক্ষ্মী আগে থেকে মা-বাবার উপর মনে মনে চটে ছিল। বাবার প্রশ্ন শুনে বলল, 'এর সঙ্গে আমার বিয়ে না দিয়ে গলায় কলসি বেঁধে জলে ফেলে দিলেই পারতে। যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ ভালো থাকার উপায় আছে। সব টাকা ওই সিন্দুকে রাখে। আমার হাতে কানাকড়িও থাকে না। কোনো আত্মীয়স্বজন এলে তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারি না।'

কণকলক্ষ্মী আরও অনেক কথা শোনাল বাবাকে।

কণকলক্ষ্মীর বাবা এসব শুনে অবাক হয়ে বলল, 'মা, আমি তোমার ঘরে খেতে আসিনি। তুমি কেমন আছ জানতে এসেছি।' এ-কথা বলে বাবা মাথা নীচু করে ভার মনে চলে গেল।

কড়া রোদে বাবার ফিরে যাওয়াতে, বাবাকে কিছু খাওয়াতে না পারায়, দুঃখে অভিমানে রাগে ফুলতে থাকে কণকলক্ষ্মী। সারাজীবনের রাগ যেন জমাট বাঁধতে থাকে। স্বামী বাড়ি ফিরলে আজ একটা বিহিত করে ছাড়বে।

সন্ধ্যার সময় কণকদাস বাড়ি ফিরে কোমর থেকে চাবি বের করে বলল, 'আমি খেয়ে এসেছি। এখন তোমার জন্যই অহেতুক আট আনা খরচ করতে হবে।'

কণকলক্ষ্মী হঠাৎ তার স্বামীর চাবি গোছা কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠে বলল, 'এবার থেকে এই চাবির গোছা আমার কাছেই থাকবে। এবার থেকে আমি খরচ চালাব। ভরা দুপুরে কড়া রোদে তোমার শ্বশুর এসেছিলেন তাঁকে কিছুই খাওয়াতে পারিনি। লোকে শুনলে কী বলবে। তোমার না-হয় লজ্জা-ঘেন্না-ভয় নেই, আমার তো আছে!'
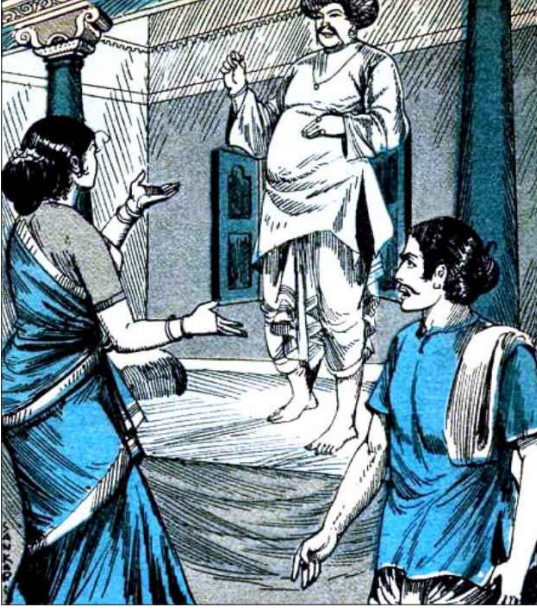
কণকদাস রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'টাকা খরচ করে ফেলা কোনো বড়ো কাজ নয়, বুঝলে। রোজগার করে কেউ আমার হাতে তুলে দিলে আমিও খরচ করতে পারি। দাও চাবি দাও বলে দিচ্ছি।'

'দেব না। কোনোক্রমেই দেব না।' কণকলক্ষ্মী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

'কেন দেবে না? আমার টাকা খরচ করার তুমি কে?' বলে তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিতে চেষ্টা করে।

'কে মানে, আমি কি রাস্তার মেয়ে যে আমার অধিকার থাকবে না। তোমার টাকা খরচ করার অধিকার আমারও আছে। সব টাকা সিন্দুকে তুলে রাখার জন্য নয়। খরচও করতে হয়।' বলে সে চাবি নিয়ে সেখান থেকে সরে যায়।

তক্ষুনি ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সামনের বাড়ির বিরাট এক ব্যাবসাদার এসে বলল, ঝগড়া করছ কেন?'

কণকলক্ষ্মী লোকটাকে সব কথা জানিয়ে বলল, 'এবার আপনি বিচার করুন। আপনি যা বলবেন তাই মেনে নেব।'

'এই মরেছে, আমি তোমাদের ঝগড়া মেটাতে বিচার করতে বসব কোন দুঃখে। যাই।' বলে ব্যাবসাদারটি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দু-চারটে বাড়ির পরে আছে ও পাড়ার মোড়লের বাড়ি। মোড়লের বউ জিজ্ঞেস করল, 'ঝগড়া হচ্ছে কেন?'

কণকলক্ষ্মী তার কাছে ছুটে গিয়ে সমস্ত কথা শুনিয়ে বিচার করতে বলল।

মোড়লের বউ সব কথা মন দিয়ে শুনে শেষ কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ওমা, আমার কী ছাই কারও কোনো ব্যাপার বিচার করার সময় আছে।' বলে সেও তাড়াতাড়ি কণকলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আরও কিছুদূরে এক বৃদ্ধ বসে বসে ওদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ওই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে সব কথা শুনিয়ে বিচার করতে বলল কণকলক্ষ্মী ও কণকদাস।

'আমি তোমাদের ঝগড়া কী করে মেটাব? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া তো স্বয়ং ভগবানই মেটাতে পারে না।' বলতে বলতে বুড়ো আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

'ঠিক আছে চল ভগবানের কাছেই বিচার চাই।' বলে কণকলক্ষ্মী স্বামীর হাত ধরে টানতে থাকে। গেল মন্দিরে। পূজারি ছিল না। প্রদীপ জ্বলছিল।

স্বামীর হাত ধরে সোজা ঠাকুরের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, 'ঠাকুর, স্বামীর রোজগার খরচ করার অধিকার কি স্ত্রীর নেই? এ আমার স্বামী। আমার হাতে একটি পয়সাও দেয় না। একে ভালো করে বোঝাও ঠাকুর। আমার বিচার কর ঠাকুর।'

ঠাকুর তার কথার জবাবে কিছুই বলল না। তখন কণকদাস বলল, 'ঠাকুর, হতে পারে এ আমার বউ, তাই বলে কি আমার খাটুনির পয়সা খরচ করতে পারে? ওর খাবার খরচের টাকা আমি তো দিয়ে থাকি। ঠাকুর, বিশ্বাস কর, আমার গিন্নি এক পয়সাও রাখতে পারে না। ভীষণ হাত খোলা মেয়েছেলে। সেইজন্যই তাকে টাকাপয়সা দিই না।' কণকদাস বক্তব্য পেশ করল।

ইতিমধ্যে পূজারি এসে সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে বলল, 'একেবারে ঠাকুরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে এসব কী হইচই আরম্ভ করেছ। যাও বাইরে যাও। এখন মন্দিরের দরজা বন্ধ করার সময় হয়ে এল। তোমরা শুনিয়েছ। ঠাকুর পরে ভেবে-চিন্তে বিচারের রায় জানাবেন। এখান থেকে সর।' ওরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এল।

তারা বাড়ি ফেরার পথে আবার ঝগড়া করতে লাগল। পথের লোক ওদের বলল, 'তোমরা পথে-ঘাটে ঝগড়া করছ কেন? যাও, বাড়ি যাও।'

বাড়ি ফিরেই স্বামী-স্ত্রীতে একেবারে থ বনে গেল। সিন্দুকের দরজা খোলা। কারা যেন সিন্দুক ভেঙে টাকাপয়সা সোনাদানা সব ফাঁকা করে নিয়ে গেছে।
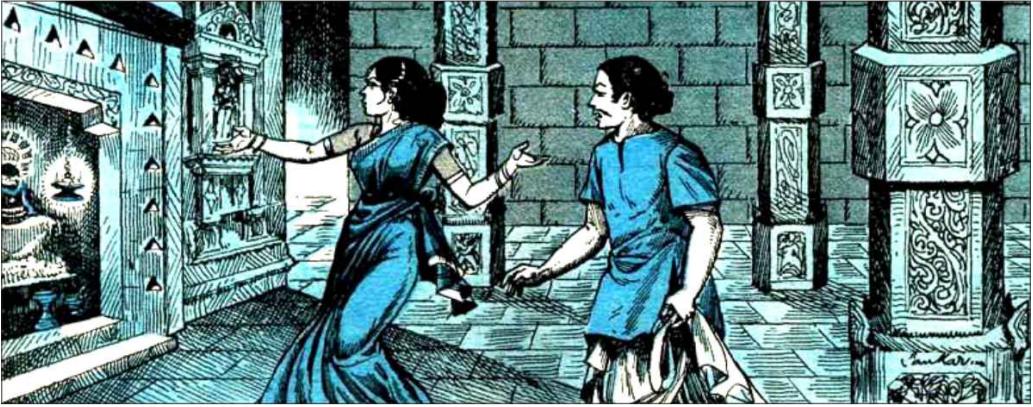
পাওয়া

কোনো এক গ্রামে অমর নামে এক গরিব চাষি ছিল। তার প্রথম সন্তান হল এক অন্ধ মেয়ে। অমর আর তার বউ তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য ভীষণ দুঃখ পেল। ওরা ওই মেয়ের নাম রাখল মল্লিকা।

মল্লিকার বয়স বারো বছর হতে-না-হতে অমরের মোট ছ-টি সন্তান হল। অমর আর পারছিল না সংসারের ভার বহন করতে। মল্লিকাও অন্ধ। সে কোনো কাজেই সাহায্য করতে পারে না। একদিন অমর ও তার বউ যে কথা বলছিল তা হল: আমাদের আর দিন চলছে না। এই অন্ধ মেয়েটাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে কী হবে? ওর কোনোদিনই বিয়ে হবে না। সারাজীবন আমাদের ঘাড়ে বসে খাবে। তার চেয়ে তাকে যদি কোথাও ছেড়ে আসি তাহলে তার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

পরের দিন অমর মল্লিকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার বুক ভার হয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা একটি গ্রামে পৌঁছাল। সেখানে একটা খাল ছিল। সেই খালে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় জল থাকত না। ওই সময় খালে জল ছিল না। অমর ওই খালে নেমে বসে কাপড়ের খুঁটিতে যে নিংড়ানো পান্তাভাত বেঁধে এনেছিল তা মেয়েকে খাওয়াল। পরে নিজে খেল। কাছে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরের জল নিজে খেয়ে মেয়েকে খাওয়াল।

রাত্রে ওরা দু-জনে ওই খালেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওরা দু-জনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সকালে উঠে অমর মল্লিকার দিকে তাকাল। ওই মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অমরের চোখ ছল ছল করে উঠল। সে মেয়েটাকে চুমু খেয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা জেগে উঠে 'বাবা' বলে চিৎকার করে উঠল। তার বাবা যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে সে-কথা সে ভাবতেই পারেনি। দু-চার বার ডেকে যখন সাড়া পেল না তখন ভাবল তার বাবা খাবার আনতে কোথাও গেছে।

হাত বাড়িয়ে বালি ঘেঁটে ঘেঁটে কয়েকটা পাথরের টুকরো বের করে খেলার জন্য গুছিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ পরে তার মধ্যে চার পাঁচটা টুকরো কাছে রেখে বাকিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল। ওই ক-টা দিয়ে সে খেলতে লাগল। অনেকেই খালের পাশ দিয়ে যাতায়াত করছিল। কিন্তু কেউ মল্লিকার দিকে তেমন কৌতূহলী হয়ে তাকাল না। অমর মেয়ের কাছ থেকে যত দূরে যেতে লাগল তত তার মনে নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। বেচারি, মল্লিকা হয়তো জেগে উঠে আমাকে কাছে না পেয়ে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে হয়তো ভাসিয়ে দিচ্ছে। ছ-টা ছেলে-মেয়ে যখন আছে তখন এই একটা মেয়েই কি আমার কাছে ভারী হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে অমরের পাগুলো অবশ হয়ে গেল। পা আর সামনের দিকে এগোতে চাইছে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেয়ের কাছে এসে দেখে মেয়ে পাথরের টুকরো নিয়ে আপন মনে খেলা করে চলেছে। তার হাতের ওই পাথরগুলোর মধ্যে একটা ছিল হিরা। হিরা জ্বলছে।

অমরের মন আনন্দে ভরে গেল। 'মা, মাগো, মা মল্লিকা!' বলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সোমদেবের ভাগ্য

রাজকুমার সোমদেব সমুদ্র যাত্রা করা কালীন সমুদ্রের তলদেশের একটি শিলাখণ্ডে আঘাত পেয়ে তার নৌকা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শেষে একটা ডিঙার মতো কাঠ পেয়ে কোনোরকমে সে তীরে আসতে পেরেছিল। নিজেই আসতে পারল অন্যেরা ভেসে গেল সমুদ্রের গভীরে।

দু-দিন ওই কাঠে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একটা দ্বীপে উঠল। তার গায়ে লাগল সূর্যের কিরণ। শরীর গরম হল। সোমদেবের জ্ঞান আস্তে আস্তে ফিরে এল। জ্ঞান হবার পর সোমদেব বুঝল সে একা পড়ে আছে। শরীর খুব দুর্বল। নড়তে চড়তে পারছে না। কোনোরকমে উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাল। যে দিকে তাকায় আলুর খেত। সবুজের আস্তরণ। হাঁটতে গিয়ে সোমদেব মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তার পর যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখে সে একটি বিছানায় শুয়ে আছে। তার পাশে একটা বল্লমধারী বিচিত্র মানুষ। তার চোখে-মুখে অদ্ভুত কুটিল হাসি।

'আমি কোথায়?' সোমদেব বলল।

'আলুপুরের রাজা পাটুঙ্গা মহারাজের মহলে।' বলল ওই বিচিত্র লোকটা।

সোমদেব হাত-পা নাড়তে গিয়ে দেখল তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

'আমাকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?' সোমদেব জিজ্ঞেস করল।

'পাটুঙ্গা মহারাজের নির্দেশে বেঁধে রাখা হয়েছে। তুমি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছ। অনধিকার প্রবেশকারীকে যে দণ্ড দেওয়া হয় সেই মৃত্যুদণ্ড তোমাকে দেওয়া হবে।' লোকটা বলল।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সোমদেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মণিদ্বীপের রাজকুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে বাড়ির সবাইকে নিয়ে সে সানন্দে বেরিয়েছিল। নৌকা যাত্রায় বেরিয়ে তার এই হাল হল। এখন মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
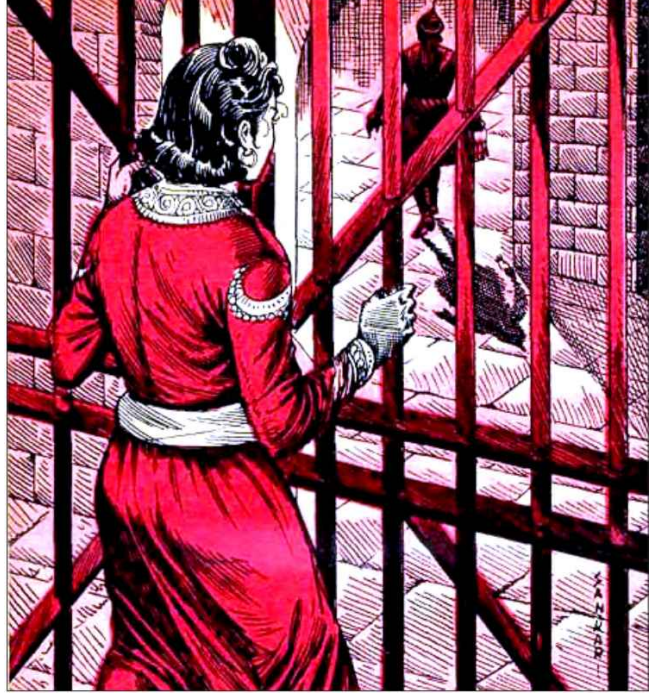
অনেকক্ষণ পরে একজন এসে তার বাঁধন খুলে দেবার চেষ্টা করতেই সোমদেবের ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সোমদেবকে নিয়ে একটা কারাগারে নিক্ষেপ করা হল।

'তুমি আমাকে এখানে আনলে কেন?' সোমদেব প্রশ্ন করল।

'আজ পর্যন্ত তুমি রোগশয্যায় ছিলে। এখন তোমার অসুখ সেরে গেছে। এখন তোমাকে বন্দি করা হল।' বলল লোকটা। অন্ধকার ঘরে পুরে দিয়ে তালা লাগিয়ে লোকটা চলে গেল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সোমদেব।

কিছুক্ষণ পরে মনে হল দেওয়ালে কে যেন ঠুকছে। সোমদেবও ঠুকল দেওয়ালে। তারপর দেওয়ালে ওপার থেকে দু-বার ঠোকার আওয়াজ শোনা গেল।

সোমদেব দেওয়ালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কোথাও কোনো ফুটো নজরে পড়ল না।

সোমদেব কোমর থেকে ছোরা বের করে দেওয়ালের একা টাইল অনেক কষ্টে বের করে ফেলল। সেই ফুটো দিয়ে দেখতে পেল দেওয়ালের ওপারে আছে অপূর্ব এক সুন্দরী। চোখে-মুখে-চুলে রুক্ষ ভাব। পোশাকের অবস্থাও ওই ধরনের। তাকে দেখে অবশ্য মনে হয় যে সে এক রাজকুমারী।

'কে তুমি?' সোমদেব প্রশ্ন করল।

'আমি হতভাগিনী। মণিদ্বীপের রাজকুমারী। কিন্তু তুমি কে বলত?' যুবতী প্রশ্ন করল।
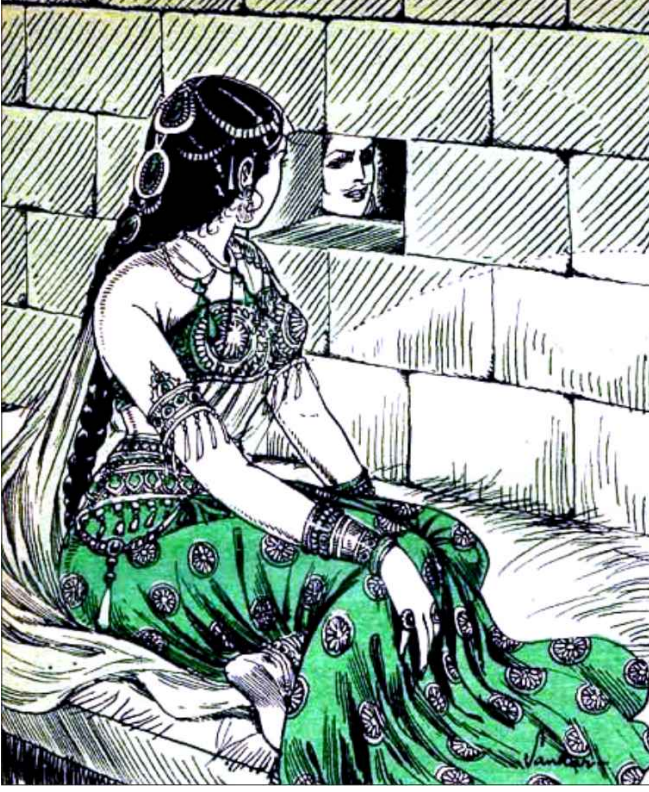
তরুণীর কথা শুনে সোমদেব একদিকে যেমন দুঃখে কাতর হয়ে গেল তেমনি অন্য দিকে খুশিও হল। সেই তরুণীকে দেখে সোমদেবের আর কোনো সন্দেহ রইল না যে সে মণিদ্বীপের রাজকুমারী হিরাবতী।

'আমি এক হতভাগা রাজকুমার। আমার নৌকা ঝড়ে-জলে নয় পাথরে আঘাত পেয়ে ভেঙেচুরে গেছে। তারপর ভাসতে ভাসতে এসেছি এই দেশে। আচ্ছা তুমিই বা এই বিচিত্র দেশে এলে কী করে?' সোমদেব প্রশ্ন করল।

'আমারও ওই একই অবস্থা। আমারও নৌকা ভেঙে গেছে। আমি আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার বাড়ি যাচ্ছিলাম। শেষে এক বিপর্যয়ের ফলে এখানে এসে পড়েছি। এই দেশের রাজার এক চোখ কানা। লোকটা কুঁজো। আমাকে দেখেই সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তার ফলে আমার এই অবস্থা। আমাকে এরা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এরা যে আমাকে নিয়ে কি করবে আমি তা জানি না। যাই করুক আমার আপত্তি নেই। ওই রাজাকে বিয়ে করার চেয়ে আমার মৃত্যু হোক ক্ষতি নেই।' হিরাবতী অশ্রুসজল চোখে বলল।

ঠিক তখনই কার আসার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সোমদেব তাড়াতাড়ি ইট রেখে ওই ফুটো বুজিয়ে দিল। লোকটা খাবার এনে কারাগারের ওই কোঠরে রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সোমদেব ওই ফুটো দিয়ে রাজকুমারীকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই দেশের ব্যাপারে কোনো কিছু জানা আছে।'

এই দেশে আসার পর রাজা আমাকে খুব খাতির করেছিল। যেখানে খুশি আমাকে যেতে দিত। ইচ্ছে মতো ঘুরেছি-ফিরেছি। এদেশের সম্পদ বলতে একটাই আছে। তা হল আলু। এখানকার একমাত্র ব্যাবসা আলুর। এখানকার আলু বিদেশে চালান যায়। আলু বিক্রি করে এরা যা পায় তাই দিয়ে এদের চলে। ভালোই রোজগার হয় এদের। এরা আলু ছাড়া আর কিছুই খায় না। আলুর নানান

ধরনের তরকারি বানায়। অনেক রকমের আলুর রান্না এরা পারে। ইতিমধ্যে ওই রান্না আশা করি খাওয়া হয়েছে।' বলল হিরাবতী।

'আমি এই দ্বীপে পা রেখেই দেখতে পেয়েছি শুধু আলুর খেত। সবুজের বাহার। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে এই দেশ। যেদিকে তাকাই সবুজের মেলা। আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। আমি এক বন্ধুর কাছে একটা জাদু শিখেছি। একটু সাহায্য করলে দু-জনে এদের জোয়াল থেকে ছাড়া পেতে পারি।' বলল সোমদেব।

'আমাকে যা করতে বলা হবে তাই করব এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য।' বলল হিরাবতী।

'এবারে খাবার দিতে এলে লোকটাকে বলতে হবে, আমার মতের পরিবর্তন ঘটেছে। আমি আপনাদের রাজাকে বিয়ে করতে রাজি আছি। আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি। তবে আমাকে একটি মাস সময় দিতে হবে। এ-কথা বললে রাজা আগের মতো ঘোরার সুযোগ দেবে। যেখানে খুশি ঘোরার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। যা চাওয়া যাবে রাজা তাই দিতে রাজি হবে। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই আমার কাজ আমি শুরু করে দিতে পারব।' সোমদেব বলল।

রাজকুমারী সোমদেবের কথামতো কাজ করে কারাগার থেকে মুক্তি পেল। রাজা হিরাবতীকে ভীষণ ভালোবাসতে লাগল। যা চাইত তাই দিতে রাজি হত। সোমদেবের চাহিদা অনুসারে রাজকুমারী তাকে একটু সোনা এনে দিল।

সোমদেব ওই সোনা পাহারাদারকে উপহার দিয়ে বলল, 'দেখ ভাই, আমাকে জল খাবার জন্যে যে গেলাস দিয়েছ সেটা খুব ছোটো। আমার জন্য দুটো বড়ো বড়ো কাচের গেলাস এনে দাও। তোমার পুণ্য হবে।'

সোমদেবের কথা শুনে পাহারাদার ধারণা করেনি যে তাতে কোনো ক্ষতি হতে পারে। সে তাকে দুটো কাচের গেলাস এনে দিল। এ ছাড়া আরও দু-একটা ফাইফরমাস খাটল ওই পাহারাদার।

'তোমার দেশের আলু খুব সুন্দর। চমৎকার দেখতে তোমার দেশ।' সোমদেব বলল।

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের দেশে যে ধরনের আলু হয় সেই ধরনের আলু পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় না।' পাহারাদার বলল।

'কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমি ইচ্ছে করলে তোমার দেশের সমস্ত আলু নষ্ট করে দিতে পারি। আলু আমার কথামতো চলে। আমি যদি বলি আলু থেমে যা, আলু থেমে যাবে। আমি যদি বলি আলু মরে যা আলু মরে যাবে। আমি যদি বলি আলু হসনি, আলু হবে না। কাল আমি তোমাকে দেখাব। তুমি চোখ বড়ো বড়ো করে দেখবে আলু কেমন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো আমার কথা শোনে। তুমি ইচ্ছে করলে কাল তোমার রাজাকেও সপরিবারে আনতে পার। আমি তোমার রাজাকেও আমার কথামতো আলু চলে কি না দেখাব।' সোমদেব বলল।

সোমদেবের কথা রাজার কানে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। পরদিন সকালেই রাজা কারাগারে চলে এলেন সোমদেবের ক্ষমতা দেখার জন্য।

সোমদেব প্রথমে খালি গেলাস দেখাল রাজাকে। রাজার সঙ্গে যারা ছিল তারাও দেখল। রাজার হাত থেকে আলু নিয়ে গেলাসের জলে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। আলু আস্তে আস্তে গেলাসের নীচের দিকে নাবতে লাগল। আলু গেলাসের মাঝামাঝি আসতেই সোমদেব চিৎকার করে হুকুম করার মতো বলল, 'থেমে যাও।' আলু আর নীচে নামল না। মাঝামাঝি জায়গায় থেমে গেল। প্রত্যেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চোখ বড়ো বড়ো করে। তারপর সোমদেব ওদের বলল, 'আপনারা সচক্ষে দেখলেন আলু আমার কথা কত তাড়াতাড়ি শোনে। আমি মন্ত্র পাঠ করে আলুকে যা বলব আলু তাই করবে।' তারপর সোমদেব গেলাসটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিমা করে আলুকে নাবতে বলে। আলু গেলাসের নীচে নেমে যায়।

রাজা এ দৃশ্য দেখে আর কাল বিলম্ব না করে বলল, 'ওরে কে আছিস। একে ছেড়ে দে। এ যা চায় তাই একে দিয়ে দে। এ লোকটা রেগে গেলে আমাদের আলুর সর্বনাশ করে দেবে। আর আলু না থাকলে আমরা মরে যাব।'

কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে রাজার লোক সোমদেবকে প্রণাম করল। রাজা নমস্কার করে সোমদেবকে বলল, 'আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে যতদিন ইচ্ছে থাকুন। আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা করুন। আপনি যা চান এখান থেকে নিয়ে যান।' রাজা গদগদ কণ্ঠে বললেন।

তারপর রাজা সোমদেবকে পালকি করে নিয়ে গেল। বহু উপহার দিয়ে বলল, 'আপনি আর কী চান বলুন। যা ইচ্ছে নিতে পারেন।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। একটা ভালো নৌকা বানাতে হবে ব্যবস্থা করে দিন।'

তারপর সে হিরাবতীর দিকে ফিরে বলল, ‘তুমি কী চাও? তুমি কি রাজাকে বিয়ে করে এখানে থাকতে চাও?’

‘আজ্ঞে, আমি এই রাজাকে বিয়ে করতে চাই না। আপনার স্ত্রী হিসেবে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আপনার সঙ্গে চলে যেতে চাই এখান থেকে।’ হিরাবতী বলল।

এক সপ্তাহ পরে আলুপুর থেকে একটি নৌকা ছাড়ল। তাতে ছিল সোমদেব ও হিরাবতী।

জলপথে যেতে যেতে একদিন হিরাবতী সোমদেবকে প্রশ্ন করল, ‘আমি বুঝতে পারলাম না কেমন করে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি তো শুধু একটু নুন দিয়েছিলাম। আর তো কিছু দিইনি। আলু থেমে গেল কী করে মাঝ পথে?’

‘খুবই সহজ ব্যাপার। যে নুন চেয়েছিলাম তা জলে গুলে ফেললাম। জল গাঢ় নুন জল হয়ে গেল। অন্য একটা কাঁচের গেলাসে সাধারণ জল রেখেছিলাম। অর্দ্ধেক জল। নোনা জল আস্তে আস্তে তাতে ঢাললাম। নোনা জল আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। সাধারণ জল উপরে উঠে গেল। দুটো জলের সীমারেখার কাছে যখন আলুটা নেমে এল তখন আলুটাকে থেমে যেতে বললাম। অত ছোটো আলু গাঢ় জলে নামতে পারল না। তাই সেটা নোনা জলে ভাসতে লাগল। তারপর মন্ত্র পড়ার ভান করে আস্তে আস্তে নেড়ে দিলাম। নোনা জল সাদা জল মিশে গেলে আলু নেমে গেল।’ সোমদেব বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

সোমদেবের কথা শুনে রাজকুমারী হিরাবতী তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
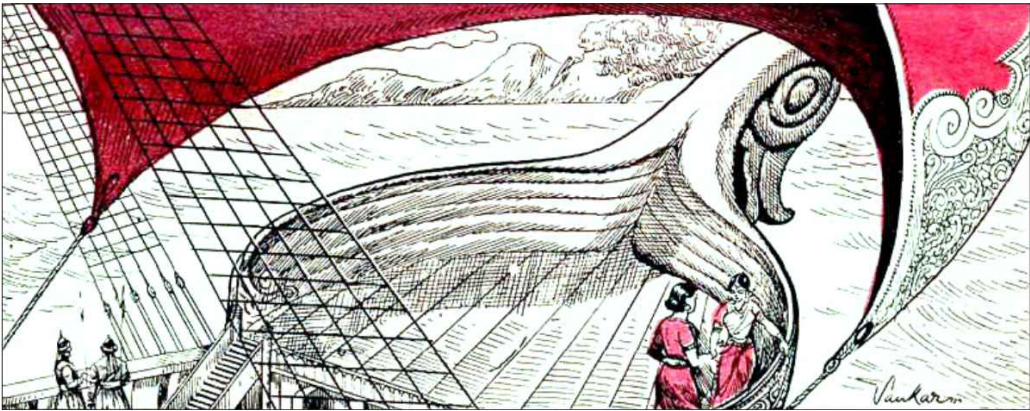
ছাগলের গান

সেকালের কথা। তখন ব্রহ্মদেশের রাজা ছিলেন এক সংগীত রসিক মানুষ। রাজা স্ফটিক শিলা দিয়ে এক সুন্দর মহল তৈরি করালেন।

ওই মহলের পাশ দিয়ে যারা যেত তারা একবার ওই মহলের দিকে অবাক হয়ে তাকাত। হাত দিয়ে ওই মহলের দেয়াল ছুঁয়ে নিত।

এইভাবে দেয়ালে প্রত্যেকে হাত দিলে দেয়ালে দাগ পড়ে যাবে ভেবে রাজা পাহারার ব্যবস্থা করলেন। কেউ যেন দেয়ালে হাত না দেয়।

শীতকালে একজন সেপাই পাহারা দিচ্ছিল ওই মহলে। খুব ঠান্ডা পড়েছিল সেই রাতে। সেপাই মনে মনে ভাবল, সবাই কেমন সুন্দর বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর তাকে কাঁপতে কাঁপতে পাহারা দিতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেপাই ভাবল, এই সময় যদি আমি বিছানায় ঘুমাতাম আর রাজাকে এখানে, এই ঠান্ডায় পাহারা দিতে হত তাহলে বেশ হত। একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে সে একটা কাঠকয়লার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে চটপট দেয়ালে লিখে ফেলল :

পয়সা যাদের পৃথিবী তাদের,
গরিব মানুষ কাঙাল পথের।

নিজের লেখা দেখে সেপাইয়ের খুব আনন্দ হল। একটা মনের কথা এত দিনে প্রকাশ্যে লিখে দিতে পেরেছে বটে। রাজা যে তাকে কেন পাহারা দিতে বসিয়েছেন তাও সে ভুলে গেল।

সকালে রাজকর্মচারীরা দেয়ালের লিখন পড়ে তো অবাক। তারা ছুটে গেল রাজার কাছে। জানাল ওই লিখনের কথা। রাজা সেই রাতের পাহারাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেয়ালে ওসব আজেবাজে কথা কে লিখেছে?'

'আমি লিখেছি মহারাজ। আমি মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করি তাই দেয়ালে লিখে ফেলেছি।' সেপাই সাহসে বুক বেঁধে বলল।

'ও, তুমি তাহলে শুধু টাকা-পয়সা চাও?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি টাকা-পয়সা চাই।' সেপাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

'ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব।' রাজা বললেন।

রাজার ছিল শত শত একর জমি। উদ্যানও ছিল বহু। তার একটি উদ্যানের একটি অন্ধকার কক্ষে সোনা আর রুপো ভরে দিয়ে সেপাইকে ওই কক্ষে রাখার নির্দেশ দিলেন রাজা।

রাজার এই নিষ্ঠুর কাজ তাঁর মেয়ের নজরে পড়ল। রাজকুমারী ভাবতে লাগল কীভাবে সেপাইকে সাহায্য করবে।

ওই নগরে একজন স্বর্ণকার ছিল। রাজকুমারী ওই স্বর্ণকারের কাছে গোপনে গিয়ে তাকে সব কথা বলল। স্বর্ণকার ভেবে-চিন্তে একটা পরিকল্পনা করল। ওই কক্ষের এক কোণে সিঁধ কাটল। ওই জায়গা দিয়ে প্রত্যেক দিন সেপাইকে খাবার দিত স্বর্ণকার।

সেপাইয়ের উপর রাজার অত্যাচার যত বাড়তে থাকে তার প্রতি রাজকুমারীর দরদ তত বেড়ে যায়। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল স্বর্ণকারের সাহায্যে যেকোনোভাবে সেপাইকে মুক্ত করবে।

প্রত্যেক দিন কিছু কিছু সোনা ও রুপো ওই সিঁধ কাটা জায়গা থেকে বের করিয়ে স্বর্ণকারকে দিল।

সেই সোনা-রুপো দিয়ে একটা ছাগল বানাল। এমন ছাগল যা মধুর গান গাইতে পারে। শেষে ওই ছাগলটাকে আরও বড়ো সিঁধ কেটে ওই কক্ষে ঢুকিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরে মনমরা হয়ে বসে থাকত সেপাই। তারপর থেকে সে ছাগলের গান শুনতে লাগল। তার মনও কিছুটা হালকা হল।

একদিন রাজা বেড়াচ্ছিলেন ওই উদ্যানে। শুনতে পেলেন ছাগলের মধুর গান। রাজা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না গান কোথা থেকে ভেসে আসছে।

পরের দিন রাজা রাজকুমারী ও মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এলেন ওই উদ্যানে। সেদিনও রাজার কানে গেল সেই মনমাতানো সুমধুর গান।

রাজা যে কোনো দিন একটা সেপাইকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। গানের আওয়াজ ধরে ধরে রাজা ওই কক্ষের কাছে গেলেন। কক্ষের দরজা খুলিয়ে দেখেন সেখানে একটা ছাগল রয়েছে।

রাজা সেই সোনা-রুপোর ছাগলটাকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। ছাগলের ভিতরের যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ছাগলের ভিতরের যন্ত্রপাতি দেখা সম্ভব হল না। তখন ডাক পড়ল স্বর্ণকারের। স্বর্ণকার এসে সব খুলল। রাজা দেখলেন ছাগলের পেটে একটা যুবক! রাজা চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

'মহারাজ, আমি একদিন লিখেছিলাম:

পয়সা যাদের পৃথিবী তাদের,
গরিব মানুষ কাঙাল পথের।

কিন্তু এতদিন পরে আমার সেই ধারণা বদলে গেছে।'

রাজা তার পিঠে চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করলেন।

'তাহলে এখন তোমার ধারণা কী।'

'জীবনে দ্বিতীয় মহৎ বিষয় হল, বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করা।' সেপাই বলল।

'দ্বিতীয়টি তো শুনলাম। কিন্তু প্রথমটি বললে না তো!' রাজার প্রশ্ন।

'এই জগতে একজন পুরুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন একজন নারীর গভীর ভালোবাসা।' সেপাই সলজ্জ দৃঢ়তায় বলল।

এ-কথা শুনে রাজকুমারীর চোখ-মুখ-কান লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

রাজা রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে অনুমান করলেন যে তাঁর মেয়ে সেপাইকে ভালোবাসে।

পরক্ষণেই রাজা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। জাঁকজমক সহকারে রাজকুমারীর বিয়ে হল ওই সেপাইয়ের সঙ্গে।

বিচিত্র পরীক্ষা

এক রাজার দুই রানির দুই পুত্র ছিল। কয়েক বছর পরে বড়ো রানি মারা গেল। রাজার দুই ছেলে বড়ো হতে লাগল। ছোটো রানি অনুমান করল যে রাজা বড়ো রানির ছেলেকেই যুবরাজ করার তালে আছেন। তা যাতে না করতে পারেন তারজন্য অনেক ভেবে ছোটো রানি তাঁকে বলল, 'বড়ো রাজকুমারকে রত্নগিরির রাজকুমারীর সঙ্গে যাতে বিয়ে হয় তারজন্য পাঠিয়ে দিন। রাজকুমারীকে বিয়ে করেই যেন সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।'

রত্নগিরির রাজকুমারীকে বিয়ে করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো রাজকুমার ফিরে আসতে পারেনি। তা জেনেও ছোটো রানিকে খুশি করার উদ্দেশ্যে রাজা বড়ো ছেলেকে পাঠাবেন ঠিক করলেন।

বড়ো রাজকুমার রত্নগিরির রাজকুমারীর কথা শুনে ছিল। তবু সে সাহসে বুক বেঁধে রওনা দিল রত্নগিরির দিকে।

রত্নগিরি রাজ্যে ঢুকে রাজকুমার এক সরাইখানায় থেকে রাজকুমারীর ব্যাপারে খোঁজখবর নিল। জানতে পারল যে রাজকুমারী যে পানীয় দেয় ওই পানীয় খেয়ে রাজকুমারগণ পাথর বনে যায়। ওই পাথরের মূর্তিগুলো সুড়ঙ্গে ফেলে রাখা হয়।

সরাইখানায় লোক জানতে পারল যে প্রশ্নকর্তা একজন রাজকুমার। ওই দেশের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসেছে। তারা তাকে বলল, 'বাবা, অহেতুক তুমি কেন পাথর হতে যাচ্ছ? তার চেয়ে অন্য কোনো রাজকুমারীকে বিয়ে করে সুখে থাক না কেন?'
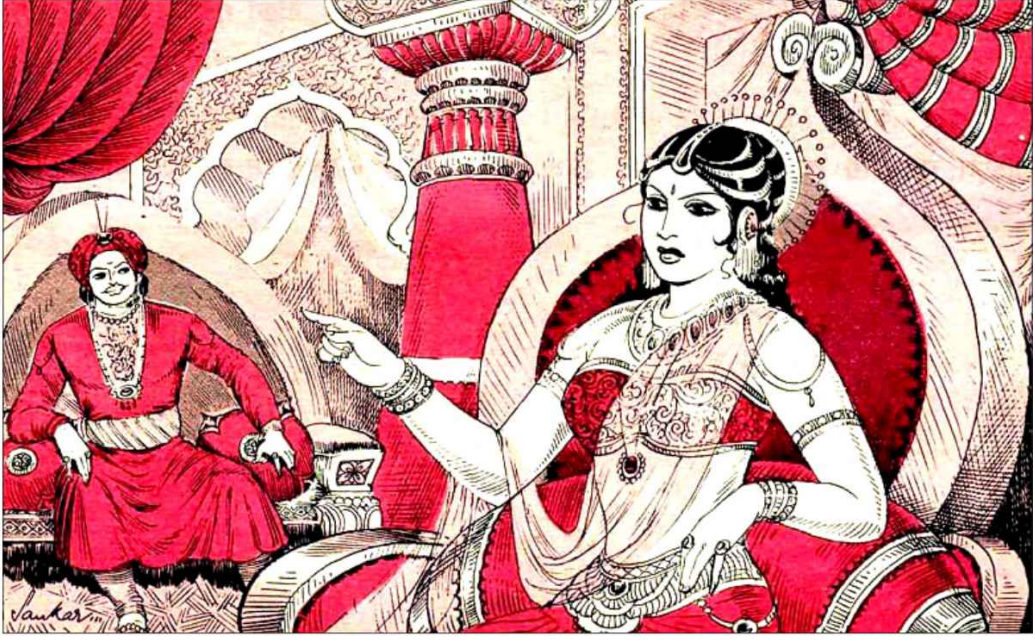
কিন্তু রাজকুমার তাদের উপদেশে কান দেয়নি। রাজকুমারী সম্পর্কে লোকের মুখে যা শুনল রাজকুমারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। জেনে-শুনে রাজকুমাররা কেন ওই পানীয় পান করে? কেন সমস্ত রাজকুমারকে পাথরের মূর্তি বানায়? কার নির্দেশে হয় এসব; এই ধরনের প্রশ্ন রাজকুমারের মগজে তোলপাড় করতে লাগল। রাজকুমার মনে মনে ঠিক করল এই সব প্রশ্নের সঠিক সমাধান যতদিন না পাচ্ছি ততদিন আমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাব না। ভেবে-চিন্তে সব ঠিক করে নিয়ে রাজকুমার সোজা গেল রত্নগিরির রাজকুমারীর কাছে। বলল, 'আমি তোমায় বিয়ে করতে এসেছি।'

'আমাকে বিয়ে করার আগে একটা রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনুন। ওই রাক্ষস কোথায় আছে কীভাবে আছে সব বিস্তারিত ভাবে বলছি। মন দিয়ে শুনতে হবে। সাত সমুদ্রের ওপারে একটা নীল পাহাড় আছে। ওই পাহাড়ের একটা গুহা দিয়ে সবসময় ধোঁয়া বেরোয়। ওই গুহার ভিতরে ঢুকে এগিয়ে গেলে একটা রাক্ষস দেখতে পাওয়া যাবে। ওই রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনতে হবে। ঘুমন্ত অবস্থায় রাক্ষসের মুণ্ডু কাটা যায় তবে ওর প্রাণ আছে একটা টিয়া পাখির মধ্যে। ওই টিয়া থাকে অন্য পাহাড়ে। ওই পাহাড়ের পুব দিকে একটা লাল পাহাড় আছে। ওই পাহাড়ের একটা গাছের খোপে ওই টিয়া থাকে। ওই টিয়ার গলা কেটে দিলেই রাক্ষস মারা যাবে। তারপর রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনতে হবে।' রাজকুমারী বলল।

'আমি নিশ্চয় আনতে পারব।' রাজকুমার বুক টান করে বলল।

'তাহলে আপনি একটা পানীয় খেয়ে যান। আপনাকে যে কাজ করতে বলেছি সেই কাজ করার ক্ষমতা যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে এই পানীয় খেয়ে আপনার

কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি তা না থাকে পাথর বনে যাবেন। সুড়ঙ্গে ফেলে রাখা হবে।' রাজকুমারী বলল।

রাজকুমার ওই পানীয় পান করতে রাজি হল। রাজকুমারীর দেয়া পানীয় রাজকুমার সানন্দে গ্রহণ করে পান করে নিল। কিন্তু রাজকুমার পাথর হল না।

'কই আমি তো পাথর হইনি। তাহলে আমি ওই কাজের উপযুক্ত। চলি নিজের কাজে।' এ-কথা বলে রাজকুমার উঠে দাঁড়াল।

'যেতে হবে না কোথাও। পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। রাক্ষস আর টিয়ার গল্প আমার কল্পিত। আমার কথামতো কাজ করতে যে বীর প্রস্তুত থাকে তাকেই বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত। যাদের আমি আজ পর্যন্ত এই পানীয় দিয়েছি কেউ তা পান করেনি। সবাইকে সুড়ঙ্গে বন্দি করে রেখেছি।' রাজকুমারী বলল।

তারপর বেশ ঘটা করে বিয়ে হল ওই রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর। বিয়ে করতে আগে যেসব রাজকুমার এসেছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার রত্নগিরি থেকে ফিরে গেল নিজের রাজ্যে। রাজা খুশি হলেন। ছোটো রানি ভীষণ দুঃখ পেল। রাজা বড়ো রানির পুত্র, রত্নগিরির রাজকুমারীকে বিয়ে করে আনা বীর রাজকুমারকেই সিংহাসন বসালেন।

লেখাপড়ার বড়ি

প্রাচীন কালে কোনো এক গ্রামে ছিলেন এক পণ্ডিত। লোকটা নামেই পণ্ডিত। লেখাপড়ার নামে ঢুঁঢু। অথচ তার ইচ্ছা জাগল লেখাপড়ার ব্যাবসা করবে। নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে প্রচার করতে হবে। প্রচারের কাজে সুবিধার জন্য সে অনেকগুলো বই কিনে সাজিয়ে রাখল। মাত্র পাঁচ-ছ-টা বই নিয়ে ছাত্র পড়াত। অন্য বইগুলো নিজেই পড়েনি তা অন্যদের পড়াবে কী করে।

কিন্তু প্রত্যেক দিন অনেক ছাত্র আসে, তার কাছে পড়ে যায়, অতএব ক্রমশ লোকের কাছে পণ্ডিত হিসেবেই প্রচারিত হতে লাগল। কেউ তাকে বলে পণ্ডিত। আর যারা ছাত্রজীবন থেকে দেখে আসছে তারা তাকে যেন কোনোক্রমেই পণ্ডিত বলতে রাজি নয়। ছাত্ররা পণ্ডিতমশাইকে কলাটা মুলোটা দিতে লাগল। পণ্ডিতমশাই নামেই সে পরিচিত হয়ে উঠল।

একবার রামানন্দ নামে এক ছাত্র তার কাছে পড়তে এল। ছেলেটি বুদ্ধিতে ছিল প্রখর। ওরকম মেধাবী ছাত্র তার আগে ওই পণ্ডিতের কাছে কেউ আসেনি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ছাত্রটি বুঝতে পারল যে তার পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্যের দৌড় বেশি নয়। ছাত্রজীবনে শেখা বুলিগুলোই আওড়াচ্ছেন। রামানন্দ কয়েক দিনের মধ্যেই পণ্ডিতমশাইয়ের ওই পাঁচ-ছ-টা বই পড়ে শেষ করে ফেলল। রামানন্দ আরও পড়তে চায় অনেক বই। কিন্তু পণ্ডিত অন্য বই দিতে চায় না। পণ্ডিত তাকে গুছিয়ে রাখা বইগুলোতে কাউকে হাত দিতে দিত না। ফলে রামানন্দের জ্ঞানপিপাসা মিটত না। আরও বাড়ত। রামানন্দের মতো মেধাবী ছাত্র পেয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের হয়েছে

এক সমস্যা। ছাত্রদের যা বলে রামানন্দ তা মনে রাখে। বইয়ের কথা মুখস্থ করে, আবার বইয়ের বাইরে পণ্ডিতমশাই যা বলে তাও রামানন্দ ভোলে না। একবার যা শোনে তা মনে গেঁথে রাখে। যেকোনো মূর্খ-পণ্ডিতের পক্ষে রামানন্দের মতো ছাত্র একটি সমস্যা।

পণ্ডিত ভাবতে থাকে এতখানি বুদ্ধি রামানন্দের হয় কী করে! নিশ্চয় এর পিছনে কোনো রহস্য আছে। কোনো কিছু না থাকলে কিছুতেই এত চটপট সব কিছু শিখে ফেলতে পারে না। পণ্ডিত ছাত্রদের গোপনে বলল, 'তোমরা রামানন্দের উপর গোপনে নজর রাখো তো। ও কোথায় যায় কী করে সব দেখে আমাকে জানাবে।'

সকালে ছুটির পর রামানন্দ কাছের বনে যায়। গাছের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পড়া মুখস্ত করে। দুপুরে রুটি খেয়ে জল খায়। ছাত্ররা দূর থেকে রামানন্দকে অনুসরণ করে পণ্ডিতের কাছে এসে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, রামানন্দ মন্ত্র পড়ে আর কী যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।'

মূর্খ-পণ্ডিত ভাবল, এবার ঠিক ধরা পড়বে। রামানন্দের বুদ্ধি গজিয়ে ওঠার রহস্য ভেদ করব।

অন্ধকার হওয়ার আগেই রামানন্দ ঘরে ফিরে এল। তাকে একটা থামে বেঁধে পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার রহস্য আমি জানতে পেরেছি। তুমি মন্ত্র জানো। আর তোমার কাছে কী একটা ওষুধ আছে। তুমি এই দুটোর জোরে আমি যা শেখাই তার চেয়ে অনেক বেশি শিখে নিতে পার। তুমি ওই মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দাও, ওষুধ আমাকে দাও, তাহলে আমি ছাত্রদের অনেক বেশি বিদ্যা দান করতে পারব।'

পণ্ডিতের কথা শুনে রামানন্দ অবাক হয়ে গেল। তাকে জানাল যে তার কাছে কোনো ওষুধ নেই, মন্ত্রও সে জানে না।
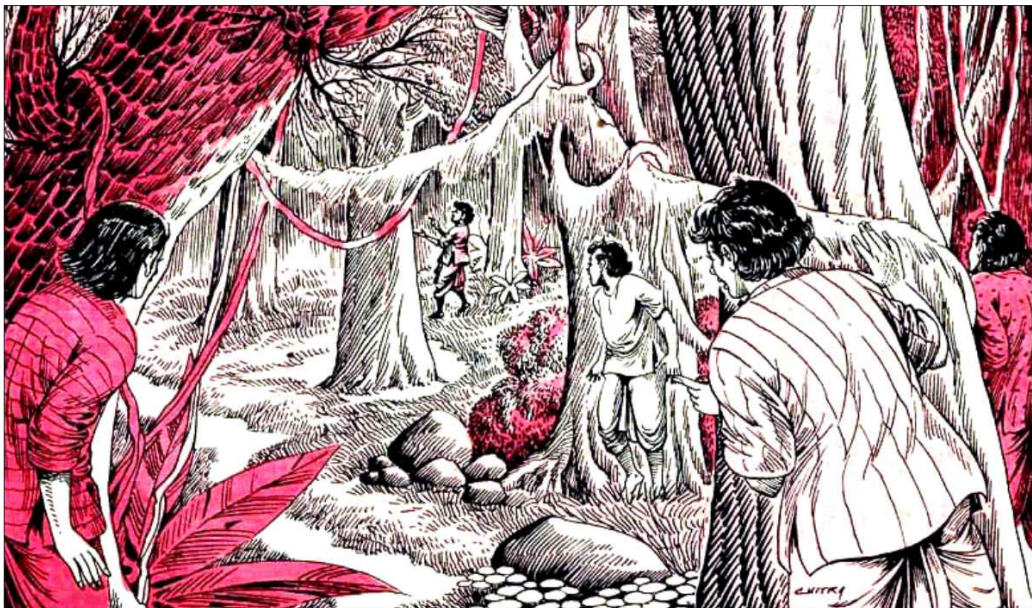
পণ্ডিত রেগে গিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি! আমি জানি না ভেবেছ? তুমি সারাদুপুর গাছের কাছে ঘোরাঘুরি করে মন্ত্র পড় না? দুপুরে পুকুরের ধারে বসে লেখাপড়ার বড়ি খাও না? ওসব বড়ি না দিলে আমি তোমার মাথা নেব।'

রামানন্দ মনে মনে ভাবল যে সে তাকে যতটা মূর্খ ভাবত সে তার চেয়েও বড়ো মূর্খ। কী যেন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পণ্ডিতকে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি আমার সমস্ত গোপন ব্যাপার জেনে নিলেন। আপনার কাছে আর কিছু গোপন রাখা যাবে না। হ্যাঁ, সত্যি আমি মন্ত্র জানি। কিন্তু ওই মন্ত্র অন্য কাউকে শেখালেই আমি মারা যাব। তবে ওই মন্ত্র পড়ে লেখাপড়ার বড়ি তৈরি করে আমি অন্য কাউকে দিতে পারি। আমার কাছে যতগুলো বড়ি ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে তৈরি করতে হবে।'

'তাহলে বড়ি তাড়াতাড়ি তৈরি কর।' পণ্ডিত বলল।

'বড়িগুলো বানাতে খুব কম করে এক সপ্তাহ সময় লাগে। চার ভরি সোনা কম করে তিন দিন টানা আগুনে পোড়াতে হয়। তার সঙ্গে আমি যে বই পড়তে চাই সেই বইগুলোও আগুনে পোড়াতে হয়। তারপর ওই সোনা আর বইয়ের ছাই দিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে বড়ি বানাতে হয়। সেই বড়ি খেলেই ওই বইগুলোতে যা ছিল তা মাথায় ঢুকে যায়। ওই বইয়ের সারমর্ম আজীবন মাথায় থাকে।' রামানন্দ বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

'চার ভরি সোনা আর এমনকী। আমি দিচ্ছি। আর বই? ও তো তাকে অনেক আছে। যত চাও, নিতে পার। যত বেশি বড়ি করতে পার কর।' পণ্ডিত বলল।

রামানন্দ তাক থেকে সমস্ত বই নাবিয়ে আর চার ভরি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে পণ্ডিত ও অন্য ছাত্ররাও গেল। আগুন ধরানো হল। আগুনের এক কোণে চার ভরি সোনা রাখা হল। তিন দিন তিন রাত্রি মন্ত্র পড়তে রামানন্দ বসে গেল। পণ্ডিত ও অন্যান্য ছাত্ররা হাঁ করে দেখতে লাগল। রাত হল। ওরা রামানন্দকে কোনো কথা না বলে চুপি চুপি ফিরে গেল। রামানন্দ ওদের চলে যাওয়া পর্যন্ত কী যেন বিড়বিড় করে পড়তে লাগল। তারপর ওদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ আসন থেকে উঠে আগুন নিভিয়ে সোনা তুলে বই নিয়ে কাশীর পথে রওনা দিল উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায়।

শিক্ষকের কুশিক্ষা

কোনো এক গ্রামে এক জমিদার ছিল। তার ছিল মাত্র একটি ছেলে। জমিদার তার ছেলেকে লেখাপড়া করতে পাঠাল সিদ্ধাচার্যের কাছে। সিদ্ধাচার্য ওই গ্রামের নামকরা শিক্ষক। ছেলের বয়স বারো বছর হতেই তার লেখাপড়া শেখা শেষ হল। জমিদার অনেক উপহার দিয়ে গুরু বিদেয় করল।

সিদ্ধাচার্য অত্যন্ত লোভী ছিল। সে জমিদারের ছেলেকে গোপনে ডেকে বলল, 'তোমার বাবা আমাকে যা দেবার তা দিয়েছেন। কিন্তু তুমি তোমার নিজের যা আছে তা যতক্ষণ না দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার শিক্ষালাভ পূর্ণ হবে না। আমার এই কথা কারও কাছে প্রকাশ করা তোমার উচিত নয়।'

'আমার জন্মদিনে যা পেয়েছি তা আছে। আর সামান্য কিছু আত্মীয়স্বজনদের কাছে যা পেয়েছি তাও জমিয়ে রেখেছি।'

'তুমি ওই টাকাপয়সা নিয়ে মধ্যরাত্রে কালী মন্দিরে আসবে। তোমার অপেক্ষায় থাকব।' সিদ্ধাচার্য বলল।

সে রাজি হল গুরুর কথামতো কাজ করতে। কাছেই ছিল কালী মন্দির। মধ্যরাত্রে সিদ্ধাচার্য অপেক্ষায় বসে রইল।

তার আগেই একটা লোক সেই মন্দিরে এসে কাপড় মুড়ি দিয়ে এক কোণে শুয়ে ছিল। সিদ্ধাচার্য তাকে দেখতে পেল না। গা-ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকা ওই লোকটা ছিল পাশের গ্রামের এক কিষান। সেইদিন সকালেই সে আম বিক্রি করতে এসেছিল ওই জমিদারের গ্রামে। গ্রামে ঢুকতেই এক জ্যোতিষী ওই কিষানের
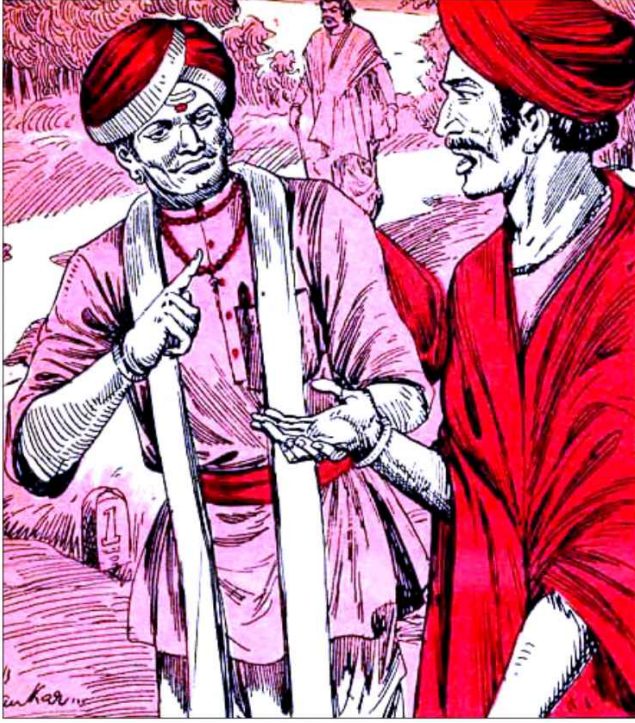
হাত দেখে বলল, ‘কোনো ব্যাপারে সাহসের পরিচয় দিলে তুমি লাভবান হবে।’

কিষান জ্যোতিষীর হাতে একটা সিকি দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

সকালে শাল মুড়ি দিয়ে বেড়ানো জমিদারের বরাবরের অভ্যেস। সে দূর থেকে জ্যোতিষী ও কিষানকে দেখল। কিষানকে জমিদার জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার বলত, তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে?’

‘জ্যোতিষী আজ আমাকে খুব ভালো একটা কথা বলেছেন। সাহসী হলে আমার নাকি খুব লাভ হবে। সাহসী হলে কী হবে না হবে তা ভগবানই জানেন, আমার এই আমগুলো তাড়াতাড়ি বেশি দামে বিক্রি হয়ে গেলেই আমি খুশি।’ কিষান জমিদারকে চিনতে পারেনি। কারণ জমিদারের আপাদমস্তক চাদরে মোড়া ছিল।

জমিদারের কৌতূহল জাগল জ্যোতিষীর কথা কতখানি ফলে তা জানার। কিষান এগিয়ে গেল। জমিদার পিছনে সরে গিয়ে তার চাকরকে কী যেন বলল। তৎক্ষণাৎ চাকর ওই কিষানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তোমার সাহস তো কম নয়! অন্য গ্রাম থেকে এই গ্রামে আম বিক্রি করতে এসেছ আর জমিদারকে ভেট দিলে না!’ বলেই চাকরটা আমের ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল।

ফল বিক্রেতা কিষানের ভীষণ দুঃখ হল। বিক্রি করে লাভ করা দূরে থাক সমস্ত ফলগুলো নিয়ে লোকটা পালাল। অন্য গ্রামে এসে সেই গ্রামের লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত ভেবে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। মনে মনে ভাবল জ্যোতিষীর কথার কোনো মানে হয় না। অন্য গ্রামে এসে অত সাহস দেখানো যায়! পাগলের মতো সে সারা গ্রামে ঘুরতে লাগল। জ্যোতিষীর খোঁজ করল ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না। শেষে সে ওই কালী মন্দিরের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ল।

সবার ঘুমানোর পর জমিদারের ছেলে টাকাপয়সা নিয়ে ওই কালী মন্দিরে এল। সিদ্ধাচার্য ছেলেটিকে দেখেই বলল, ‘বাবা এসেছ? কত টাকা এনেছ বাবা?’

‘এক-শো টাকা।’ ছেলেটা বলল।

‘বা, ভালো। টাকাটা আমার হাতে দিয়ে তুমি ফিরে যাও।’ সিদ্ধচার্য বলল।

ওদের কথা কানে যেতেই কিষানের ঘুম ভেঙে গেল। সে কোনো সাড়াশব্দ না করে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল। সিদ্ধাচার্যের হাতে টাকার পোঁটলা দেখে গম্ভীর গলায় সে বলল, ‘টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? রেখে যা এখানে!’ শুনে সিদ্ধাচার্য পোঁটলা ফেলে রেখে চলে গেল।

কিষান তুলে নিল ওই টাকার পোঁটলা। ভাবল জ্যোতিষীর কথাই ঠিক। সাহসের সঙ্গে গর্জে উঠেছি বলেই টাকা পেয়েছি। কিষানের খুব আনন্দ হল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল এত টাকা নিয়ে গ্রামে যাবে কী করে! ঠিক করল ওই টাকা জমিদারকে দিয়ে নিজের ফল ফেরত চাইবে। ওদিকে জমিদারের চাকর সারাদিন ধরে জ্যোতিষী ও কিষানের উপর নজর রেখেছিল। মাঝরাত্রে চাকর এসে জমিদারকে খবর দিল যে তার ছেলে টাকা নিয়ে গিয়ে সিদ্ধাচার্যকে দিয়েছে।

জমিদারের বাড়িতে কিষানের আসার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চাকর ধরে আনল জ্যোতিষী ও সিদ্ধাচার্যকে। জমিদার সিদ্ধাচার্যকে বলল, ‘আমি আপনাকে যে পুরস্কার দিয়েছি তা কম হয়ে থাকলে আপনি আমাকে বলতে পারতেন। আমি আরও দিতাম। ছোটো ছেলেকে দিয়ে এসব কাজ করাতে আছে?’ জমিদার সিদ্ধাচার্যকে বকল, কিষানকে আমের টাকা ও পুরস্কার দিল। এবং জ্যোতিষীকেও কিছু টাকা উপহার দিল। কিষান ও জ্যোতিষী আনন্দে ফিরে গেল। সিদ্ধাচার্যের মুখ চুন হয়ে গেল।

চুরি বিদ্যা

কয়েক-শো বছর আগের কথা। বিদিশা নগরের প্রজারা ধর্মপথে চলত। শাসন কাজও এমনভাবে চলত যাতে প্রজাদের কোনো ক্ষতি না হয়। কোনোরকম চুরি হত না।

প্রতিবেশী দেশ থেকে একবার মধুগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে বিদিশা নগরে আসে।

নিজের একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে তরিতরকারির ব্যাবসা করতে লাগল। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তারপর মধুগুপ্ত বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। নিজের সমস্ত খদ্দেরকে নিমন্ত্রণ করে সবাইকে খাওয়াল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে খদ্দেররা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যে-যার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন এক সের চালের দাম দিয়ে গোপনে আর এক সের চাল নিয়ে হাঁটা দিল।

অন্যজন এক সের ছোলার দাম দিয়ে দু-সের ছোলা নিয়ে চম্পট দিল। আর একজন অতিথি সবার চোখে ধুলো দিয়ে খিড়কির দরজায় বাঁধা একটা গোরু নিয়ে পালাল।

এইভাবে যে যা পেল হাতের কাছে তা নিয়ে সরে পড়ল।

এসব কিছুই মধুগুপ্তের নজরে পড়েনি। তার বউ হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁগো, আমাদের সোনার থালাটা কোথায়? পাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ পরে তারা টের পেল খিড়কির দরজায় বাঁধা গোরুও নেই।

মধুগুপ্ত ঠিক করল এই দুটো জিনিসের চুরির ব্যাপারে সকালে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করে আসবে।

কিন্তু পরের দিন সকালে যা ঘটল তাতে মধুগুপ্ত অবাক হয়ে গেল। যে যা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সে তা তার বাড়িতে এসে ফেরত দিয়ে গেল। ফেরত দিয়ে গেল গোরুও। এবং প্রত্যেকে ক্ষমা চাইল।

ওদের প্রতি মধুগুপ্তের বিরক্তি জাগল। ঘৃণাও পোষণ করল ওদের প্রতি। সে যা কল্পনা করেনি তাই ঘটল।

তা ছাড়া অন্য এক কারণ হল সব পেলেও এখনও সোনার থালাটা পায়নি।

'তোমরা তো অদ্ভুত ধরনের চোর। তোমার অতিথি হয়ে চুরি করেছ। তোমাদের ক্ষমা করব কি! সস্তা জিনিসগুলো ফেরত দিলে আর পাঁচ হাজার টাকার সোনার থালার পাত্তা নেই। যতক্ষণ না তোমরা আমার সোনার থালা ফেরত দিচ্ছ ততক্ষণ আমি তোমাদের যেতে দেব না।' মধুগুপ্ত ধমক দিয়ে বলল।

তার কথা শুনে সবাই জানাল যে তারা ওরকম কোনো সোনার থালার ব্যাপারে কিছুই জানে না।

'তাহলে চল রাজদরবারে।' তারপর মধুগুপ্ত সবাইকে রাজদরবারে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আরও একটি চোর ধরা পড়ল। সোনার থালা নিয়েছিল মধুগুপ্তেরই বাড়ির চাকর রঘু।

যেদিন থেকে মধুগুপ্তের বাড়িতে সে কাজে লেগেছে সেদিন থেকেই প্রত্যেক দিন সুযোগ বুঝেই কোনো-না-কোনো জিনিস সে চুরি করত।

রঘুই তার আগের দিন অতজন অতিথির ভিড়ে সোনার থালাটাই নিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে রঘু ওই সোনার থালা বিক্রি করতে কাছের একটা স্বর্ণকারের কাছে গেল।

সেইসময় পাশের দেশের একজন ওই স্বর্ণকারের সঙ্গে কথা বলছিল। সে ওই থালাটা দেখেই চিনতে পেরে বলল, 'এটা তো আমার থালা। বহুদিন আগে আমার
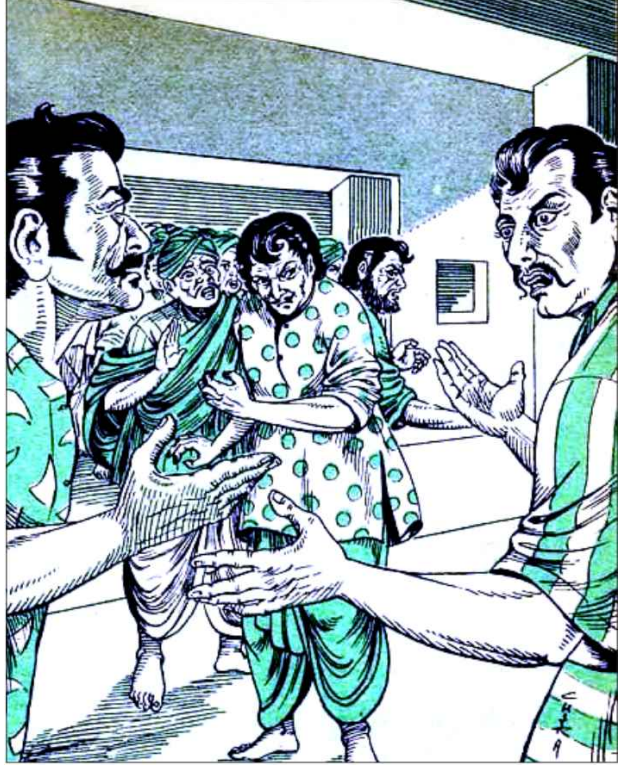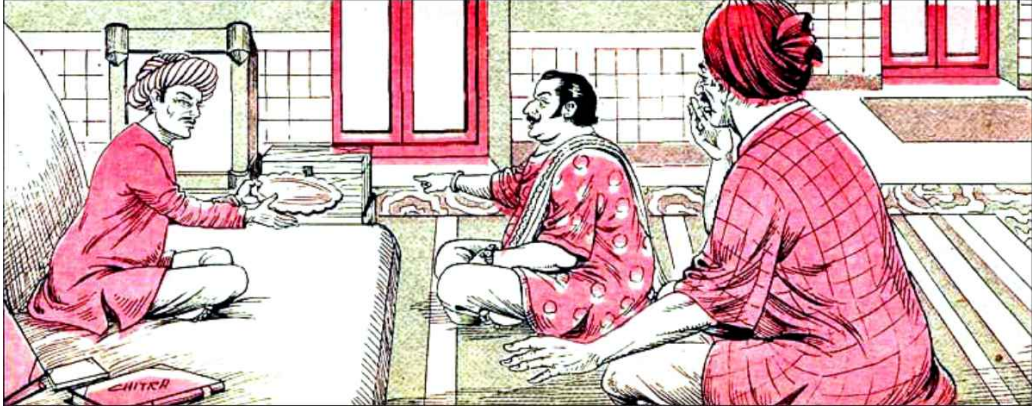
একটা বাক্স চুরি হয়েছিল। ওই বাক্সে এই থালাটা ছিল। এই লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন তো কোত্থেকে ও এই থালা পেয়েছে।'

সেই মুহূর্তে স্বর্ণকার রঘুকে নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজাকে রঘু জানাল যে সে ওই সোনার থালা মধুগুপ্তের বাড়ি থেকে চুরি করেছে।

মধুগুপ্তকে রাজদরবারে ডেকে পাঠিয়ে রাজা নিজের কর্মচারীদের দিয়ে তার বাড়ি তল্লাশ করালেন।

অন্য দেশ থেকে যে লোকটা এসেছিল তার বাক্সটা মধুগুপ্তের বাড়িতেই গোপন জায়গায় রাখা ছিল।

আসল ব্যাপার হল সবার মধ্যে চুরি করার ঝোঁক যে জেগেছিল তারজন্য দায়ী হল ওই মধুগুপ্ত।

মধুগুপ্ত নিজের দেশে চুরি করেই জীবনযাপন করত। পরে আগন্তুকের বাড়ি থেকে ওই বাক্সটি চুরি করে ধরা পরার ভয়ে বাক্সটি নিয়ে সে বিদেশে চলে আসে।

বিদিশা নগরে এসে ব্যাবসা করলেও তার আচার আচরণে চৌর্যবৃত্তির লক্ষণ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল। খদ্দেরদের নিমন্ত্রণ করে তাদের মনেও চুরির ঝোঁক ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু পরের দিনই ওরা অনুতপ্ত হয়ে ফেরত দিয়ে গেল। অনেকদিন মধুগুপ্তের বাড়িতে থাকার ফলে রঘু পাকা চোর হয়ে গেল।

রাজা দুঃখ প্রকাশ করে আগন্তুককে সোনার থালা ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহ বাক্স ফেরত দেওয়ালেন।

মধুগুপ্ত এবং রঘুকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে কঠোর শাস্তি দিলেন।

দণ্ডীর বুদ্ধি

রাহুলপুরের রাজা শিলাসিংহ মারা গেলেন। তাঁর ছিল একটি মাত্র পুত্র। নাম তার বীরসিংহ। বয়স একুশ। বীরসিংহের বয়স যখন মাত্র পাঁচ মাস, তখন তার মা মারা যায়।

ফলে বাপের আদরেই সে বড়ো হয়ে ওঠে। মার স্নেহ সে পায়নি।

বাপের মৃত্যু তার কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। তার মন ভেঙে গেল। অনেকেই তার মঙ্গল কামনা করত। তার কাছাকাছি থেকে তাকে সান্ত্বনা দিত। তবু সে শান্তি পেত না। তার মনে হত সে বড়ো একা। সংসারে তার আপনজন বলতে কেউ নেই।

এহেন অবস্থায় তাকে সিংহাসনে বসতে হল। সে বসল। কিন্তু তার মন বসল না। রাজ-কাজ তার দেখতে ভালো লাগত না। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকত। বাইরে বেরুতেও তার ইচ্ছে করত না। বহু চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করল। কিন্তু কোনো ফল হল না। দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকার ফলে তার শরীর ভেঙে পড়তে লাগল।

রাজবৈদ্যও যখন তাকে সারিয়ে তুলতে পারল না, তখন সেনাপতি ও মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্ভাবনার কালোছায়া নেমে এল।

বাপের বেঁচে থাকতে যে বীরসিংহ অত্যন্ত সাহসী হিসেবে নাম করেছিল তাকে সবসময় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে কার না খারাপ লাগে। কিশোর বয়সেই বীরসিংহ একটি চিতাবাঘ মেরেছিল। আর সেই বীরসিংহ ভীরুর মতো সবসময় ঘরে বসে থাকে।

দেশের যত বৈদ্য ছিল, সবাই চেষ্টা করেছিল বীরসিংহকে সারিয়ে তোলার। কিন্তু কোনো ফল হল না।

শেষে দরবারের এক জাদুকর প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'মন্ত্রীমশাই, দেশের বৈদ্যরা সবাই তো আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখেছেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দেখ দণ্ডী, প্রাসাদের মহাবৈদ্যও আমাদের বীরসিংহকে সারিয়ে তুলতে পারেনি। এহেন অবস্থায় তুমি কি তোমার জাদুর সাহায্যে তার অসুখ সারাবে?' প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'চেষ্টা করে দেখতে চাই।' জাদুকর দণ্ডী বলল।

প্রধানমন্ত্রী মনে মনে হেসে বলল, 'বেশ দেখ একবার চেষ্টা করে।'

দণ্ডী শুরু করল নিজের কাজ। সে রাজকুমারের ঘরে ঢুকে বলল, 'জয় হোক আপনার। আজ কেমন আছেন?'

বীরসিংহ উদাস হাসি হেসে বলল, 'আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছ? না-মরে বেঁচে আছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমার সমস্ত শক্তি বাবাই নিয়ে গেছেন। উনি চলে গেলেন আমার শক্তিও চলে গেল। এ দুনিয়ায় আমার আপনজন বলতে কেউ নেই।'

দণ্ডী বীরসিংহের অসুখের মূল কারণ ধরতে পারল। বীরসিংহ বাপের ওপরে সব চেয়ে বেশি নির্ভর করত।

সেইজন্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার নির্ভরতার খুঁটি নড়ে গেল। ফলে বীরসিংহ শক্তি ও সাহস হারাল। তার মনে স্থান করে নিল ভীরুতা।

বীরসিংহের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দণ্ডী তাকে নানা রকমের হালকা হাসির গল্প শোনাল। কিছুটা সে সফল হল। দণ্ডী লক্ষ করল, বীরসিংহ একটু হালকা মেজাজে কথাবার্তা বলছে। তার সেই মেজাজের সময় দণ্ডী নানা ধরনের জাদু দেখাত। দেখতে দেখতে বীরসিংহ ঘরের বাইরে দণ্ডীকে নিয়ে বেরুতে লাগল। দু-জনে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে মাঝে মাঝে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করত। বীরসিংহের এইরূপ পরিবর্তন হতে দেখে প্রধানমন্ত্রী খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

এক মাস হয়ে গেল। রাজকুমারকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। যখন-তখন সে দরবারে আসত। একদিন সে দণ্ডীর সঙ্গে দরবারে যাচ্ছে এমন সময় উপর থেকে একটা বিড়াল তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে 'বাঘ! বাঘ! মরে গেলাম! বাবা বাঁচাও!' বলে দুই হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করতে লাগল। ভয়ে তার শরীর কাঁপছিল।

দণ্ডী বলল, 'রাজকুমার এটা বাঘ নয় এটা বিড়াল। ভয় পাবেন না। বাঘ নয়। চোখ খুলে তাকান।'
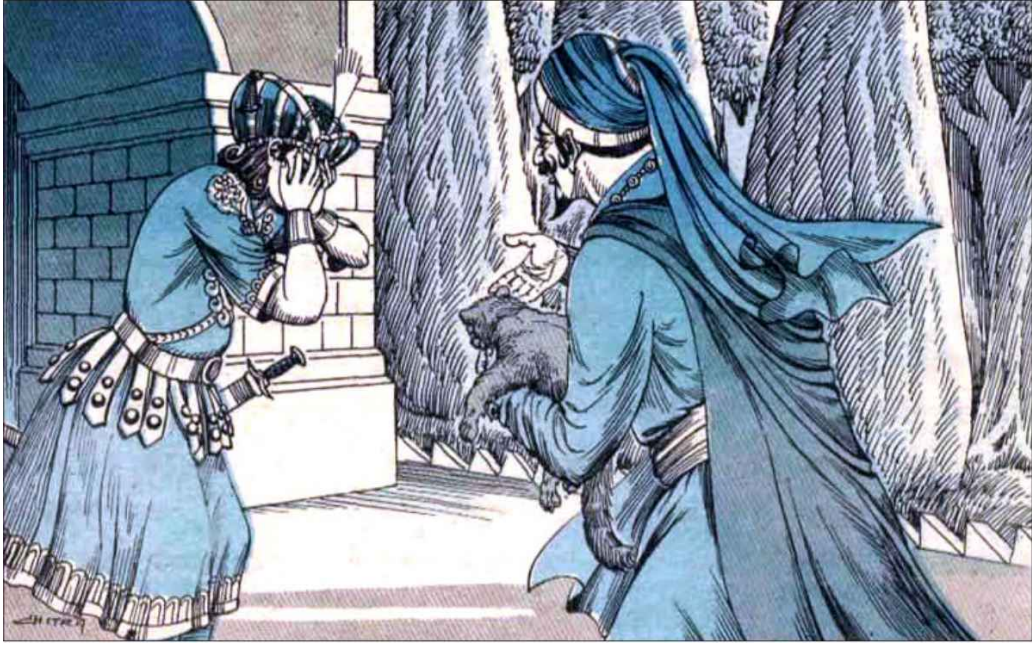
বীরসিংহ আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল সত্যিই একটি বিড়াল।

দণ্ডী বিড়ালটাকে হাতে নিয়ে বলল, 'এর গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আচ্ছা আপনার মনে আছে আপনি কিশোর বয়সে একাই একটা চিতাবাঘ নিজের হাতে মেরেছিলেন? এখন তো আপনি ইচ্ছে করলে খালি হাতেই বাঘ মারতে পারেন।'

'আমার মধ্যে সে শক্তি আর নেই। বাবার মৃত্যুর পর আমার সে শক্তি শেষ হয়ে গেছে। একটি বাচ্চা ছেলের চেয়ে আমি দুর্বল।' বীরসিংহ বলল।

'সত্যিই যদি তা হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার জাদুর সাহায্যে সেই শক্তি আপনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারি। বলুন পারি কি না? আমার শক্তি আছে কি না আপনিই বলুন।' দণ্ডী বলল।

'থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়েছি তোমার।' বীরসিংহ বলল।

'তাহলে চলুন, আপনি চিতাবাঘ মারতে। এগোন।' দণ্ডী বলল।

বীরসিংহ নিশ্চলভাবে দণ্ডীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল।

দণ্ডী নিজেই একটা কায়দা করে বিড়ালকে ওপর থেকে ফেলেছিল। দণ্ডীর এভাবে বিড়াল ফেলার কারণ হল বীরসিংহের মন থেকে ভীরুতা দূর করে তার মনে সাহস সঞ্চার করা।

কোনোরকমে বীরসিংহকে দিয়ে একবার চিতাকে মেরে ফেলাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

দণ্ডী পাতলা কাঠকে চিতাবাঘের আকারে কাটিয়ে নিল। এমনভাবে কাটাল
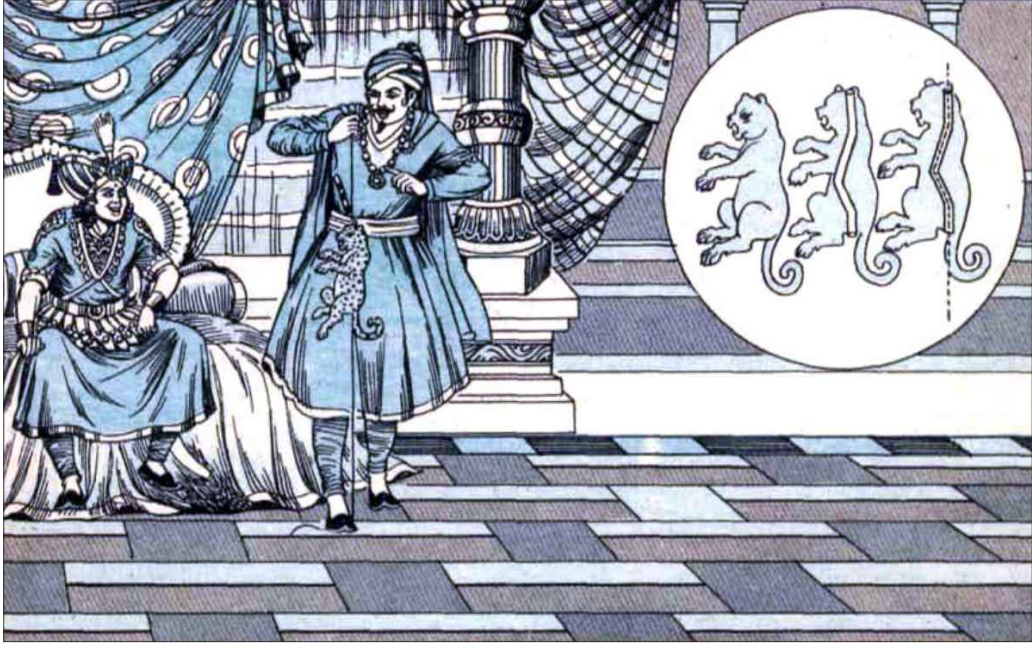
যেন চিতা দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো কাঠ দিয়ে একটি চিতাবাঘ তৈরি করে তার ভেতরে একটি পাতলা আঁকাবাঁকা নলি পুরে দিল। তারপর সেই কাঠের উপর চিতার রং লাগিয়ে নিল। ঠিক যেন একটি জলজ্যান্ত চিতাবাঘ। তারপর ওই নলির ভেতর দিয়ে একটি দড়ি ঢুকিয়ে তার পেছনের দিকটা পায়ে চেপে রেখে মাথার দিকের দড়িটা হাতে ধরল। পরে সেই দুটো কাঠ দিয়ে তৈরি করা, নল পোরা, রং লাগানো চিতাবাঘকে বীরসিংহের সামনে ধরল।

দণ্ডী বলল, 'এই হল চিতাবাঘের যন্ত্র। দয়া করে দেখুন এই খেলনার উপর আমার প্রভাব। আপনি তো দেখেছেন, প্রাণীদের উপর আমার প্রভাব কতখানি? এবার দেখুন এই প্রাণহীন খেলনার উপর আমার প্রভাব।' দড়ির নীচের দিকের শেষ ভাগ পায়ে চেপে রেখে মাথার দিকের দড়িটা হাতে ধরল। বাঘ দড়ি বেয়ে বেয়ে নীচে নাবল। তখন আবার পায়ের দিকের দড়ি হাতে ধরে এবং হাতের দড়িটা পায়ে চেপে পুতুলের ওই নলির কাছে মুখ রেখে কী যেন বলে ফুঁ দিল দণ্ডী। চিতাবাঘ খেলনার মাথা এখন নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে। তারপর জোরের সঙ্গে বলল, 'দেখুন বাজা বীরসিংহ এই খেলনা এখন আমার মন্ত্রপ্রাপ্ত। আমি যা বলব, এ তাই শুনবে। আমি যদি বলি দাঁড়াও, ও দাঁড়াবে। আমি যদি বলি লাফাও, ও লাফাবে।'

দড়িতে ওই ভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে এক-এক বার দণ্ডী বলল, 'থামো।' খেলনা থেমে গেল। আবার বলল, 'চল।' খেলনা চলল। বীরসিংহ এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারপর দণ্ডী শান্ত স্বরে বলল, 'রাজা বীরসিংহ এ শক্তি আমার নয়। এই তাবিজের জোরেই চিতাবাঘের খেলনা চলছে থামছে।' এ-কথা বলে দণ্ডী নিজের

বাঁ-হাত থেকে একটি তাবিজ খুলে বীরসিংহের বাঁ-হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, 'রাজা বীরসিংহ এখন থেকে এই খেলনা আপনার কথামতো চলবে।'

তারপর বীরসিংহ ওই খেলনাটা নিয়ে ওই ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে দণ্ডী যা করছিল তাই করল।

নলিটা বাঁকা থাকায় হঠাৎ দড়িতে টান পড়লেই খেলনাটা থেমে যেত। আবার দড়িটা ঢিলা দিলেই গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে যেত।

নলিটা যে বাঁকা এসব ব্যাপার বীরসিংহ জানত না। তাই ঘটনাটা তার কাছে বিস্ময়ের ছিল। তাবিজ পরানোর পরে সত্যি সত্যিই বীরসিংহের মনে সাহস ফিরে এল। তার মনে হল তার শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে একটি চিতাবাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডী আগে থেকেই ওই চিতাবাঘকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিল।

বীরসিংহ অন্য দিনের মতো সেদিনও দণ্ডীর সঙ্গে উদ্যানে এসে হঠাৎ সামনে একটি চিতা দেখতে পেল। চিতা বীরসিংহের দিকে তাকাল।

বীরসিংহ তরবারি দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। যেহেতু তার হাতে তাবিজ ছিল সেই হেতু রাজা বীরসিংহের মনে কোনো ভয় অথবা দ্বিধা ছিল না। চিতাবাঘ তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু লোক ধারে-কাছে ছিল। তারা মহা উল্লাসে সমস্বরে বলে উঠল, 'মহারাজ বীরসিংহের জয় হোক! মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।'

পরক্ষণেই বীরসিংহের পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার ফলে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ধার আদায়

কোনো এক দেশে সত্যচরণ নামে এক ধনী ছিল। দেশের বহু লোককে সে ধার দিত। ধার আদায় করার কৌশলও তার জানা ছিল। কোনো লোক তার পয়সা মেরে দিতে পারত না।

একবার সোমনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ তার কাছে ধার চাইতে এসে ধার নিয়ে বলল, 'আপনি কোনো কাগজপত্রে কিছু লিখিয়ে নিলেন না, ব্যাপার কী? আমি যদি আপনার টাকা মেরে দি? আপনার তো কোনো প্রমাণ নেই, কী করতে পারবেন?'

এ-কথা শুনে সত্যচরণ একটু হেসে বলল, 'আপনার মতো লোকের কাছ থেকে আবার কাগজ লিখিয়ে নেব? কী দরকার আছে প্রমাণ রাখার। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনার উপর। আর যদি মেরেই দেন মনে করব আমি এক ভিখিরিকে দান করেছি। আমার তা নিয়ে কোনো দুঃখ থাকবে না। আমি মরে যাব না তাতে।'

সোমনাথ সত্যচরণের বিশ্বাসের গভীরতা দেখে অবাক হয়ে গেল। পরে যখন পারল তখন সুদ ও আসল সত্যচরণকে দিয়ে দিল।

সত্যচরণের বাড়ির কাছেই থাকত সুদেব নামে এক ধনী লোক। তার টাকা ছিল কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। সুদেবের টাকার লোভ ছিল খুব বেশি। সুদের কারবার করে বেশি রোজগার করার ইচ্ছা জাগল তার। কিন্তু সে জানত না কীভাবে ধারের টাকা আদায় করতে হয়। সত্যচরণের কাছে ওই কৌশল শেখার কথা ভাবল। কিন্তু এক ধনী অন্য ধনীকে অর্থ উপার্জনের কৌশল শেখাবে কেন? তাই অনেক ভেবেও সুদেব ভেবে পেল না কীভাবে কী করবে। শেষে ঠিক করল নিজেই সত্যচরণের

কাছে টাকা ধার করবে। সেইদিনই সত্যচরণের কাছে গিয়ে এক-শো টাকা ধার চাইল।

সত্যচরণ আকাশ থেকে পড়ার মতো অবাক হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে ধার দেব? কি বলছেন?'

'আর বলেন কেন টাকাপয়সার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। এই আছে, এই নেই। হঠাৎ অনেক টাকা দরকার পড়ে গেল। আর কার কাছেই বা যাই। তাই আপনার কাছেই চলে এলাম। আপনি ছাড়া এখানে আর কার-বা ক্ষমতা আছে টাকা ধার দেবার।'

কিছুক্ষণ ভেবে সত্যচরণ বলল, 'ঠিক আছে দিচ্ছি,' বলে ভেতরে গিয়ে এক-শো টাকা ও একটি পাথরের টুকরো আনল। টাকা সুদেবের হাতে দিয়ে বলল, 'এই পাথরটাকে দয়া করে ছুঁয়ে নিন তো।'

'কেন?' সুদেবের প্রশ্ন।

'এমনি। কোনো ক্ষতি হবে না।' সত্যচরণ বলল।

সুদেব ওই পাথরটাকে ছুঁয়ে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে নিল। সত্যচরণ বলল, 'সুদের হার মাসে দু-টাকা।'

সুদেব বুঝতে পারল তার কাছে একটু বেশি সুদ চাওয়া হচ্ছে। তবু কোনো কথা বলল না। কারণ তার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। সত্যচরণের কাছ থেকে আসল কৌশল শিখে নেবে।

মাসের পর মাস কেটে গেল কিন্তু সত্যচরণ তাকে তাগাদা দিতে আসেনি। কেন যে আসছে না ভেবে অস্থির হয়ে উঠল সে। শেষে পাঁচ মাস পরে সুদেব সত্যচরণের কাছে এসে বলল, 'কী মশাই, এত মাস হয়ে গেল, কই তাগাদা দিতে তো এলেন না? আমাকে যে ধার দিয়েছেন তা ভুলে গেলেন নাকি একেবারে?'

'আমি ভুলে যাব কেন? যত দেরি হবে আমার সুদ তত বাড়বে। লাভ আমারই বেশি।' বলল সত্যচরণ।

কথাটা শুনেই সুদেব বলল, 'বেশ বলেছেন। আর আমি যদি না দি? মেরে দিলে কী করবেন? আপনি তো লিখিয়ে নেননি।'

'আপনি আমার টাকা মারতে পারেন না। টাকা নেবার সময়, মনে আছে আপনি একটি পাথর ছুঁয়ে দিলেন? ওই পাথর যাঁরা ছুঁয়েছেন তাঁরা কেউ আমার টাকা মারতে পারেনি।' সত্যচরণ বলল।

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুদেব ভাবল তাহলে ওই পাথরটাই কৌশলের মূল অস্ত্র। ওটাকে হাতাতে পারলে আর কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুদেব বলল, 'তাই বুঝি?' মুহূর্তকাল ভেবে সুদেব বলল, 'আচ্ছা দাদা, আমি কিছুতেই অনেক চেষ্টা করেও কিছু লোকের কাছ থেকে আমার টাকা আদায়

করতে পারছি না। দয়া করে আপনার এই পাথরটা কিছুদিনের জন্য যদি আমাকে ধার দেন তাহলে আদায় করে অনেক টাকা উদ্ধার করে নিতে পারি। আপনার পাথর অবশ্যই ফেরত দেব।'

'ঠিক আছে নেবেন। আমার কাছে দুটো পাথর আছে। আপনি একটা নিয়ে নিন। আপনি পাথরটা আপনার কাছে এক বছর রেখে দেখুন। যদি কাজ না হয় এক বছর পরে ফেরত দেবেন, আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দেব।'

সুদেব নিজের পরিকল্পনা মতো কাজ হওয়ায় পরমানন্দে বলল, 'এর দাম কত?'

'এক-শো দশ টাকা।' সত্যচরণ বলল।

সুদেব বাড়ি থেকে একটা টাকার থলি এনে তার হাতে দিয়ে বলল, 'যত টাকা বাড়িতে এই মুহূর্তে আছে ভেবেছিলাম তত টাকা নেই। মাত্র এক-শো দশ টাকাই আছে। এই টাকা নিয়ে আপাতত ওই পাথরটা দিন, পরে ধারের টাকা আপনাকে সুদ সমেত ফেরত দেব।'

'আপনার যা ইচ্ছা। দেরি হলে আমারই তো ভালো। সুদ বেশি পাব।' বলে টাকা নিয়ে ওই পাথর দিয়ে দিল সত্যচরণ।

পাথর নিয়ে সুদেব দেশের বহু লোককে টাকা ধার দিতে লাগল। টাকা ধার দেয় আর পাথর ছুঁতে বলে। লোকে তাই করে টাকা নেয়। সুদেব নিশ্চিন্তে টাকা ধার দিয়ে যায়। পাথর যখন ছুঁয়েছে তখন ওরা টাকা সুদ সমেত না দিয়ে পারবে না। এই তার ধারণা।

মাসের পর মাস কেটে গেল। লোকে সুদেবের কাছে শুধু টাকা নিতেই আসে, দিতে আসে না। আট নয় মাস হয়ে গেল অথচ টাকা ফেরত পাচ্ছে না দেখে সুদেব সত্যচরণের কাছে গিয়ে বলল, 'কী হল পাথর ছুঁয়ে যারা টাকা নিয়ে গেছে তারা কেউ আর ফিরছে না কেন?'

'পুরো এক বছর দেখুন।' সত্যচরণ হাসিমুখে বলল।

এক বছর হয়ে গেল কিন্তু টাকা আর ফেরত দিয়ে গেল না। ঘরের টাকাই ঘরে ফিরল না, সুদের টাকা তো পরে। সুদেব টাকা দিয়ে ফতুর হতে চলল। শেষে এক দিন রেগেমেগে সত্যচরণের সামনে পাথরটাকে ছুড়ে ফেলে সুদেব বলল, 'সব ধোকাবাজি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিলাম কেউ ফেরত দিয়ে গেল না।'

'আমার কাছে যখন ছিল তখন তো বেশ কাজ পেয়েছিলাম।'

'ছাই কাজ পেয়েছেন! আমাকে যা দিয়েছিলেন তা কি ফেরত পেয়েছেন? আপনার পাথরে কোনো গুণ নেই।'

'আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারিনি কে বলল? সুদ সমেত আদায় হয়ে গেছে সেই এক বছর আগে। ওই পাথরটা ফাউ হিসেবে দিয়েছিলাম। আপনার দেয়া এক-শো দশ টাকা ধার শোধ বাবদ খাতায় জমা করে নিয়েছি।' বলল সত্যচরণ

চোখে না পড়া দৃশ্য

গঙ্গার তীরবর্তী এক অঞ্চলে নারায়ণ শাস্ত্রী নামে এক মুনি ও অয়নকুমার নামে তাঁর এক শিষ্য ছিলেন। একবার পথ চলতে চলতে নারায়ণ শাস্ত্রী একটি গাছতলায় বসে শিষ্যকে এক ঘটি জল আনতে পাঠান। অয়নকুমার জলের খোঁজে বেরিয়ে দূরে একটা লোককে বসে খাওয়ার আয়োজন করতে দেখতে পেল। শিষ্য ভাবল তার কাছ থেকে জল নেবে অথবা কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ নেবে। এসব ভেবে অয়নকুমার ওই গাছতলায় বসা লোকটার দিকে এগোতে লাগল।

তাকে দেখে গাছতলায় খেতে বসা লোকটা তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। নিজের জন্য আনা খাবার অন্যকে দিতে হবে ভেবে লোকটা চলে গেল বলে মনে হল অয়নকুমারের।

হাঁকপাক করে পালাতে গিয়ে তার ঘটির জল গড়িয়ে পড়ে গেল। লোকটার কাণ্ড দেখে শিষ্যের হাসি পেল। সে তখন এদিক-ওদিক ঘুরে জল জোগাড় করে সেই পথেই ফিরল। ফেরার পথে সে একটি শব দেখতে পেল। পাশেই পড়ে ছিল খাবার। ওই খাবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পশুপাখি খাচ্ছিল। লক্ষ করে শিষ্য দেখল এ সেই লোক। এই লোকটাই তাকে দেখে ছুটে পালিয়েছিল। হয়তো তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে খাবার আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। পাশেই পড়ে ছিল ঘটি। অয়নকুমার ভাবল, ভালোই হয়েছে মরেছে। যেমন পালিয়েছিল তাকে দেখে তেমন ফল পেয়েছে। একটু জল দেবার ভয়ে কীভাবে পালাল! গুরুকে সবিস্তারে শিষ্য বলল।

‘তাহলে তো ওই শব ওইভাবে ফেলে রাখা উচিত হবে না। চল আমাদের কর্তব্য আমরা করে আসি।’ বলে নারায়ণ শাস্ত্রী সেই শবের কাছে এলেন। গুরুর নির্দেশ মতো শিষ্য শুকনো কাঠ আর আগুন জোগাড় করল।

চিতা জ্বলে উঠলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নারায়ণ শাস্ত্রী বললেন, ‘বা, চমৎকার, লোকটা স্বর্গে পৌঁচেছে। আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।’

গুরু যেদিকে তাকিয়েছিলেন অয়নকুমার সেদিকে তাকিয়ে কিচ্ছু দেখতে পেল না। সে বলল, ‘অতিথিকে সামান্য খাবারের ভাগ দেবার ভয়ে যে লোকটা ছুটে পালায় সে হল গিয়ে স্বর্গযাত্রী। এ তো চমৎকার কাণ্ড! আর আপনিই বা ছুটে দাহ করতে এগিয়ে এলেন কেন?’

‘সে যা পাপ করেছিল সব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। মানুষ অজান্তেও তো পূণ্য করে থাকে। যেমন, মারা যাওয়ার সময় তার অজান্তেই তার খাবার পশুপাখিরা খেয়েছে।

‘এই একটি কারণের উপর ভিত্তি করেই আমি চেয়ে ছিলাম লোকটাকে স্বর্গে পাঠাতে। আমার কামনা পূর্ণ হয়েছে। আমি তা দেখেছি নিজের চোখে।’ বলল নারায়ণ শাস্ত্রী।

‘তাহলে আমি দেখতে পাইনি কেন?’ বলল অয়নকুমার।

‘একটা গল্প বলছি। শুনলে বুঝতে পারবে কেন তুমি দেখতে পাওনি।’

অনেক বছর আগে কুমারিলভট্ট নামে এক জ্ঞানী লোক ছিলেন। বেদভিত্তিক কর্মানুষ্ঠানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তখনকার দিনে বৌদ্ধরা বেদমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তাদের মত খণ্ডন করতে হলে, ওই মতের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হলে, ওদের মতটা ভালোভাবে জানতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পোশাক পরে বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে ওদের মত জানার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই বৌদ্ধরা বুঝতে পারল যে উনি কেন ওদের মধ্যে আছেন। তখন যেহেতু প্রাণে মারা ওদের মতে পাপ অতএব ওরা তাঁকে সাততলা বাড়ির উপর থেকে নীচে ফেলে দিল। নীচে পড়তে পড়তে কুমারিল ভট্ট বললেন, ‘বেদ যদি সত্য হয়, আমি আঘাত না পেয়ে নীচে পড়ব নিরাপদে।’ ঠিক তাই হল। তাঁর কোনো আঘাত লাগল না। তবে তাঁর চোখে একটি পাথর ঢোকায় অনেক দিন কষ্ট পেয়েছিলেন।

বেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কেন যে চোখে আঘাত পেলেন তাঁর গুরুর কাছে জানতে চাইলেন। গুরু এ-কথার জবাবে বললেন, ‘তুমি বেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস না রেখে “বেদ যদি সত্য হয়” বলাতেই, এইভাবে সন্দেহ প্রকাশ করাতেই পাথর ঢুকল চোখে। তা না হলে ঢুকত না। “বেদ সত্য বলেই আমি

আঘাত পাব না।" বললে কোনো বিপদ ঘটত না।' বললেন কুমারিল ভট্টের গুরু।

নারায়ণ শাস্ত্রী এই কাহিনি শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বুঝতে পেরেছ তো আমি যে দৃশ্য দেখেছি সেই দৃশ্য তুমি কেন দেখতে পেলে না?' অয়নকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওই পুণ্যাত্মার ঘটনার সঙ্গে এই পাপাত্মার ঘটনার কোথায় যে মিল তা বুঝতে পারলাম না তো!' বলল শিষ্য।

'তাহলে তোমাকে আর একটি কাহিনি শোনাচ্ছি শোনো। সেটা শুনলে বুঝতে পারবে কোথায় মিল।' বললেন নারায়ণ শাস্ত্রী। তিনি বললেন: সুনন্দ নামে এক ভক্ত একজন যোগীর কাছে নরসিংহ মন্ত্র শেখার উদ্দেশ্যে বনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। সেইসময় এক ব্যাধ তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিকে একটা হরিণ এসেছে?'

'ধ্যানে বসে আছি দেখব কী করে?'

'তুমি কে, এখানে কেন এভাবে বসে আছ?' জিজ্ঞেস করল ওই ব্যাধ।

ব্যাধকে সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্য সুনন্দ বললেন, 'আমিও তোমার মতো একজন শিকারি। আমিও একটি মৃগের সন্ধানে এখানে বসে আছি।'

'তাই নাকি? কেমন দেখতে সেটা?' ব্যাধের প্রশ্ন। সুনন্দ নরসিংহ অবতার ভালোভাবে বর্ণনা করে বোঝাল।

'বনে যত রকমের মৃগ আছে প্রত্যেকটাকে আমি চিনি, কিন্তু তুমি যে রকমটা বলছ ওরকমের মৃগ আমি দেখিনি।' বলল ওই ব্যাধ।

'আছে নিশ্চয়, তুমি দেখতে পাও না।' বললেন সুনন্দ।

'আপনি জ্ঞানী পুরুষ আপনি যখন বলছেন আছে, তাহলে নিশ্চয় আছে। ঠিক আছে আমি ধরে আনছি।' এ-কথা বলে ব্যাধ ভাবতে ভাবতে বনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্ঞানীর কথা বিশ্বাস করে সে সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথাও ওই ধরনের মৃগের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। শেষে কথা রাখতে না পারার দুঃখে সে যখন আত্মহত্যা করতে যাবে এমন সময় নরসিংহ ব্যাধের উপর প্রসন্ন হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তার সামনে অর্দ্ধেক নর অর্দ্ধেক সিংহ মূর্তির

একটি মৃগ দেখতে পেল ওই ব্যাধ। তখন সে মনে মনে ভাবল জ্ঞানী তো তাকে ঠিকই বলেছেন।

ব্যাধ যে দড়ি নিজের গলায় পরবে ঠিক করেছিল সেটা দিয়ে নরসিংহকে ভালো করে বেঁধে সুনন্দের কাছে এনে বলল, 'এই যে আপনি যে মৃগ খুঁজছিলেন আমি তা ধরে বেঁধে এনেছি।' বলে ওই মৃগকে সামনে এনে দেখাল। সুনন্দ তার সামনে কিছুই দেখতে পেল না। শুনতে পেল: 'গুরুর কথা তুমি বিশ্বাস করনি। খোঁজার মতো খুঁজলে যে আমাকে পাওয়া যায় তা তুমি বিশ্বাস করনি। তাই তুমি ভেবেছ ব্যাধ খুঁজে পাবে না আমাকে। মনে রেখো তোমার ধ্যানের চেয়ে ব্যাধের বিশ্বাস অনেক বেশি।'

সুনন্দ ব্যাধকে বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করেছ, পেয়েছ, আমি ধ্যানে বসেও পাইনি।'

'এবার বুঝতে পেরেছ?' বললেন নারায়ণ শাস্ত্রী।

'আজ্ঞে হ্যাঁ এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। ওই লোকটা পাপী হলেও তাকে স্বর্গ পাইয়ে দেবার জন্য আপনি দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করেছেন। সেইজন্য ওই লোকটার স্বর্গে যাওয়া আপনি দেখতে পেলেন আর আমার মনে আপনার মতো বিশ্বাস দৃঢ় না থাকায় আমি দেখতে পাইনি।' বলল অয়নকুমার।

ভুলো মনের জামাই

কোনো এক দেশে এক ছিল ভুলো মনের লোক। নাম তার নবকুমার। বাচ্চা বয়স থেকে তার কোনো কিছুই মনে থাকে না। এহেন এক ছেলেকে পাত্র হিসেবে বাছাই করল পাশের গ্রামের একটা হতবুদ্ধি লোক।

পরের বছর জামাইষষ্ঠীর ক-দিন আগে শ্বশুরমশাই জামাই আর মেয়েকে ষষ্ঠীতে যেতে নেমন্তন্ন করে গেল। বার বার বলে গেল তারা যেন সকাল সকাল যায়।

শ্বশুরের যাওয়ার পরমুহূর্তেই নবকুমার ভুলে গেল শ্বশুরমশাই কেন তার বাড়িতে এসেছিল। 'আচ্ছা, বাবা কেন এসেছিলেন বলত?' নবকুমার জিজ্ঞেস করল বউকে।

'পোড়া কপাল আমার। এর মধ্যেই ভুলে গেলে? জামাইষষ্ঠীতে আমাদের দু-জনকে নেমন্তন্ন করে গেলেন।' বউ বিরক্ত হয়ে মুখঝামটা দিয়ে বলল।

ষষ্ঠীর দিন স্বামী-স্ত্রী দু-জনে বেরুনোর জন্য খুব ভোরে উঠল। 'নিজেদের গোরুর গাড়িতে করেই যাব। গাড়ি ঠিক করতে বল।' বউ বলল।

খিড়কির দরজায় রাখা গোরুর গাড়িটাকে বাড়ির সামনে এনে গাড়িতে বিচুলি পেতে আরাম করে বসার ব্যবস্থা করে নিল। ঠিক বেরুনোর মুহূর্তে তালা খুঁজে পাওয়া গেল না। 'ভুলো মন তোমার কোথায় ফেলে রেখেছ এখন খোঁজ। আমি আর কী বলব।' গর্জে উঠল নবকুমার।

বউ সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল কিন্তু পেল না। শেষে রেগে গিয়ে বলল, 'থাম

তোমাকে আর খুঁজতে হবে না। আমি খুঁজছি।' বলে নবকুমার হাতের জিনিসটা রেখেই দেখে এইটাই তালা! আবার কোথাও ভুলে যাবে ভেবে হাতে ওই তালা নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বউ বলল, 'মরণ আমার, হাতের তালা কি হাতেই থাকবে না কি লাগাবে!'

তালা লাগানোর পর পথে বেরিয়ে দেখে গাড়ি আছে বলদ নেই। বলদগুলো চাকর খেতে নিয়ে গেছে প্রত্যেক দিনের মতো। তাকে কোনো কথা জানানো হয়নি।

অন্য কোনো উপায় না থাকায় ওরা ঘোড়া গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। গাড়িতে বসে নবকুমার বলল, 'আমাদের বলদগুলো আজ কত জোর ছুটছে দেখেছ?'

'তোমার হাতে তুলে না দিয়ে বাবা-মা আমার গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ফেলে দিলেই পারত। গাড়িতে বসেই ভুলে গেলে যে এটা ঘোড়ার গাড়ি!' পাশের গ্রামে যেতেই ওদের দুপুর হয়ে গেল। নবকুমার গাড়ি থেকে নেবেই ছুটল শ্বশুরের বাড়ি। পেছন পেছন কোচওয়ান চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল, কই আমার ভাড়া দিন। ভাড়া!' কথাটা শ্বশুরের কানে যেতেই ও বেচারা ভাড়া দিয়ে দিল। তারপর জামাই-শ্বশুরে কথাবার্তা হল। কিছুক্ষণ পরে শ্বশুর ভেতরে গিয়ে খোঁজ করল জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে কি না। ফিরে এসে দেখে জামাই নেই! তাড়াতাড়ি বাড়ির বাইরে এসে শ্বশুর দেখল জামাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চলে যাচ্ছে।

'নবকুমার, ও নবকুমার, নব!' শ্বশুরের ডাক শুনে জামাই চিৎকার করে বলল, 'বাড়িতে আপনার মেয়ে একা আছে। আমি না থাকলে ও একমুহূর্ত বাড়িতে থাকতে পারে না। ও ভীষণ ভীতু। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।' দেখতে দেখতে শ্বশুরের নাগালের বাইরে চলে গেল নবকুমারের গাড়ি।